বাংলা একাডেমি

# বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

# নীলফামারী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

# বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

## নীলফামারী


প্রধান সম্পাদক
**শামসুজ্জামান খান**

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
**মো. আলতাফ হোসেন**

সহযোগী সম্পাদক
**আমিনুর রহমান সুলতান**

**বাংলা একাডেমি ঢাকা**


www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

**মো. মোতাহার হোসেন**

সংগ্রাহক

**মোসা. জেসমিন আরা**

**মো. রশিদুল হাসান**

**মো. জাকারিয়া ইসলাম**

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
নীলফামারী

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/জুন ২০১৪

বাএ ৫৩৪৭

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
দুইশত কুড়ি টাকা

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : NILFAMARI (Present state of Folklore in Nilfamari District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 220.00 only. US$ : 5.00

**ISBN-984-07-5356-8**

www.pathagar.com

# প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখাপ্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ,

www.pathagar.com

সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের

www.pathagar.com

ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

## লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

**কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে**

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

**যেসব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে**

**ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি**

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

www.pathagar.com

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।
৩. জেলা/উপজেলার নদনদী, পুকুরদিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।
৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষপার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।
৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।
৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাটবাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।
৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

**খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত**

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন্ শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

## ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

**প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা**

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।
খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।
গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।
ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।
ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।
চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।
ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।
জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন্ ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শকশ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/ মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

www.pathagar.com

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহি ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

www.pathagar.com

## লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
## নির্দেশিকা

**সংজ্ঞা :** Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

**ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় :** Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

**১. নামকরণের ইতিহাস :** কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খালবিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

**২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ :** আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন : গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান

www.pathagar.com

(সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), আটপাড়া, নেত্রকোনা, মানিক পির (সাতক্ষীরা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমরদের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাটবাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, পার্বত্য ও অন্যান অঞ্চল। রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই এমন অঞ্চল ও অনুষ্ঠান।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহি), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহি), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর),

www.pathagar.com

মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), বরিশালের উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়ার সন্দেশ ; হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), নড়াইলের কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ, নড়াইল ; বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকাবাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস** : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

**মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যেসমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :**

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা

www.pathagar.com

পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

**মাঠকর্মে অন্য যেসব বিষয় থাকবে না**

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

**প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)**

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদনদী ও খালবিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

**দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)**

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

**তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)**

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

**চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)**

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

**পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)**

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক

www.pathagar.com

(মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

**ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)**

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

**সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)**

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকাবাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

**অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)**

১. মিস্ত্রি/সুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

**নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)**

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

**দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)**

**একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)**

**দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য**

**১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি**

**ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)**

**চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)**

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/ঝাঁকা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা সরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রধান সমন্বয়কারী, বাংলা একাডেমির পরিচালক, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, অনুবাদক সুমনা লতিফ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান নীলফামারী জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে নীলফামারীর সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

**শামসুজ্জামান খান**
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

## সূচিপত্র


**জেলা পরিচিতি (introduction of the district)** ২৩-৬২

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঘ. জনবসতির পরিচয়
ঙ. নদ-নদী
চ. ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা
ছ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও সাহিত্য সাধক
জ. মুক্তিযুদ্ধ
ঝ. বিখ্যাত গায়ক শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

**লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)** ৬৩-১০৫

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা
খ. কিংবদন্তি
গ. লোকপুরাণ
ঘ. লোকছড়া

**বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)** ১০৬-১১১

**লোকশিল্প**

১. মৃৎশিল্প
২. কারুশিল্প
৩. দারুশিল্প
৪. পাটজাতশিল্প
৫. শতরঞ্জিশিল্প

**লোকস্থাপত্য (folk architecture)** ১১২-১১৬

(টিনের ঘর, ছনের ঘর, মাটির ঘর, ঘরের ঝাপ, টিনের ঘরে নকশি কারুকাজ)

**লোকসংগীত (folk song)** ১১৭-১৭৬

১. ভাওয়াইয়া
২. পালাগান
৩. মেয়েলী গীত
৪. কীর্তন


www.pathagar.com

৫. খ্যাপা গান
৬. জারি
৭. গজল
৮. গোয়ালির গান
৯. ভক্তিমূলক গান

**লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments)** ১৭৭-১৮০

**লোকউৎসব (folk festival)** ১৮১-১৮৬
১. নববর্ষ
২. নবান্ন
ক. পৌষ-মেলা
খ. ভুরকাভাত বা চড়ুইভাতি

**অন্যান্য উৎসব**
১. ঈদুল ফিতর
২. ঈদুল আযহা
৩. ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী
৪. ওরশ
৫. শবেবরাত
৬. মহররম
৭. দুর্গাপূজা
৮. ভাদুরদরগা মাজার উৎসব
৯. গায়ে হলুদ
১০. বউভাত

**লোকমেলা (Folk fair)** ১৮৭-১৮৮
ক. চৈত্র সংক্রান্তির মেলা
খ. টটুয়ার বান্নিমেলা
গ. ঘুড়িরমেলা
ঘ. সঙ্গলসী বা দারোয়ানীর মেলা
ঙ. বড়ভিটার মেলা
চ. হালখাতা
ছ. কচুকাটার মেলা
জ. বারুনীমেলা
ঝ. হাজীর মেলা

**লোকাচার (Ritual)** ১৮৯
১. জিদ্দা ফতেয়া
২. আকিকা
৩. খাতনা

www.pathagar.com

**লোকখাদ্য (folk food)** ১৯০-১৯২
ক. পান্তাভাত
খ. বউক্ষুদা
গ. খিচুড়ি
ঘ. চালভাজা বা ভুজনা
ঙ. গমরুটি
চ. ছাতু
ছ. খই
জ. মুড়িমুড়কি
ঝ. চিড়া
ঞ. ক্ষীর
ট. দই
ঠ. পিঠা

**লোকনৃত্য (folk dance)** ১৯৩-১৯৪

**লোকক্রীড়া (folk games)** ১৯৫-২০২
ক. গোল্লাছুট
খ. ইকরিবিকরি
গ. উটুগুটু বততলা
ঘ. কড়ি খেলা
ঙ. আতরবিলাই ন্যাংড়া বিলাই
চ. উড়ি উড়ি পোকা
ছ. নুনঢোপ
জ. টেলিফোন টেলিফোন
ঝ. উপরান্টি বাইস্কোপ
ঞ. বউছি
ট. হাডুডু বা টিকটিক
ঠ. ডাংগুলি
ড. এক্কাদোক্কা বা কিতকিত

**লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk professional groups)** ২০৩-২০৯
ক. জেলে
খ. কামার
গ. কুমার
ঘ. ডোম
ঙ. ছুতার
চ. গাছি
ছ. তেলি
জ. মুচি

www.pathagar.com

ঝ. মেথর বা ঝাড়ুদার
ঞ. নাপিত
ট. ধুনুরী
ঠ. সাপুড়িয়া

**লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র (folk medicine & magical rites)** ২১০-২১৩
**ক. লোকচিকিৎসা**
১. ভাঙ্গাহাড় জোড়া লাগানো
২. জ্বিনভূত ছাড়ানো
**খ. তন্ত্রমন্ত্র**
১. সাপের বিষঝাড়ার মন্ত্র

**ধাঁধা (riddle)** ২১৪-২৪০

**প্রবাদ প্রবচন (proverb & folk sayings)** ২৪১-২৪৮

**লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)** ২৪৯-২৫৪

**লোকপ্রযুক্তি (folk technology)** ২৫৫-২৬৪
**ক. মাছধরার প্রযুক্তি**
১. ডারকি বা দোড়
২. পলুই
৩. পকিয়া
৪. হ্যাংগা বা হ্যাংগাজালি
৫. **জাল**
- ছিটকা জাল
- চৌরজাল বা চটকাজাল
- কৈজাল বা পাতানো জাল

৬. **বড়শি**
- খোটানো বড়শি বা ছিপ বড়শি
- পাতানো বড়শি
- গাড়াবড়শি

**খ. চাষাবাদ প্রযুক্তি**
১. লাঙ্গল ও জোয়াল
২. মই
**গ. তেলের ঘানি**
**ঘ. ঢেঁকি**
**ঙ. লোকযান প্রযুক্তি**
১. কলার গাছের ভেলা বা ভুড়া
২. গরুর গাড়ি

www.pathagar.com

# জেলা পরিচিতি

## ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

নীলফামারী নামকরণ নিয়ে তেমন কোন বিতর্ক নেই। নীলফামারীর নামকরণের মূলে রয়েছে নীলচাষ। এখানকার ফসলি জমি যথার্থই উর্বর হওয়ায় তা নীলচাষের জন্য অনুকূল ছিলো। ফলে ইংরেজরা তাদের কোম্পানীর কর্মচারীদেরকে এ অঞ্চলে নীলচাষ ও নীলের ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে থাকে। নীলচাষের প্রথম পর্যায়ে নীলকররা স্থানীয় কৃষকদেরকে দাদন দিয়ে তাদেরকে নীলচাষে উদ্বুদ্ধ করে। নীলকররা নীলচাষ এবং উৎপাদিত নীল প্রক্রিয়াজাত করার জন্য বিভিন্ন স্থানে নীল কুঠি স্থাপন করে। নীলকুঠির পাশে তারা নীল প্রক্রিয়াজাত করার জন্য ফ্যাক্টরি স্থাপন করে। নীলচাষের ফলে একদিকে স্থানীয় কৃষকরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি স্থানীয় জমিদাররাও তাদের প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্য কৃষক এবং জমিদারদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করতে থাকে। ১৮০১ সালের ১০ এপ্রিল ১৩জন জমিদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক অভিযোগনামায় দেখা যায় মিস্টার বিজার্স চিনিরকুঠি ও দুরাকুঠিতে, মিস্টার বাফটন ডিমলায়, মিস্টার আর ব্রাউন্ড কিশোরগঞ্জে ও মিস্টার ডব্লিউ টেরানিকস টেঙ্গনমারীতে নীলকুঠি স্থাপন করেছেন। পরবর্তীতে নীল ফ্যাক্টরির এই সংখ্যা আরো বাড়তে থাকে। নীলফামারীর তৎকালীন মহকুমা প্রশাসকের বাসভবন(বর্তমান অফিসার্স ক্লাব) দারোয়ানীর কুঠিবাড়ির কুঠি, সঙ্গলসীর কুঠি, নটখানার কুঠি ছাড়াও গোড়গ্রাম, তরণীবাড়ি, কচুকাটা, ইটাখোলা, খোকসাবাড়ি, চড়াইখোলা, বেড়াভাঙ্গাসহ বিভিন্ন জায়গায় নীলকরদের কুঠি ছিলো বলে জানা যায়। নীলকরদের এসব কুঠি থেকে নীলচাষ এবং নীলচাষের সাথে জড়িত কৃষকদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

ইংরেজি ফার্ম শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো খামার। স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে যারা নীলচাষের সাথে জড়িত ছিলো তাদেরকে বলা হতো নীলখামারী। খামারী শব্দের পূর্বে নীল শব্দটি বসে নীলখামারী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। পরবর্তীতে এই নীলখামারী শব্দটি সাধারণ লোকদের কণ্ঠে অপভ্রংশে রূপ নিয়ে নীলফামারী নামে অভিষিক্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। এ সম্পর্কে আরেকটি ধারণা প্রচলিত আছে। সেটি হলো শব্দের উৎপত্তিগত ব্যাখ্যায় মূল ভিত্তি নীলচাষকে ঠিক রেখেই নীলচাষের ইংরেজি প্রতিশব্দ নীলফার্মার করা হয়েছে। আর এই নীলফার্মার থেকে নীলফার্মারী এবং তা থেকে নীলফামারী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। শব্দটি প্রায় মূলানুরূপভাবেই উচ্চারিত। লক্ষণীয় যে, দেশের উত্তরাঞ্চলের শিক্ষিত-অশিক্ষিত অনেক লোকই পেশাগত অনেক শব্দকে বিকৃত কিংবা ভ্রমাত্মক ইংরেজি উচ্চারণ করে থাকেন। যেমন : মাস্টারি, লিডারি, পোদ্দারি ইত্যাদি। অনুরূপ ভুল বচনে ফার্মার থেকে ফার্মারী শব্দটি এসেছে। একইভাবে নীলফার্মারী থেকে নীলফামারী শব্দটি এসেছে বলে

www.pathagar.com

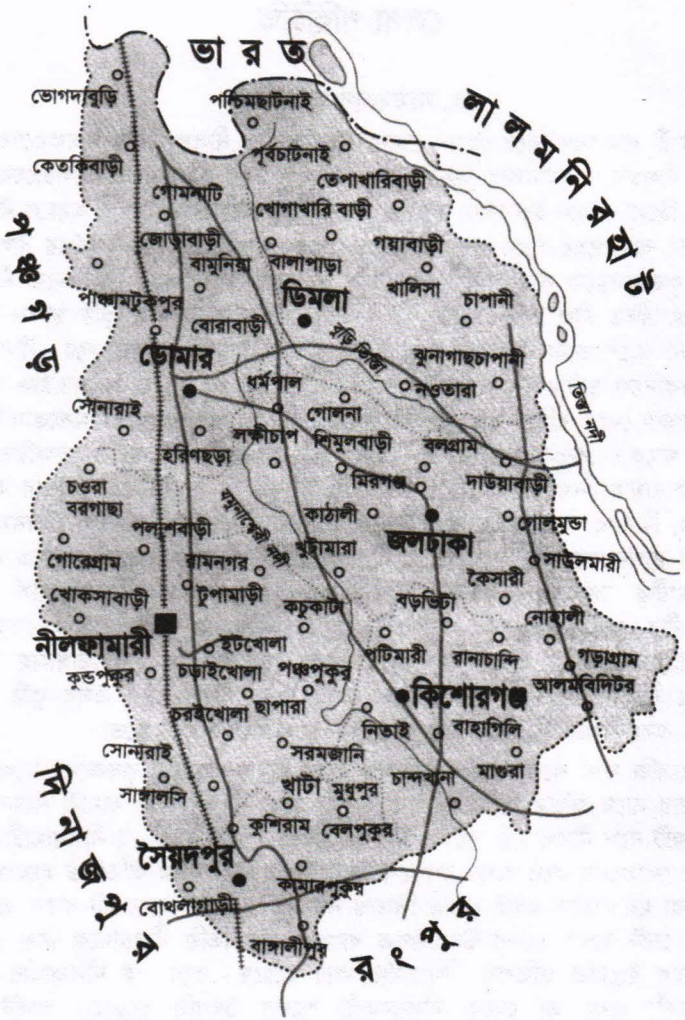


নীলফামারী জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

ধারণা করা হয়। চূড়ান্ত বিচারে বলা যায় যে, নীল এবং ফার্মার শব্দ দুটির সমন্বিত রূপ নীলফার্মার এবং সেখান থেকে উচ্চারণ বিবর্তনে নীলফামারী নামের উৎপত্তি হয়েছে। অতএব নীলফামারী শব্দটিকে নীলখামারী শব্দের অপভ্রংশ মনে না করে বরং প্রায় অবিকল নীলফার্মারীর সহজ উচ্চারণিক শব্দ সংক্ষেপ বলে গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

নীলফামারী জেলা পূর্বে রংপুর জেলার একটি মহকুমা ছিলো। যদিও প্রথমে সৈয়দপুরকেই এই মহকুমা করার প্রস্তাব করা হয়েছিলো। কিন্তু সৈয়দপুরের তুলনায় নীলফামারীতে সুপেয় জল লাভ করা সহজ বিবেচনা করে তৎকালীন সিভিল সার্জন কে.ডি ঘোষাল সৈয়দপুরের পরিবর্তে নীলফামারীকেই মহকুমা সদর করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন। অতঃপর ১৮৭৫ সালে নীলফামারীতে মহকুমা সদর স্থাপন করা হয়। ১৯৭২ সালে মহকুমা সদরকে পৌরসভায় উন্নীত করা হয়। ১৯৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি নীলফামারী মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়। সর্বশেষে সদর উপজেলাসহ ডিমলা, ডোমার, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ ও সৈয়দপুর উপজেলা নিয়ে নীলফামারী জেলা গঠিত হয়েছে। ডিমলা উপজেলার আয়তন ৩২৬.৮০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ২১৮১০০ জন। এখানে থানা সদর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সালে। জানা যায়, ষোলো শতকের দিকে 'মোহাম্মদ কলিমুল্লাহ নামক একজন প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। তার নামানুসারে এই এলাকার নাম হয় 'মোহাম্মদগঞ্জ'। ১৮৮০ সালে ভারতের বর্ধমান জেলার দশঘোড়া অঞ্চলের জমিদার এই এলাকাটি নিলামে কিনে নেন। তিনি এখানে ডিম্বাকৃতির একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে এই ডিম্বাকৃতির প্রাসাদের জন্য এই এলাকাটি সাধারণ লোকজনের কাছে ডিমলা নামে পরিচিতি লাভ করে। আবার নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক মতানুসারে প্রাক চর্যার যুগে উত্তরবঙ্গে ডিমাসা, রাভা, মোরাঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর লোক এখানে বসবাস করতো। এই ডিমাসা জাতির বসবাস থেকে ডিমলা নামকরণ হয়েছে এমন মতবাদও প্রচলিত আছে। ডোমার উপজেলার আয়তন ২৫০.৮৪ বর্গকিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২১৬৫৮০ জন। এখানে থানা সদর প্রতিষ্ঠার সঠিক সন তারিখ পাওয়া যায় নি। ডোমার অঞ্চলের পূর্ব নাম ছিলো ডোমন নগর। জানা যায় কৈবর্ত্য জাতির রাজত্ব কালে (১০৭১ সালে) ভীম এর রাজধানী ছিলো ডোমন নগর। ধারণা করা হয় ডোমন নগর পরিবর্তিত হয়ে ডোমার হয়েছে। আবার বলা হয়ে থাকে, ডোম জাতি গোষ্ঠীর লোকেরা এখানে বসবাস করতো বলে এ অঞ্চলের নাম হয়েছে ডোমার। ডোমরা সাধারণত বাঁশ দিয়ে জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন উপকরণ যেমন : ডালি, কুলা, চালুন, খাঁচা ইত্যাদি তৈরি করতো। অনেকে মনে করেন কৈবর্তদের শাসনামলে উত্তরবঙ্গে ডোম সৈন্যদের প্রাধান্য ছিলো। সে সময় তারা সমাজে সম্মানজনক অবস্থানে থেকে সচ্ছল জীবনযাপন করতো। মধ্যযুগের সেই ডোম সম্প্রদায়ের আধিপত্য থেকে ডোম নগর নামকরণ হয়েছে। পূর্ববর্তী ডোম নগরের পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত নামই আজকের ডোমার।

জলঢাকা উপজেলার আয়তন ৩০৩.৫২ বর্গকিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২৭৪৮৮০জন। এখানে থানা সদর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯১১ সালে। জলঢাকা শব্দটি এসেছে মূলত জলধাক্কা শব্দ থেকে। ভুটানে উৎপন্ন একটি নদীর নাম ছিলো জলধাক্কা।

www.pathagar.com

এ নদীটি ভুটান অতিক্রম করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তিস্তা নদীতে মিলিত হয়েছে। এই জলঢাকা নদীর তীরে বিভিন্ন এলাকার লোকজন এসে বসতি স্থাপন করে এখানে একটি বাণিজ্য নগরী গড়ে তোলেন। জলধাক্কা নদীর কারণে এখানে বাণিজ্য নগরী গড়ে উঠেছিলো বলে এলাকার নামকরণ হয়েছে জলঢাকা। স্থানীয় অধিবাসীদের মতে, প্রাকৃতিকভাবে এই এলাকাটি নিচু হওয়ায় বছরের অধিকাংশ সময় এলাকাটি জলমগ্ন থাকতো বলে এর নামকরণ হয়েছে জলঢাকা। কিশোরগঞ্জ উপজেলার আয়তন ২৬৪.৯৮ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ২৫৫৮৮০জন। ১৯২১ সালে এখানে থানা সদর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জানা যায়, এক সময় এই এলাকায় কিশোরী মোহন রায় নামক একজন প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। এই জমিদারের নামানুসারে এই এলাকার নামকরণ হয় কিশোরীগঞ্জ। পরবর্তীতে কিশোরীগঞ্জ পরিবর্তিত হয়ে কিশোরগঞ্জ নামে পরিচিতি লাভ করে।

সৈয়দপুর উপজেলার আয়তন ১২১.৬৮ বর্গকিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২৩২২০৯জন। এখানে থানা সদর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯১৫ সালে। জানা যায় অতীতে একটি সৈয়দ পরিবার ভারতের কোচবিহার থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের মহান বাণী প্রচার করেন। এই সৈয়দ পরিবারের নামানুসারে এই এলাকার নামকরণ হয়েছে সৈয়দপুর।

## খ. ভৌগোলিক অবস্থান

বিশ্বপরিমণ্ডলের কর্কটক্রান্তির সামান্য উপরে অবস্থিত বর্তমান নীলফামারী জেলা। এ জেলার উত্তরে ভারতের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা, দক্ষিণ ও পূর্বে রংপুর জেলা, পশ্চিমে দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলা অবস্থিত। এ জেলা ২৫.৪৪ থেকে ২৬.১৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.৪৬ থেকে ৮৯.১২ পূর্ব অক্ষাংশে অবস্থিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে নীলফামারী নামের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। ব্রিটিশ সরকার ১৭৯৩ সালে বৃহত্তর রংপুর জেলায় ২২টি থানা সৃষ্টি করলে ডিমলা, দারোয়ানী, বারোয়ানী এবং বাগদুয়ার নামে এই অঞ্চলে চারটি থানা সৃষ্টি হয়। সে সময়ে গঠিত দারোয়ানী থানা বর্তমান নীলফামারী সদর ও সৈয়দপুর থানার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিলো। বারোয়ানী বর্তমান জলঢাকা নিয়ে, ডিমলা কিশোরগঞ্জ, ডোমার ও ডিমলা নিয়ে এবং বাগদুয়ার বর্তমান নীলফামারী ও সৈয়দপুরের সাথে সংযুক্ত ছিলো।

অনেকে মনে করেন বর্তমান ডোমার উপজেলার বাকডোকরা নামক স্থানে সর্বপ্রথম নীলফামারী মহকুমার অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করে এই মহকুমার কার্যক্রম শুরু হয়েছিলো। ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায়, মহকুমা কার্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে ১৮৮২ সালের ১৯মে বর্তমান নীলফামারী জেলাপ্রশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন স্থানে মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয় স্থাপিত হয়েছিলো। শুরুতে নীলফামারী মহকুমাকে তিনটি থানায় বিভক্ত করা হয়েছিলো। সেগুলো হলো নীলফামারী সদর, ডিমলা এবং জলঢাকা থানা। ১৯৩৫ সালে নীলফামারী মহকুমাকে ৬টি থানায় বিভক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

## গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বর্তমান নীলফামারী জেলা একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ অঞ্চল। অনেক ভাঙাগড়ার ইতিহাস বক্ষে ধারণ করে আজকের নীলফামারী স্বমহিমায় মহিমান্বিত। মুসলিম শাসনামলে সমগ্র নীলফামারী কয়েকটি পরগনা বা চাকলার সমষ্টি ছিলো। পূর্বের সেই চাকলাগুলোর সীমানা বর্তমানে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তবে যতটুকু জানা যায়, বর্তমান কাজিরহাট পরগনার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয়েছিলো নীলফামারী। বর্তমানে কাজিরহাট একটি নগণ্য হাট মাত্র। এটি নীলফামারীর দারোয়ানী রেল স্টেশনের পশ্চিম দিকে দুমাইল দূরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ করতোয়া নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত।

পাঠান আমলে কাজিরহাট চাকলা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলো। এই হাটের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে এখনো অতীত কালের দালানকোঠার ধ্বংসাবশেষ স্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। মুসলিম শাসনামলে এই এলাকাটির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিলো তা পার্শ্ববর্তী এলাকার দালানকোঠার ধ্বংসাবশেষ, দিঘি এবং রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখে সহজে অনুমান করা যায়।

কাজিরহাটের পূর্বদিকে অর্ধমাইল দূরে কাজিরহাট-দারোয়ানী রেল স্টেশনের পাশে ভাঙ্গা মসজিদ নামে একটি বড় মসজিদ ছিলো। লোকমুখে জানা যায়, এত উঁচু মসজিদ নাকি পূর্বে পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোথাও ছিলো না। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলের আরও একটি পুরাতন মসজিদ কালের সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। এটি কাজিরহাটের পূর্ব দক্ষিণ কোণে বর্তমান সোনারায় গ্রামে অবস্থিত ছিলো। কাজিরহাট থেকে এ মসজিদের দূরত্ব ছিলো প্রায় দেড় কিলোমিটার। মসজিদটির উচ্চতা ছিলো প্রায় ৩০-৩৫ ফুট। মোগল শিল্পকলার নান্দনিক কারুকার্যময় এ মসজিদটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলো।

মূলত পুরাকালের নদী বিধৌত একটি সমতল ক্ষেত্রই হলো আজকের নীলফামারী। পলি দ্বারা গঠিত বলে এর উর্বর মাটিতে সব ধরনের ফসল ফলত আশাতীতভাবে, এখনো ফলে। তবে তিস্তা ও করতোয়ার প্রমত্ত জলরাশি যেমন এর ভূভাগে পলি জমাতো তেমনি অনেক সময় এর স্থলভাগ প্রমত্ত জলে প্লাবিত হতো। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নীলফামারীবাসীর তখন দুঃখের পরিসীমা থাকত না।

নীলফামারী সম্পর্কে জানতে হলে এর স্থলভাগের অতীত ইতিহাস জানতে হয়। নদীর প্রবল স্রোতধারায় নিম্নে অবস্থিত এককালের নীলফামারী কিভাবে এহেন জনারণ্যে পরিণত হয়েছে সে ইতিহাস এক দিনের নয়, শত শত বছরের উত্থান-পতনের ইতিহাস এর সাথে জড়িত। এ ইতিহাস মানুষকে ভাবিয়ে তোলে, মুগ্ধ করে।

বাংলাদেশের ভূঅঞ্চল মূলত পুরাভূমি ও নব্যভূমি এই দুভাগে বিভক্ত। এরমধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও রাজশাহী জেলাসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ পুরাভূমির অন্তর্ভুক্ত। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এ এলাকার মাটির প্রাচীন বৈশিষ্ট্য অবলোকন করে তাই এর নাম দিয়েছিলেন 'বারিন্দ্র'। ভূতত্ত্ব ও জনতত্ত্ব দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলার ভূঅস্তিত্বের মূল কেন্দ্রভূমি ছিলো বরেন্দ্রভূমি অঞ্চল এবং এই অঞ্চলেই বাংলার প্রথম প্রাগৈতিহাসিক মানবের আবির্ভাব ঘটেছিলো বলে ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন।

www.pathagar.com

বরেন্দ্রভূমিতে বুদ্ধদেবের আগমনের পূর্বে জৈন ধর্ম প্রসার লাভ করেছিলো বলে প্রাচীন জৈন ধর্ম গ্রন্থাদিতে প্রমাণ রয়েছে'।

গ্রিক ইতিহাসবিদ টলেমির তথ্য থেকে জানা যায় যে, 'সমকালীন বাংলার সর্বোত্তর কেন্দ্রে কিরাদিয়া নামে যে প্রদেশটি ছিলো রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া সেই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল ছিলো। পূর্বে এসব অঞ্চলে অস্ট্রিক ও নিষাদ জাতির লোকেরা বসবাস করতো।' কিরাদিয়া মূলত করতোয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চল। কেউ কেউ মনে করেন করতোয়ার আদি নাম ছিলো কিরাদিয়া। আবার কেউ কেউ চিনা ভাষায় নদীর নাম কলো-তু হতে করতোয়া নদীর উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। কিরাত অর্থ নিষাদ-ব্যাধ। এই কিরাদিয়া বা করতোয়া নদী তীরবর্তী জনপদের অধিবাসীদের মধ্যে হয়তো সেকালে অনেকে কিরাত বা ব্যাধ ছিলো বলে ধারণা করা হয়।

বুকাননের বর্ণনা অনুযায়ী, করতোয়া নদী কামরূপ ও বঙ্গদেশের সীমানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আবার উইলিয়াম হান্টারের তথ্য থেকে জানা যায়- রাজা ধর্মপাল নীলফামারীর ডিমলা থানার কয়েক মাইল দক্ষিণে এবং জলঢাকা থানার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে রাজধানী নির্মাণ করে রাজত্ব করেছিলেন। উল্লিখিত সময়ে ডিমলা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। রাজা রামপালের রাজধানী তিস্তা নদীর ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত ছিলো।

নীলফামারী অঞ্চলে ময়নামতি নামক যে দুর্ধর্ষ রানি মাতার কাহিনি এখনো লোক মুখে প্রচলিত আছে, সেই ময়নামতি মূলত ধর্মপাল রাজার শ্যালিকা বলে কথিত আছে। স্থানীয় দেওনাই নদীর পশ্চিম তীরে ময়নামতির দুর্গ অবস্থিত ছিলো। ময়নামতির পুত্রের নাম ছিলো গোপীচন্দ্র। ময়নামতি তার পুত্রের সিংহাসনের অধিকার আদায় করার জন্য ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিস্তা নদীর নিকটে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ধর্মপাল নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেন। অতঃপর ধর্মপালের পরিত্যক্ত সিংহাসনে গোপীচন্দ্র আসীন হন।

গোপীচন্দ্র হরিশচন্দ্র রাজার (জলঢাকা উপজেলার হরিশচন্দ্র পাটের রাজা) দুই মেয়ে অদুনা ও পদুনাকে বিয়ে করেন। স্থানীয় চাড়ালকাটা নদীর দক্ষিণ তীরে একটি সুউচ্চ টিলার পরে হরিশচন্দ্রের পাট নামক একটি সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। এটিও কামরূপ রাজ্যের অধীনে ছিলো। পরবর্তীতে গোপীচন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগে বর্তমানে সিকিমে বসবাসকারী কোচ, মেচ, গাড়ো, ভোট ও লেপচারা তৎকালীন কামরূপ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে রাজা হরিশচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন। জলঢাকা উপজেলার হরিশচন্দ্রের পাট বলে কথিত স্থানটি রাজার দরবার গৃহ অথবা মন্দির বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। উল্লিখিত রাজবাড়ি বা পাটের উত্তরে দুয়ো সুয়ো নামে দুটি পুকুর আজও বিদ্যমান। ধারণা করা হয় উক্ত পুকুর দুটি রাজকন্যা অদুনা ও পদুনার স্মৃতি বহন করছে।

উল্লিখিত আলোচনায় আমরা নীলফামারী অঞ্চলে তিনজন প্রাচীন রাজার রাজবাড়ির পরিচয় পাই। প্রথমত ধর্মপাল রাজার বাড়ি, দ্বিতীয়ত ময়নামতি তথা গোপীচন্দ্রের রাজবাড়ি এবং তৃতীয়ত রাজা হরিশচন্দ্রের রাজবাড়ি বা পাট। কিংবদন্তি

www.pathagar.com

অনুসারে এসব রাজার রাজ্যের সীমানা নিয়ে মতভেদ থাকলেও আমাদের আলোচনায় সন্নিবেশিত তথ্যকে সত্য বলে স্বীকার করার সমূহ কারণ রয়েছে। ধর্মপাল, ময়নামতি, হরিশচন্দ্র সকলেই ঐতিহাসিক চরিত্র এবং পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কিত। নীলফামারী অঞ্চলে এদের নামের সাথে সঙ্গতি রেখে ধ্বংসাবশেষগুলোর দিকে তাকালে এদের ঐতিহাসিক সত্যের দিকটি সহজে অনুধাবন করা যায়।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে নীলফামারী অঞ্চলের আরো কিছু রাজনৈতিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, 'রামপালের সাথে যুদ্ধের সময় ভীমের সেনাপতি হরি নীলফামারীর ডোমার থেকে ডোম সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। আর এই ডোমদের যুদ্ধযাত্রার ছবি 'আগডুম বাগডুম' নামক একটি বিখ্যাত ছড়ার জন্ম দিয়েছে। অবশ্য যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজা ভীম এবং তার সেনাপতি হরি বন্দি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে রামপাল রাজা উপাধি লাভ করেন।

এই রামপালের নামানুসারে এ অঞ্চলে রামগঞ্জ, রামনগর, দিনাজপুরের রামসাগর (দিঘি) প্রভৃতি নামের উদ্ভব হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

অনেক ইতিহাসবেত্তা মনে করে থাকেন ভীম ডোমারে বসবাস করেননি। তবে পার্বত্য উপজাতিদের মোকাবেলার্থে ডোমারে এক সুউচ্চ দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন মাত্র। ভীমের নির্মিত দুর্গ মৃৎ-প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিলো। মৃৎ-প্রাচীরকে 'ডমর' বলা হতো। এই 'ডমর' থেকে ডোমার অথবা 'ডমন নগর' বা 'ডোম নগর' (ডোম সৈন্যদের শহর) থেকে ডোমার নামের উৎপত্তি হওয়া বিচিত্র নয়। এ প্রসঙ্গে 'আগডুম বাগডুম ছড়াটির স্থানীয় অর্থ বিবৃত করা যেতে পারে। আগডুম অর্থে অগ্রবর্তী ডোম সৈন্য বাহিনী, বাগডুম অর্থে বাঘের ন্যায় তেজোবীর্যবান ডোমবাহিনী এবং ঘোড়াডুম অর্থে অশ্বারোহী ডোমবাহিনীর কথা বলা হয়েছে। আর রণবাদ্যের উপকরণ ছিলো ঢাক, মৃদঙ্গ, ঝাঝর ইত্যাদি।

ইতিহাসের ক্রমধারায় আজকের যে নীলফামারী অঞ্চল আমরা লক্ষ করি তা বহুমাত্রিক ঐতিহাসিক ঘটনার চড়াই-উতরাই এর ফসল। এ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম, গঞ্জ, নগর এবং হাটবাজারের নামের সঙ্গে যে সকল কাহিনি সম্পৃক্ত আছে সে সকল কাহিনি বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। এসব ঐতিহাসিক সত্যের পর্যায়ক্রমিক পরিচয় মেলে ইংরেজ আমলের পর থেকে।

ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে অর্থাৎ ১৭৮৩ খ্রি. কাজীরহাট (নীলফামারী) কাকিনা, ফতেপুর ও টেপার প্রজা সাধারণ ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক আরোপিত দুরিভিলা ট্যাক্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য একজনকে নবাব করে প্রজাদের নিকট থেকে যৎসামান্য যে কর আদায় করা হতো তা 'ঢিং খরচা' নামে পরিচিত ছিলো। নীলফামারী সদরের পঞ্চপুকুর ইউনিয়নে অদ্যাবধি 'ঢিং ঢিং পাড়া' নামে একটি গ্রাম এ নামের স্মৃতি বহন করছে।

এর পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের যে বহ্নিশিখা জ্বলেছিলো, সেই বহ্নিশিখা থেকেও নীলফামারী অঞ্চল নিস্তার পায়নি। কিংবদন্তি অনুযায়ী জানা যায় যে, সন্ন্যাসী বা ফকিরদের দম্পতিদের মধ্যে মজনু শাহের

www.pathagar.com

ভ্রাতা মুসা শাহ বর্তমান কিশোরগঞ্জ থানার দক্ষিণে এক মাইল দূরে গভীর অরণ্যে বর্তমান মুশা নামক গ্রামে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আখড়া তৈরি করে বাস করতেন। এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামে তার অধীনস্থ সিপাহিদের যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দিতেন। সৈন্যদের বন্দুক চালানোর 'চাঁদমারী' উক্ত স্থানে ছিলো বলে ঐ গ্রামের নাম 'চাঁদখানা' রূপান্তরে 'চাঁনখানা' হয়েছে।

ইতিহাস থেকে আরো জানা যায় যে, সন্ন্যাসী নেতা ভবানন্দ পাঠকের সহযোগী ছিলেন ইতিহাস খ্যাত স্বর্গীয় দেবী চৌধুরানি। ১৭৮৪ সালে ভবানন্দ পাঠক ব্রিটিশ সিপাহিদের হাতে প্রাণ হারালে ফকির বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। স্থানীয় সাধারণ মানুষ তাদের ভুলেনি। তাদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ভবানন্দ পাঠকের নামে এ অঞ্চলে ভবানীগঞ্জ নামে একটি প্রসিদ্ধ হাটের পত্তন হয়েছে। একইভাবে রানি জয় দুর্গা দেবীর নামে (দেবী চৌধুরাণী) জয়গঞ্জ হাট ও ঘাট এবং দেবীগঞ্জ নামকরণ হয়েছে।

উল্লিখিত হাট ও ঘাটগুলো নদীবন্দরে অবস্থিত। এই ঘাটগুলোতে বিদ্রোহীরা বজরা রেখে স্থলে গমন করতো। তারা মাঝে মাঝে ছিপ নৌকা ব্যবহার করতো (এক ধরনের দ্রুতগামী নৌকা)। ছিপ নৌকা ব্যবহারে এরা সিদ্ধহস্ত ছিলো বলে জানা যায়। উক্ত ছিপ নৌকার স্থানীয় নাম ছিলো ভাওয়াইল্লা। এই ভাওয়াইল্লার নামে নীলফামারীর চিলাহাটি ইউনিয়নে ভাওলাগঞ্জ হাটের নামকরণ হয়েছে।

ফকির বা সন্ন্যাসী বিদ্রোহ খানিকটা দমন হলেও তাদের অবশিষ্ট কিছু বংশধর এতদঅঞ্চলে আস্তানা তৈরি করে তাদের স্বার্থ হাসিল করতো। এসব আস্তানাকে মাদাবের থান বা সন্ন্যাসীর থান বলা হতো। নীলফামারী জেলার প্রায় সকল গ্রামেই এই মাদাবের থানের স্থান ছিলো। নীলফামারীর সোনারায় ইউনিয়নের পূর্ব সীমায় অবস্থিত মাদারগঞ্জ হাটের নামকরণ এরূপ আস্তানার নাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

একথা পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, নীলফামারী মূলত বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার চড়াই-উতরাইয়ের ফসল। কালের বিবর্তনে ঘটনার পরম্পরায় নীলফামারীবাসীর জীবনে পরবর্তীতে নেমে এলো নীলকরদের অমানবিক নির্যাতনের কালমেঘ। তবে নীলকরদের অযাচিত নির্যাতন এ অঞ্চলের প্রাচীনগত বৃহৎ সীমানা জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিলো না। বর্তমান নীলফামারী জেলা এবং বিশেষ করে সদর অঞ্চলে নীলকরদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে নীলফামারীবাসীকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, যশোর কুষ্টিয়া অঞ্চলে নীলবিদ্রোহ হয়েছিলো। দীনবন্ধুমিত্রের লিখিত নীলদর্পণ নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র পাওয়া যায়। ১৮৫৯-৬০ সালে এতদঅঞ্চলে নীলবিদ্রোহ ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়। স্থানীয় একটি লোককবিতা থেকে আমরা এ অঞ্চলের নীলবিদ্রোহের তথ্য অবগত হই :

মুল্লুকের গুড়াগুড়ি কবিতার শুরু করি
যা করেন গুরু।
শুনো কুঠালের সমাচার কালিদহে কুঠি যার
ক্যানি সাহেব ক্যাজার করলো শুরু।

www.pathagar.com

সে আউসের জমিতে বুনে নীলসব রায়তের হলো মুশকিল
সব রায়তের মনে অবিস্তর।
দিলেতে পাইয়া ব্যথা নালিশ করে কলিকাতা
দরখাস্ত দিলো তিন সয়াল।
দরখাস্তে হলো স্পষ্ট, লাঠ সাহেব হলো ব্যস্ত,
বাঙ্গালাতে পাঠালো গবনাল।
গবনাল এলো বাঙ্গালা পরে, ধুমাকলে নৌকা চলে,
বলবো কি সে নৌকা সাজের কথা।
তার দুপাশে দুই চাকা ঘুরে, চলে কেবল আগুন জোড়ে
গোলই বাঁধা সোনা।
তার পাছা নায়ে নিশান গাড়া ধুমাকলে নস্কার পোড়া,
মধ্য নায়ে যান ব্যস্ত পুরি।
দোহাই ধর্ম অবতার, তুমি করো সুবিচার,
ঝাপ দিলো সব ইছামতির জলে।

এই ইছামতি আমাদের পূর্বে কথিত করতোয়া নদীরই স্থানীয় নাম, যা এখনো নীলফামারীর প্রান্তিক সীমানা জুড়ে দিনাজপুরের রানির বন্দরের নিকটে সুগভীর।

এ অঞ্চলের মানুষের মনে নীলবিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিলো ১৮৫৮ সালের সিপাহি বিদ্রোহ থেকে। সিপাহি বিদ্রোহের ঢেউ তখনো মানুষের মন-মানসে ধাক্কা দিতেছিলো। কিন্তু বিদ্রোহীদের সঠিক পথে পরিচালিত করার অভাবে বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও জনমানসে তার প্রতিক্রিয়া জাগ্রত ছিলো। তারই ফলশ্রুতি হলো নীলবিদ্রোহ। বেনিয়া ইংরেজ জাতের ব্যবসায়ীক মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি ঘটে নীলচাষের মধ্য দিয়ে। যদিও এ বিদ্রোহ স্থান বিশেষে খুব বেশি দিন চলেনি তবুও ব্রিটিশ সিংহাসনের ভীতি পর্যন্ত নাড়া দিয়ে ছেড়েছে। উল্লেখ্য যে, নীলবিদ্রোহের সাথে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহীদের বংশধরেরা একাত্মতা ঘোষণা করলে নীলফামারী অঞ্চলের নীলবিদ্রোহ ভীষণভাবে দানা বেঁধে ওঠে। তখন নীলফামারী থানার বেড়াকুঠি গ্রামে নীলকরদের প্রধান আড্ডা ছিলো।

করতোয়া নদীর জলধারায় সৃষ্ট নলবাড়ি বিলে আত্মগোপনকারী নীলবিদ্রোহীরা এক মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত বেড়াবাড়ি কুঠি আক্রমণ করলে সাহেবেরা তথা হতে খোড়া নদী ও সর্বমঙ্গলা পার হয়ে সঙ্গলসীর কুঠির দিকে ধাবিত হয়। এদিকে আবার দক্ষিণ দিক থেকে বোতলাগাড়ির বিদ্রোহীরা এগিয়ে আসলে নীলকর সাহেবেরা পূর্ব দিকে চড়াইখোলার কুঠিতে আশ্রয় নেয়ার জন্য দৌড়াতে থাকেন। পথে এলংমারী নামক স্থানে ইংরেজ কুঠিয়ালদের সাথে বিদ্রোহীদের মোকাবিলা হয়। ইংরেজদের অনেক সৈন্য হতাহতের পর তারা কচুয়ার জঙ্গলের পাশ দিয়ে শেখের হাটের দিকে পলায়ন করে। পরে দিলালপুরের বিদ্রোহীরা তাদের পিছু ধাওয়া করে অবশিষ্ট সৈন্য খতম করে।

www.pathagar.com

অপরদিকে তরনীবাড়ি ও নীলফামারী কুঠি আক্রমণ করা হলে কুঠিয়ালরা রামনগরের পথে পালাতে শুরু করে। উদ্দেশ্য দেওনাই নদীতে নৌকা ভাসিয়ে তারা শেখের হাটে পৌঁছাবে। কিন্তু জনতা একবার ক্রুদ্ধ হলে তাদের দমন করা মুশকিল। মানুষ মারার বিদ্রোহীরা তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। ফলে সাহেবদের গর্দানগুলো কচুকাটা বন্দরের নিকট কচুকাটা করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এবং টুপামারিতে ইংরেজদের ট্রুপ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। এই ইংরেজ ট্রুপ থেকে টুপামারী এলাকার নামকরণ হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পলাতক বিদ্রোহীদের কিছু শিষ্য-সাগরেদ যারা বৈরাগী নাম ধারণ করে জীবিকা নির্বাহ করতো তারা নীলবিদ্রোহে গোপন সংবাদদাতার ভূমিকা পালন করেছিলো। আজও বাজিতপাড়া, নিত্যানন্দী দোনদরী ও বারাতি নামক গ্রামে তাদের দু-একটি আস্তানার অস্তিত্ব দেখা যায়। এরপর ইংরেজ কুঠিয়ালরা যখন জানলো নেপাল ও কোচবিহারের সন্ন্যাসী ও প্রজা বিদ্রোহের বিদ্রোহী সৈন্যের বংশধরেরা এই নীলবিদ্রোহের সাথে সংযোগ স্থাপন করে চলছে; তখন তারা তাদের শেখের হাটের মহকুমা দপ্তর গুটিয়ে বর্তমান ডোমার উপজেলার বাঘডোগড়া গ্রামে মহকুমা দপ্তর স্থাপন করে। এর মধ্যে টেঙ্গনমারীতে কিশোরগঞ্জের নীলকর সাহেবদের টাঙন নামক ঘোড়াগুলো (ভুটানের এক জাতীয় ঘোড়া) বেঘোরে প্রাণ হারায়। কুঠিয়ালদের এরকম বেগতিক অবস্থা দেখে অবশেষে অনতিবিলম্বে ইংরেজ সরকার আইন পাস করে নীলকর সাহেবদের দমন করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ১৮৭২ সালে নীলবিদ্রোহের উপশম হয়।

বাঘডোগড়া গ্রামটি যোগাযোগবিহীন একটি নগন্য গ্রাম হওয়ার ফলে অন্যান্য অঞ্চলের সাথে এর যোগাযোগের অসুবিধা দেখা দেয়। ফলে ১৮৭৫ সালে বর্তমান নীলফামারী সদর অঞ্চলে নীলফামারী মহকুমার সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। এ বিষয়ে সরকারি কাগজপত্রে এর যথার্থ প্রমাণও মেলে। অবশেষে কালের যাত্রায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৮৪ সালে নীলফামারী মহকুমা পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

### তেভাগা আন্দোলন

বর্তমান নীলফামারী জেলার ডিমলা ও ডোমার থানা এবং জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ থানার অংশবিশেষ তেভাগা আন্দোলনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। এই এলাকাটি দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগা এলাকার সাথে সংযুক্ত ছিলো। নীলফামারীর তেভাগা এলাকার কৃষকরা ছিলো মূলত মুসলিম ও রাজবংশী। অক্টোবরের শেষের দিকে রংপুর জেলা কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার বৈঠকে সমগ্র জেলাব্যাপী আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর পরই জেলার নেতৃবৃন্দ তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় চলে যান। কৃষক নেতা মণিকৃষ্ণ সেনের দায়িত্বে ছিলো ডিমলা থানা। এছাড়া মহী বাগচী, হরিকান্ত সরকার, চাটি মোহাম্মদ, নৃপেন ঘোষ প্রমুখ এই থানার অন্যতম নেতা ছিলেন। ডোমার থানার দায়িত্বে ছিলেন দীনেশ লাহিড়ী, অবনী বাগচী, মোহন, কেষ্ট, রূপকান্ত প্রমুখ নেতা এবং কসিম উদ্দিন, নারায়ণ, পাচু প্রমুখ কৃষক কর্মী।

www.pathagar.com

নীলফামারীতে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ধানকাটা শুরু হয়। ধানকাটা শুরু করার প্রথম থেকে জোতদাররা তেভাগা আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে। ডোমার থানায় কৃষকদের বৈঠকের জন্য ১৪ ডিসেম্বর হাটে ঢোলাই দেওয়ার সময় জোতদাররা ঢোলাই দিতে বাধা দেয়। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মঙ্গলবার হাটের দিন হরতাল। ঐদিন হাটে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। জোতদার খোকা ঠাকুর ঘাবড়ে গিয়ে কৃষকদের কাছে মাফ চাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৯ ডিসেম্বর রাতে বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামী সাত দিনের মধ্যে ডোমার থানার সব এলাকার ধান কেটে নিজেদের খোলানে তোলা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ শুরু হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে জোতদাররা ঘাবড়ে যায়। ডিমলা থানায় ধান কাটা বন্ধ করার জন্য জোতদাররা বল প্রয়োগ ও গুণ্ডামির আশ্রয় নেয়। ২০ ডিসেম্বর কৃষক নেতা মণিকৃষ্ণ সেন কৃষক নেতা বাবুরী বর্মণের বাড়িতে দুপুরের খাবার খাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় স্থানীয় জোতদার কোরামল গুণ্ডাপাণ্ডা নিয়ে তার উপর আক্রমণ করে। এতে মণিকৃষ্ণ সেন মাথায় গুরুতর আঘাত পান। এই আক্রমণের সময় বাবুরী বর্মণের বৃদ্ধা মা গাইন দিয়ে গুণ্ডাদেরকে পাল্টা আক্রমণ করে জোতদারকে মারতে শুরু করে। পরে গুণ্ডারা এই বৃদ্ধাকে আক্রমণ করলেও পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই আক্রমণের প্রতিবাদে ২৪ ডিসেম্বর স্থানীয় সটিবাড়ি হাটে কৃষকদের বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে জোতদাররা পিছু হটতে বাধ্য হয়। পুরোদমে ধান কাটা অব্যাহত থাকে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলনের শুরুতে কৃষককর্মী তন্নরায়ণ জোতদারের গুলিতে নিহত হন। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে এক সন্ধ্যায় জোতদাররা সদলবলে খগাখড়িবাড়ি গ্রামের কৃষকদেরকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য ৫টি বন্দুকসহ আক্রমণ করে। এই আক্রমণের নেতা ছিলেন মশিয়ুর রহমান যাদুমিয়া। জোতদারদের এলোপাথাড়ি গুলিতে তন্নরায়ণ ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং বাচ্চাই মোহাম্মদসহ আরো ১০-১৫জন কৃষক আহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের পর কৃষকরা ভয় না পেয়ে জোতদার এবং তাদের গুণ্ডাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অবস্থা বেগতিক দেখে জোতদাররা পালিয়ে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন নীলফামারী শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। হাজার হাজার কৃষক সমাবেশে উপস্থিত হয়ে কর্মসূচিকে সফল করেন। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে নীলফামারীর তেভাগা এলাকাকে মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অস্ত্রধারী পুলিশের পক্ষেও এই মুক্ত এলাকায় প্রবেশ করা সম্ভব হতো না। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দেশবিভাগের পর তেভাগা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

### ভাষা আন্দোলন

১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা দবির উদ্দিন আহমদের বৈঠকখানায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের একটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলার' দাবিটি সবার বক্তব্যে উঠে আসে। দবির উদ্দিন আহমদ, আবু নাজেম মোঃ আলী, শামসুল হক প্রমুখ রাষ্ট্র ভাষা বাংলার পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। এই আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রলীগ নেতারা ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব



www.pathagar.com

উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবিতে ৪ ফেব্রুয়ারি নীলফামারীর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (সম্ভব হলে থানাসহ) ধর্মঘট, ছাত্রমিছিল ও ছাত্রসভা পালন করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এই কর্মসূচি সফলভাবে পালন করার জন্য আবু নাজেম মোঃ আলী, শামসুল হক, শওকত আলী, শফিয়ার রহমান, অলিয়ার রহমান, খোরশেদ আলম, আব্বাস আলী, খাদেমুল হক প্রমুখ ছাত্র নেতার উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ কর্মীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে নীলফামারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ধর্মঘটের স্বপক্ষে পিকেটিংকালে দুটি প্রতিষ্ঠানে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে। বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে মুসলিম লীগ সমর্থিত ছাত্র সংগঠন 'নিখিল পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগে'র পক্ষ থেকে আবু তাহেরের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক ছাত্র ধর্মঘট পালনে সাধারণ ছাত্রদেরকে বাধা দেয়। এ নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে প্রধান শিক্ষক আছির উদ্দিন আহমদের হস্তক্ষেপের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধান হয়। বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পিকেটিংকালে এস.ডি.ও সাহেবের মেয়ে ধর্মঘটের বিরোধীতা করলেও শেষ পর্যন্ত সব ছাত্রী ধর্মঘটে যোগদান করে। এসময় ছাত্রী নেতৃবৃন্দের মধ্যে হালিমা খাতুন, জাহেদা বেগম, জাকিয়া সুলতানা, মমেনা বেগম, রেজিয়া বানু প্রমুখের নাম উলেখযোগ্য। ধর্মঘট শেষে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী মিছিল সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করে টাউন ক্লাব প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়।

বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা খয়রাত হোসেন এ সময় ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি ঢাকা থেকে নীলফামারীর আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালন করার নির্দেশ প্রদান করেন। তার নির্দেশের প্রেক্ষিতে পুনরায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের নেতারা জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি নীলফামারীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন এবং মিছিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। থানা পর্যায়েও এই কর্মসূচি পালন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি কোন বাঁধা বিঘ্ন ছাড়াই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট সফলভাবে পালিত হয়। একই সময়ে শোভাযাত্রা ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি খয়রাত হোসেনসহ ঢাকায় বিপুল সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে নীলফামারী শহরে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। এই মিছিলে ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ জনগণও অংশ গ্রহণ করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি দবির উদ্দিন আহমদ ও আবু নাজেম মোঃ আলীকে পুলিশ গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা থানা এলাকায় সমবেত হয়ে তাদের মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ২৬ ডিসেম্বর নীলফামারী শহরে সাধারণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নীলফামারী মহকুমার ডোমার, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ ও সৈয়দপুর থানায় ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি অনুরূপ বিক্ষোভ মিছিল হয়েছিল। সরকার রাষ্ট্রভাষার দাবি মেনে নেওয়ায় এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

## ঘ. জনবসতির পরিচয়

প্রাচীন কালে ভৌগোলিকভাবে নীলফামারী কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এজন্য কামরূপ ও আসামের নৃগোষ্ঠীর সাথে নীলফামারীর নৃগোষ্ঠীর মিল দেখা যায়। নীলফামারীর নৃগোষ্ঠীর আচার আচরণ, দেহ সৌষ্ঠব ও সাংস্কৃতিক চেতনায় বহু নৃগোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে এখানে মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর প্রাধান্য বিদ্যমান। এছাড়া নিগ্রবটু, অস্ট্রিক, ভোটচীনীয়, আর্য ও সেমীয় গোত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। ধারণা করা হয় এই এলাকায় নিগ্রবটু ও আদিম যাযাবর জাতির প্রাধান্য ছিলো। এ এলাকায় অস্ট্রিকদের আগমনের পর স্থানীয় অধিবাসীরা অস্ট্রিকদের সভ্যতার সাথে মিশে যায়। অস্ট্রিকরা কৃষি কাজ জানত। অস্ট্রিকরাই সর্বপ্রথম করতোয়া অববাহিকায় কৃষি কাজ শুরু করে। অস্ট্রিকরা খর্বদেহী, বিস্তৃত নাক ও দীর্ঘ শির অধিকারী ছিলো। অস্ট্রিকদের পর এখানে দ্রাবিড়দের আগমন ঘটে। অস্ট্রিকরা কৃষি কাজ জানলেও নগর সভ্যতা সম্পর্কে তাদের তেমন কোন ধারণা ছিলো না। দ্রাবিড়দের সংমিশ্রণে তারা নগর সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এদের দৈহিক গঠন মাঝারি, কম বিস্তৃত নাক ও দীর্ঘ শিরষ্ক ছিলো। সাঁওতাল, ওরাও, মুণ্ডা, কোল বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে এদের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অনেকের মতে, শবর, কোচ, মেচ, কৈবর্ত, রাজবংশীসহ আরো অনেক নৃগোষ্ঠীর লোক এখানে বসবাস করতো।

নৃতত্ত্ববিদরা কোচ, মেচ, রাজবংশী ও পলীয়দেরকে মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন। বুকানন হ্যামিল্টন, উইলিয়াম হান্টার, ক্যাম্পবেল প্রমুখ এই মতের সমর্থক ছিলেন। রাজবংশীদের দৈহিক গঠনে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নীলফামারীতে রাজবংশীদের শেকড় প্রথিত আছে বলে অনেকে ধারণা করেন। পূর্বে কোচ ও রাজবংশীরা একই সূত্রে পরিচিত ছিলো। কোচদের অনেকেই নিজেদেরকে রাজবংশী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু রাজবংশীরা নিজেদেরকে কোচ হিসেবে পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করেন। ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে রাজবংশীদেরকে কোচ হিসেবে দেখানো হয়েছিলো। কিন্তু রংপুরের জমিদার হর মোহন রায় রাজবংশীদের ত্রিয় দাবি আদায়ের জন্য রংপুরের জেলাপ্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। পরবর্তীতে রায় সাহেব পঞ্চাননের চেষ্টায় ১৮৬৬ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে কোচ ও রাজবংশীরা পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত হন। এ সময় তারা রায়, বর্মণ, সিংহসহ বিভিন্ন পদবি ব্যবহার করা শুরু করেন। অধিকাংশ গবেষকের মতে, কোচ, রাজবংশী ও পলীয়রা একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। কালক্রমে ভিন্ন পেশা নির্বাচনের মাধ্যমে এরা নিজেদেরকে ভিন্ন গোত্রীয় বলে দাবি করে থাকেন। এদের দৈহিক আকৃতি দীর্ঘ থেকে খর্বাকৃতি, চাপা নাক, চ্যাপ্টা মুখ, দীর্ঘ মাথার খুলি, প্রশস্ত নাসিকারন্ধ্র, মাংশল শরীর।

কোচরা প্রাচীনকাল থেকে নদী অববাহিকায় বসবাস করতো। মাছ শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। এখনো তাদের অনেকেই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। মাছ, কাঁকড়া, শামুক ও কচ্ছপ তাদের প্রিয় খাবার। এখনো নীলফামারী জেলায় তিস্তা নদীর তীরবর্তী স্থানে এরা বসবাস করছেন। বর্তমানে এদের অনেকে কৃষি কাজসহ অন্যান্য পেশায় জড়িত। কোচ ও মেচরাই নীলফামারীর আদি বাসিন্দা বলে

www.pathagar.com

অনেকেই ধারণা করেন। কোচরা রাজবংশী নামে পরিচিত হওয়ার পর থেকে এই অঞ্চলে তাদের পূর্ব পরিচয় বিলুপ্ত হয়েছে। সেমীয়দের আগমনের পূর্বে নীলফামারীতে রাজবংশীদের প্রাধান্য ছিলো।

## ঙ. নদ-নদী

পুরাকালের নদী প্লাবিত অঞ্চল নীলফামারী জেলা। হিমালয় পর্বত ও আসামের বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চল থেকে পূর্বে এতদঅঞ্চলে নদী প্রবাহিত হতো। করতোয়া, তিস্তা, আত্রাই ও বহুধা শাখা নদীর জলধারা বেষ্টিত বর্তমান নীলফামারীর ভূভাগ। প্রাচীন কালে করতোয়া সচ্ছল গতিতে প্রবাহিত ছিলো। এর অববাহিকায় কৃষি কাজ হতো। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর লোকদের নদী পথেই এতদাঞ্চলে আগমন ঘটে। পূর্বকালে করতোয়া পুণ্যতোয়া হিসেবেও পরিচিত ছিলো। মহাভারতে বার বার করতোয়া নদীর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার মানচিত্রে করতোয়া নীলফামারীর উপর দিয়ে পুন্ড্রবর্ধন পর্যন্ত প্রবাহিত হতে দেখা যায়। এর স্থানীয় নাম ইছামতি। পূর্বে করতোয়া থেকে বহু শাখা নদী ও উপনদী প্রবাহিত ছিলো। এটি হিমালয়ের ভূটান সীমান্ত থেকে উৎসারিত হয়ে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি করতোয়া নদীর তীর দিয়ে যাত্রা পথে তিব্বত আক্রমণ করেন বলে জানা যায়। তিনি শিলাহাটির (বর্তমান ডোমার থানার চিলাহাটি) শিলা নির্মিত ব্রিজ অতিক্রম করে তিব্বতের দিকে অগ্রসর হন। পূর্বে করতোয়ার পরেই তিস্তার অবস্থান ছিলো। করতোয়া যৌবন কালে তিস্তার একটি খাদ হিসেবে প্রবাহিত হতো। ভূকম্পন ও বন্যায় নদীর গতি পরিবর্তনে তিস্তা সবর হয়ে উঠে। ড. বুকাননের বর্ণনা মতে, ১৮৮৭ সালে বন্যা দেশের স্থলভাগের পরিবর্তন আনে। বন্যায় সাধারণ মাটির উপর বালুর স্তর জমে কিছু পূর্ববর্তী নদীর খাদ দূরত্বে সরে গিয়ে সচলভাবে প্রবাহিত হয়েছে। আবার প্রবাহিত নদী শুষ্কতায় রূপ নিয়েছে। করতোয়া পূর্বদিক থেকে সরে গিয়ে দারোয়ানীর সামান্য দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

তিস্তা ভারতের উত্তর সিকিমের পার্বত্য এলাকা থেকে উৎপন্ন হয়ে দার্জিলিং ও কোচবিহারের উপর দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার ৫৬ কিলোমিটার অতিক্রম করে নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার ছাতনাই গ্রামের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ১৮৮৭ খ্রিঃ পূর্বে তিস্তা পদ্মা নদীর সাথে মিলিত ছিলো। পরবর্তীতে ভূকম্পন ও বন্যায় এর গতি পরিবর্তন হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীতে মিলিত হয়। নীলফামারীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদনদী হলো বুড়ি, খোড়া, চিকলী, মানাস, ঘাঘট, শালকী ও দেওনাই। দেওনাই এক সময় যমুনার গতি পথের ন্যায় একই গতিতে বা সমান্তরালভাবে চলাচল করতো বলে জানা যায়। এ পথে নীলকরেরা নীলফামারী থেকে বিভিন্ন পথে যাতায়াত করতো। দেওনাই স্থান ভেদে চাড়াল কাটা, যমুনেশ্বরী ও করতোয়া নামেও পরিচিত ছিলো।

www.pathagar.com

শালকীর উৎপত্তি করতোয়া থেকে। দেবীগঞ্জ শহরের পূর্বদিক ঘুরে বোড়াগাড়ি এলাকায় দেওনাই এর নদীতে সম্মিলন ঘটেছে। ডোমার উপজেলার তিন কিলোমিটার ভাটিতে একটি জলাশয় থেকে বুড়িখোড়া চিকলির উৎপত্তি। এটি দেওনাই ও চাড়ালকাটা নদীর সাথে একত্রিত হয়েছে। কিশোরগঞ্জ উপজেলার তিস্তার একটি শাখা থেকে উৎপত্তি হয়েছে মানাস নদীর। মানাস দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যমুনায় গিয়ে মিলিত হয়েছে।

আত্রাই নদীর উপকণ্ঠে বর্তমান খানসামা নগর। আত্রাই দিয়ে এখনো সারা বৎসর নৌকা চলাচল করে। তবে আত্রাই ক্রমশ তার যৌবন হারিয়ে বার্ধক্যে পরিণত হচ্ছে। আত্রাইয়ের দেড় কিলোমিটার দূরে ভুল্লাই বা ভূল্লি নদী। ভূল্লির দুই কিলোমিটার দূরে পূর্বে ইছামতি বা করতোয়ার মরা খাদ প্রবাহিত হয়েছে। ইছামতির পরে খোড়া নদী। খোড়া নদীর দেড় কিলোমিটার পূর্বে গুজগুজি মজা নদী, গুড় গুড়ির দুই কিলোমিটার দূরে দারোয়ানীস্থ সর্বমঙ্গলা নদী। সর্বমঙ্গলার দেড় কিলোমিটার পূর্বে পূর্বমুখী খাল নদী। খাল নদীর তিন কিলোমিটার পূর্বে যমুনেশ্বরী মোহনা যথা চিকলি নদী, চিকলির তিন কিলোমিটার দূরে দেওনাই নদী। দেওনাই বা চাড়ালকাটার চার কিলোমিটার দূরে মারগালা নদী। এখানে ভেড়ভেড়ি নদীর একটি শাখা এসে মিলিত হয়েছে। এর আট থেকে নয় কিলোমিটার দূরে বুলাই বা ভূল্লাই নদী। ভূল্লাইর সাত থেকে আট কিলোমিটারের মধ্যে ঘাঘট নদী। অতঃপর তিস্তার প্রবাহ।

বর্তমানে তিস্তা নীলফামারী জেলার সর্ববৃহৎ নদী। তিস্তা থেকে আত্রাই পর্যন্ত মধ্য স্তরের নদী সমূহকে নদী না বলে খাদ বলা যায়। কারণ গ্রীষ্ম মৌসুমে এসব খাদ সম্পূর্ণ রূপে শুকিয়ে যায়।

## চ. ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা

কালের গর্ভে নীলফামারী জেলার বহু স্থাপত্য শিল্প হারিয়ে গেছে। নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে পূর্ব কালের জমিদার বাড়ি, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি। সময়ের চাকায় রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষসহ অনেক ঐতিহাসিক স্থাপনা আবাদি জমিতে পরিণত হয়েছে। এখনও বেশ কিছু স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন রয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : নীলকুঠি, ধর্মপালের গড়, ময়নামতির দুর্গ, হরিশচন্দ্রের পাঠ, সৈয়দপুরের চিনি মসজিদ, মোগল আমলের মসজিদ ইত্যাদি।

**নীলকুঠি :** নীল কুঠিয়ালদের দৌরাত্ম্য এবং নির্যাতিত নীলচাষিদের স্মৃতিবহুল অঞ্চল নীলফামারী। তৎকালীন সময়ে এ অঞ্চলের যত্রতত্রে গড়ে উঠেছিলো এই নীলকুঠি। কালের স্রোতে সেসব কুঠি আজ বিলুপ্ত প্রায়। তবে নীলফামারী শহরের প্রাণকেন্দ্রে বর্তমান জেলাপ্রশাসক মহোদয়ের বাসভবন সংলগ্ন এবং কালেক্টরেট স্কুলের প্রাঙ্গণে অবস্থিত টিনের ছাউনির বিশাল আকারের একটি নীলকুঠি কালের সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। নীলের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কুঠির সামনের বারান্দা সংলগ্ন নীল গাছের বাগান আজও লালিত হচ্ছে। কুঠিটি বর্তমানে অফিসার্স ক্লাব হিসেবে ব্যবহৃত।

www.pathagar.com

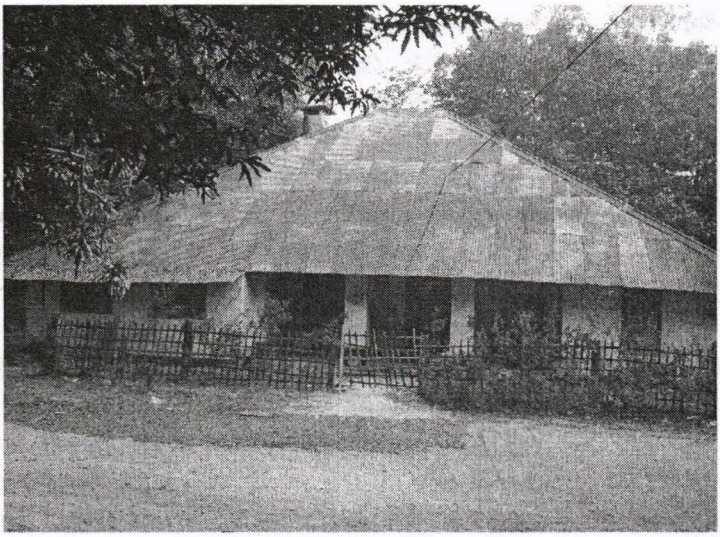

নীলকুঠি

**ধর্মপালের গড় :** জলঢাকা উপজেলার গড় ধর্মপাল মৌজার চাড়ালকাটা নদীর পূর্বপাশে অবস্থিত ছিলো গড় ধর্মপাল দুর্গ। আয়তকার এ দুর্গের তিন দিকে মৃৎ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিলো। প্রাচীরের প্রস্থ ১২ ফুট, উচ্চতা ১৩ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ছিলো প্রায় ১৩ হাজার ফুট। এ প্রাচীর ঘেঁষে তিন দিকে প্রায় ৪৫ ফুট প্রশস্ত পরিখা ছিলো। প্রতিরক্ষার কারণে এগুলো খাড়াভাবে নির্মিত হয়েছিলো বলে ধারণা করা হয়। এ দুর্গে পর পর তিনটি বেষ্টনী ছিলো বলে জানা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীরের মাঝামাঝি স্থান সামান্য উঁচু। এ দুটি স্থানে দুর্গের প্রতিরক্ষাপথ বা প্রবেশ পথ ছিলো বলে ধারণা করা হয়।

**ধর্মপালের রাজবাড়ি :** গড় ধর্মপালের পূর্ব দিকে ধর্মপালের রাজবাড়ি ছিলো। এখানে বেশ কয়েকটি দিঘি এবং একটি উঁচু স্থানে রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পাওয়া যায়। ধর্মপালের গড় থেকে ১ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি জলাশয়ের পূর্বপাড়ে শান বাঁধানো ঘাট এবং ঘাটের পাশে একটি উঁচু ঢিবি ও পুরনো আমলের ইট দেখে অনেকেই এটিকে ধর্মপালের রাজবাড়ি বলে মনে করে থাকেন।

**ময়নামতির দুর্গ :** ধর্মপালের বিধবা শ্যালিকা ময়নামতির দুর্গ চাড়ালকাটা নদীর পশ্চিম তীরে ডোমার উপজেলার হরিণচড়া ইউনিয়নের আটিয়াবাড়ি গ্রামে অবস্থিত ছিলো। আয়তকার এ দুর্গের চারদিকে দুটি প্রাচীর ছিলো। প্রাচীরগুলো ৮ ফুট চওড়া ও ১২ ফুট উঁচু ছিলো। এই প্রাচীরের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ছিলো প্রায় তিন হাজার ফুট। প্রাচীর ঘেঁষে প্রায় ৩০ ফুট প্রশস্ত পরিখা এবং পূর্ব পাশের মাঝামাঝি স্থানে প্রবেশ পথ ছিলো বলে ধারণা করা হয়। এ প্রবেশ পথের দক্ষিণ দিকে প্রায় ৪০ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ ফুট প্রশস্ত একটি বর্ধিত অংশ ছিলো- যা প্রতিরোধ পথ বলে অনুমিত হয়ে থাকে। দুর্গের অভ্যন্তরীণ প্রাচীর থেকে বহিঃপ্রাচীরের দূরত্ব প্রায় ৫০০ ফুট। এই প্রাচীরটি ৭ ফুট প্রশস্ত এবং উচ্চতা প্রায় ১০ ফুট ছিলো।

www.pathagar.com

**হরিশ চন্দ্রের পাট :** জলঢাকা উপজেলার খুটামারা ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসহ একটি উঁচু ঢিবি হরিশ চন্দ্রের পাট বা রাজবাড়ি নামে পরিচিত। এই ঢিবির উপর পাঁচটি পাথরের খণ্ড পড়ে আছে। পাথরগুলো আয়তকার এবং সবগুলো পাথরের আকৃতি একই রকমের। এ ঢিবির পাশে আরো দুটি ঢিবি রয়েছে। পাটের উত্তর দিকে দুয়ো সুয়ো নামে পরিচিত দুটি পুকুর রাজকন্যা অদুনা ও পদুনার স্মৃতি বহন করছে।

**সৈয়দপুরের চিনি মসজিদ :** এই মসজিদটি সৈয়দপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে রাস্তার পাশে অবস্থিত। ১৮৬৩ সালে মসজিদটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিলো। প্রতিষ্ঠালগ্নে মসজিদটি ছিলো টিনের তৈরি। মসজিদটির প্রতিষ্ঠাতার নাম পরিচয় জানা যায়নি। ১৯২০ সালে হাফিজ আব্দুল করিম মসজিদটির একাংশ পাকা করেন। এ সময় তিনি নিজেই মসজিদের নকশা প্রণয়ন করেন।

১৯৬৫ সালে মসজিদটির অবশিষ্ট অংশ পাকা করা হয়। এই মসজিদের গায়ে লাগানো আছে ২৪৩টি শঙ্কর মর্মর পাথর। মর্মর পাথরের সাথে লাগানো হয়েছে চিনা মাটির টুকরো। নয়নাভিরাম এই মসজিদটির ২৭টি মিনার এবং তিনটি বড় গম্বুজ রয়েছে।

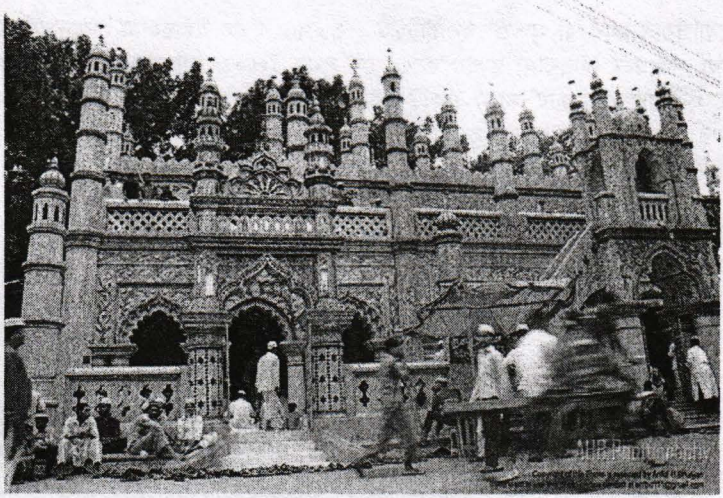

সৈয়দপুরের চিনি মসজিদ

**কিশোরগঞ্জের মোগল মসজিদ :** কিশোরগঞ্জ থানার অদূরে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরত্বে গ্রাম্য লোকালয়ের মধ্যে মোঘল আমলের এই মসজিদ আজও সুরক্ষিত। এর প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায় নি। মসজিদের উপরে সুবৃহৎ তিনটি গম্বুজ এবং অভ্যন্তরে পাথরের কারুকার্য এর প্রাচীনতার প্রমাণ বহন করে। বর্তমানে মসজিদের সামনের দিকে এর বর্ধিতকরণের কাজ চলছে।

www.pathagar.com

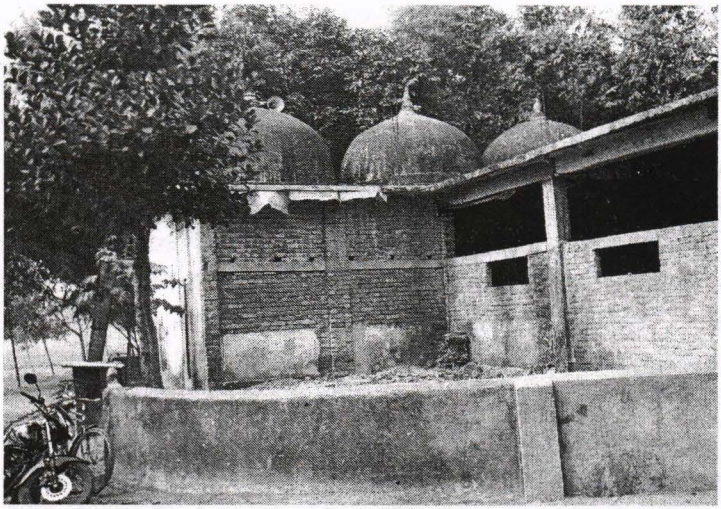

কিশোরগঞ্জের মোঘল মসজিদ কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী

**ইউরোপিয়ান ক্লাব বা মুর্তজা ইনষ্টিটিউট :** ১৮৭০ সালে ইংরেজরা সৈয়দপুরে একটি বিশাল রেলওয়ে কারখানা স্থাপন করে। সে সময় ইংরেজ সাহেবদের চিত্ত বিনোদনের জন্য 'ইউরোপিয়ান ক্লাব' নামে একটি সুরম্য মিলনায়তন গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই ক্লাবের নাম পরিবর্তন করে 'বি আর সিং ক্লাব' রাখা হয়। বর্তমানে এই ক্লাবটি মুর্তজা ইনষ্টিটিউট নামে পরিচিত।

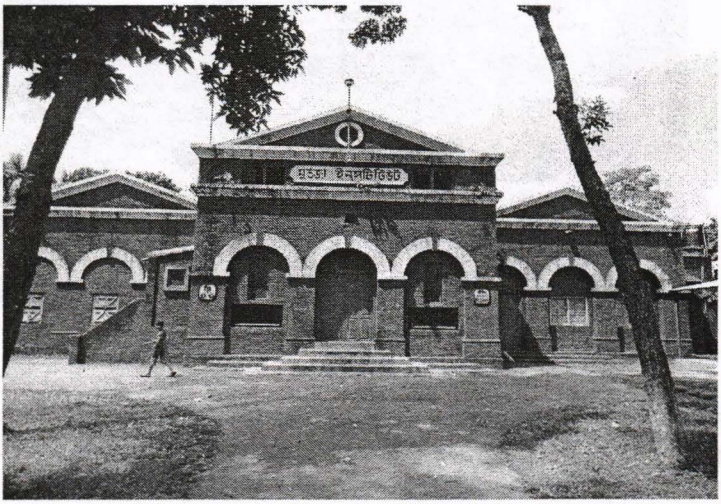

মুর্তজা ইনষ্টিটিউট সৈয়দপুর, নীলফামারী

www.pathagar.com

১৯৩০ সালের পর থেকে এ ইনষ্টিটিউটে ইউরোপীয় সংস্কৃতির পরিবর্তে আমাদের দেশীয় নাটক, যাত্রা পালাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়ে আসছে। এ ইনষ্টিটিউটে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। এ গ্রন্থাগারে অনেক মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ এখনও রয়েছে।

**সৈয়দপুরের গির্জা :** সৈয়দপুরে রেলওয়ে কারখানা স্থাপিত হওয়ার পর থেকে এখানে ইউরোপীয়দের সংখ্যা বেড়ে যায়। তাঁদের ধর্মীয় উপাসনার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৮৯৩ সালে রেলওয়ের ৪০ শতক জমির উপর ইউরোপীয় স্থাপত্যকলায় একটি গির্জা নির্মাণ করেন। এটি উত্তরাঞ্চলের প্রাচীনতম গির্জা। এ গির্জাটি কুমারী মারিয়ার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ইংরেজ ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা তাদের নিজ দেশে চলে গেলেও কিছু সংখ্যক এ্যাংলো ইন্ডিয়ান থেকে যায়। সৈয়দপুরে খ্রিস্টধর্মের লোকদের কাছে কালের সাক্ষী হয়ে গির্জাটি এখনো অতীত দিনের সাক্ষ্য বহন করছে।

সৈয়দপুরের গির্জা

## ছ. রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যসাধক

### আরিফ মোহাম্মদ চৌধুরী

কাজিরহাট পরগনার একজন খ্যাতিমান জমিদার ছিলেন। কোচ রাজ্যের অধীনে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র কাজিরহাট পরগনাই ছিলো মুসলমান জমিদার কর্তৃক শাসিত এলাকা। সে সময় কাজিরহাট পরগনার আয়তন ছিলো প্রায় বর্তমান নীলফামারী জেলার আয়তনের সমান। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আরিফ মোহাম্মদ চৌধুরী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি মোগল ফৌজদার কুলি খানের সাথে

www.pathagar.com

যোগাযোগ করে তার নিজ অবস্থান সুসংহত করেন। পূর্বে তিনি কোচ রাজার একজন সেনাপতি ছিলেন বলে জানা যায়। তার সময়েই কাজিরহাট পরগনা কাজিরহাট, টেপা, মহিপুর, তুষভাণ্ডার ও ডিমলা এ পাঁচটি জমিদারিতে বিভক্ত হয়। তিনি নিজের অধীনে মাত্র পাঁচ আনা রেখে অবশিষ্ট অংশ তার বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। তিনি খুব উদার প্রকৃতির জমিদার ছিলেন বলে জানা যায়।

**জয়রাম সেন**

রাম জীবনের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি ডিমলার জমিদারি লাভ করেন। তিনি নিষ্ঠাবান ও দানশীল জমিদার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি রংপুরের মাহিগঞ্জ থেকে ডিমলায় তার বাসভবন পরিবর্তন করেন এবং সে সময়ই ডিমলা রাজবাড়ি তৈরি হয়।

**শ্যামা সুন্দরী**

জয়রাম সেন অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার স্ত্রী শ্যামা সুন্দরী জমিদারির মালিক হন। তিনি জানকী বল্লভকে দত্তক গ্রহণ করেন। তিনি জমিদারি দেখাশোনার ভার রাম রতন এবং ঈশ্বর চন্দ্র নামক আত্মীয়ের উপর অর্পণ করে নিজে ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। পরবর্তীকালে ঈশ্বর চন্দ্রের ষড়যন্ত্র এবং নানাবিধ অসুবিধার কারণে তিনি ডিমলা থেকে রংপুরের মাহিগঞ্জে বাস পরিবর্তন করেন। এ সময় তার জমিদারির সমস্ত বিষয় সম্পদ কিছু দিনের জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডেসে ন্যস্ত হয়েছিলো। ১৮৫২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**জানকী বল্লভ সেন**

ডিমলা জমিদার বংশের সবচেয়ে খ্যাতিমান জমিদার হিসেবে জানকী বল্লভের নাম সুপরিচিত। তিনি জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করার পর অনেক সম্পত্তি কিনে ডিমলা জমিদার পরিবারের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। জানকী বল্লভের বাগান বাড়িতে ১৮৬৯ সালে রংপুর পৌরসভার কার্যক্রম শুরু হয়। রংপুর পৌরসভা ও জেলা বোর্ডের সহযোগিতায় তিনি রংপুর শহরকে জলাবদ্ধতা ও মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্য রংপুর শহরের মধ্য দিয়ে 'শ্যামা সুন্দরী' একটি খাল খনন করেন। শ্যামাসুন্দরী স্তম্ভে লেখা আছে :

পীড়ার আকরভূমি এই রঙ্গপুর
প্রণালী কাটিয়া তাহা করিবারে দূর
মাতা শ্যামা সুন্দরীর স্মরণের তরে
জানকী বল্লভ সুত এই কীর্তি করে।

রংপুর শহরে অবস্থিত শ্যামা সুন্দরী খালটি আজো তার কীর্তির পরিচয় বহন করে। তিনি অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট রংপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় সমাজসেবামূলক বেশ কিছু কাজ করেছেন। ১৮৯১ সালে তিনি রাজা উপাধি লাভ করেন। তিনি রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ১৯১০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

### যামিনী বল্লভ সেন

জানকী বল্লভের মৃত্যুর পর যামিনী বল্লভ সেন উত্তরাধিকার সূত্রে ডিমলা জমিদারি লাভ করেন। তাঁর জমিদারি আমলে তিনি রংপুরের মাহিগঞ্জে নিজ অর্থ ব্যয়ে একটি হাসপাতাল পরিচালনা করেন। রংপুর শহরের ধাপ এলাকায় তাঁর কাছারি বাড়ি ছিলো। তাঁর আমলে তার মা রানি বৃন্দাবনী কর্তৃক ১৯১৬ সালে মাহিগঞ্জে ডিমলা রাজার কালী মন্দির নির্মিত হয়।

### জামসেদ আলী চাটি

নীলফামারী অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়ে তিনি অনেকবার কারাবরণ করেন। একজন সংগ্রামী কৃষকনেতা হিসেবে তিনি পরিচিত।

### রিয়াজ উদ্দিন আহমদ

১৮৫৮ সালে দিনাজপুর জেলার নোধাবাড়ি এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে এদেশে আগমন করে দিনাজপুর জেলায় বসতি স্থাপন করেন। রিয়াজ উদ্দিন আহমদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দিনাজপুর শহরে সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশে ভারতের দেওবন্দে গমন করেন। সেখানে তিনি হাদিস শাস্ত্রে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এরপর তিনি মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় বিশেষ করে বিজ্ঞান ও দর্শনে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হন তিনি। সেই সঙ্গে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজেও আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি সৈয়দপুরের বাঙালিপুরে ১৯২৫ সালে 'আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম রুহুল ইসলাম' নামক একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি শুধুমাত্র একজন প্রখ্যাত আলেমই ছিলেন না, তিনি একজন সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। তিনি বাউলদের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় হস্তে কলম ধারণ করেন এবং তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তা প্রতিহত করতে সক্ষম হন। তিনি চারটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলো হলো : বাউল ধ্বংস ফতওয়া বা বাউল রদকারী ফতওয়া, কুরআনের আহ্বান, ফরইয়াদে ইসলাম ও ইসলামকে গালে পর ছুরি। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় লেখা।

তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন। তিনি কুরআন ও হাদিসের আলোকে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করতে পারতেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত ওয়াজ, নসিহত ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে গোমরাহ ফের্কাসমূহের অপতৎপরতা বহুলাংশে বিদূরিত হয়। দ্বীন ও আল জামিয়ার খিদমতে নিবেদিত এ মহৎ প্রাণব্যক্তি ১৯৫৮ সালে পরলোকগমন করেন।

### জামাল উদ্দিন আহমদ

তিনি ১৮৬৭ সালে সৈয়দপুর উপজেলার বোতলাগাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা লাভের তেমন কোনো সুযোগ না পেলেও তিনি ব্যক্তিগত চেষ্টায় বাংলা, আরবি, উর্দু এবং ফারসি ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি

www.pathagar.com

বোতলাগাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে তিনি এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু কাজ করেন। সুশিক্ষিত ও সমাজ সচেতন জামাল উদ্দিন আহমদ সাহিত্য পিপাসু ছিলেন। তিনি 'হজে বায়তুল্লাহ', 'রাফিকুন্নেসা' ও 'দিলের চাবি' নামক তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি রংপুর থেকে প্রকাশিত হেমচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত পল্লীবাণী পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখতেন। ১৩৫০ বঙ্গাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ব্যক্তি উদ্যোগে লঙ্গরখানা খুলে ক্ষুধার্ত লোকদের মধ্যে খাবার বিতরণ করতেন। তিনি মুসলিম লিগ এর রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তিনি কখনো প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। ১৯৫২ সালের ২৬ জুন তিনি পরলোকগমন করেন। তার সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড ও সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ সৈয়দপুর পৌরসভার একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে হাজী জামাল উদ্দিন সড়ক।

### ফজলুর রহমান চৌধুরী

জলঢাকা উপজেলার বগুলাগাড়ি গ্রামে ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকে তিনি সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও মাসিক বসুমতি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সে সময় যে কয়েকজন মুসলিম লেখক ও কবি তাঁদের নিজস্ব আসন তৈরি করতে পেরেছেন তাদের মধ্যে ফজলুর রহমান চৌধুরী অন্যতম। তবে পাঠক মহলে তিনি ততটা পরিচিত নন। রচনা সংকলন নামক গ্রন্থে তাঁর রচিত গল্প ও কবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে। ১৯৬১ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

### আইনুদ্দিন আহমদ

সৈয়দপুর উপজেলার ব্রহ্মোত্তর গ্রামে ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও ব্যক্তিগত চেষ্টায় তিনি বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কৃষি কাজের পাশাপাশি তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন। তাঁর রচিত 'অন্যদিন : অন্য কবিতা' গ্রন্থের সবগুলো কবিতায় স্বজাতির প্রতি কবি হৃদয়ের অকৃত্রিম দরদ এবং তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কবি মনের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত স্পষ্ট। ১৯৫০ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

### দবির উদ্দিন আহমদ

ডোমার উপজেলার ভোগডাবুড়ি গ্রামে ১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আইন পেশায় যোগদান করার পর নীলফামারী শহরে বসবাস শুরু করেন। ১৯৩০ সালে বি.এ পাস করার পর তিনি মুসলিম লিগের রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হন। তিনি নিজেকে প্রথম সারির একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কারণে তিনি কারাবরণ করেন। তিন মাস পর তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ডোমার ডিমলা নির্বাচনী এলাকা থেকে আওয়ামী লিগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জয় লাভ করেন।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি হিসেবে সবার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি নীলফামারী কলেজ, নীলফামারী মহিলা কলেজ ও রাবেয়া বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৩ সালের ১৩ জুলাই তিনি ইন্তেকাল করেন।

**আছির উদ্দিনআহমদ**

১৯০৫ সালের ১৫ জুলাই পঞ্চগড় জেলার বোদা থানার পাঠানপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৮ সালে নীলফামারী হাই ইংলিশ স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে নীলফামারী উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিলো বিজ্ঞানসম্মত। অনেকেই তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগঠক হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। লেখাপড়া ও খেলাধুলায় উৎসাহ প্রদানের জন্য তিনি ছাত্রদের কাছে প্রিয়ভাজন ছিলেন। ১৯৮৯ সালের ২৯ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**খয়রাত হোসেন**

১৯০৯ সালের ১৪ নভেম্বর নীলফামারীর বেড়াকুঠি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের নীতি ও আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হন। ১৯২৯ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হন। ১৯৩৮-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লিগের একজন অন্যতম কাউন্সিলর ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি মুসলিম লিগের প্রার্থী হিসেবে রংপুর থেকে নির্বাচিত হন। ১৯৪৬-৪৭ সালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আসামে মুসলিম উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করলে তিনি উক্ত আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২ সালের ১০ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**জিকরুল হক**

১৯১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর সৈয়দপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্যাম্বেল মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন কালে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত হন। তিনি শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে এসে তাঁদের রাজনৈতিক

www.pathagar.com

আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি সৈয়দপুর পৌরসভার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লিগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি সৈয়দপুরে পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এবং হাজারীহাটে পোস্ট অফিস স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি কখনো নীতিভ্রষ্ট হননি। তিনি অগণতান্ত্রিক কাজে সমর্থন দেননি, কোনরকম অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করেননি। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা নিয়ে বাঙালি ও বিহারিদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় এবং একসময় পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে সারাদেশের ন্যায় সৈয়দপুরেও হানাদার বাহিনী অপারেশন শুরু করে। অন্যান্যদের সাথে ডাক্তার জিকরুল হককেও হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। পাক আর্মিরা রংপুর ক্যান্টনমেন্টের পশ্চিম পাশে অবস্থিত বধ্যভূমিতে অন্যান্যদের সাথে তাকেও হত্যা করা হয়।

সৈয়দপুর শহরের প্রধান সড়কের নামকরণ করা হয়েছে ডাক্তার জিকরুল হক সড়ক। সৈয়দপুর পৌরসভার পাঠাগারের নামকরণ করা হয়েছে 'শহীদ ডাক্তার জিকরুল হক পৌর পাঠাগার।' বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০১ সালে তাকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করেন।

**এস.এম. ইয়াকুব**

১৯১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার মন্সাডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে ডাক্তারি পেশায় আত্মনিয়োগের মাধ্যমে হাওড়ার শিবপুরে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিহারি অধ্যুষিত সৈয়দপুরে বসবাস শুরু করেন। সৈয়দপুরে এসে তিনি 'কোহিনুর হোমিওপ্যাথিক কলেজ' নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর ল্যাবরেটরিতে বসে রুগি দেখার পাশাপাশি ঔষধ নিয়ে গবেষণা করতেন। তিনি তার গবেষণাগারে বেশ কিছু নতুন ঔষধ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি একজন গীতিকার ছিলেন। নিজের লেখা গানে তিনি সুরারোপ করে গাইতেন। তাঁর লেখা একটি উল্লেখযোগ্য গান হলো 'যে দিন আমি থাকব নাকো/পড়বে কি গো মনে'।

১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল অন্যান্যদের সাথে তাঁকেও পাক আর্মিরা ধরে নিয়ে গিয়ে রংপুর ক্যান্টনমেন্টের পশ্চিম পাশের বধ্যভূমিতে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য সৈয়দপুর শহরের একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে 'শহীদ ডাক্তার ইয়াকুব সড়ক'।

www.pathagar.com

### কাজী আব্দুল কাদের

জলঢাকা উপজেলার শৌলমারী গ্রামে ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি কৈমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সেখান থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। তিনি মুসলিম লিগের রাজনৈতিক নীতি, আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি মুসলিম লিগের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তান সরকারের পক্ষাবলম্বন করেন। তিনি ১৯৭৯ ও ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। রংপুর মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। নীলফামারীর দারোয়ানীতে মিল স্থাপনের ক্ষেত্রেও তিনি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। ২০০২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

### আমেনা বেগম

১৯২০ সালে পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি উপজেলার সুতিয়াকাঠি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পর তিনি তার স্বামীর সাথে নীলফামারীতে চলে আসেন এবং নীলফামারী বালিকা বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। মাত্র ছয় মাস পর তিনি একই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি স্কুলের সার্বিক উন্নয়নে ব্রতী হন। নারী শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে সচেতনতা ও আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তিনি শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৭০ সালে এই প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয়করণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর আন্তরিক চেষ্টার ফলে নীলফামারী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়। ২০০৫ সালের ১৮ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

### জসিম উদ্দিন আহমদ

১৯২০ সালে সৈয়দপুর উপজেলার বাগডোগরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সাল থেকে তিনি মুসলিম লিগের রাজনীতির সাথে জড়িত হন। রাজনীতির পাশাপাশি তিনি সমাজসেবামূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে লক্ষ্মণপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা করেন। এজন্য মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৩ ডিসেম্বর তাঁকে পাক আর্মিরা ধরে নিয়ে যায় এবং পরদিন ১৪ ডিসেম্বর তাঁকে হত্যা করে। সৈয়দপুর শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এলাকাটির নামকরণ করা হয়েছে জসিম বাজার।

### মোখলেসুর রহমান (সিধুমিয়া)

ডিমলা উপজেলার খগাখড়িবাড়ি গ্রামে ১৯২১ সালের ১৫ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। আধিয়ারী প্রথায় আধিয়ার কৃষকেরা কিভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হতো তা তিনি তাঁর কৈশোর বয়সে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ১৯৪৩ সালে তিনি সরকারি চাকরিতে

www.pathagar.com

যোগদান করে কলকাতায় চলে যান। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেন। তেভাগা আন্দোলনের সময় কৃষকদের উপর শোষণ ও নির্যাতনে তিনি বিক্ষুব্ধ হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি মুসলিম লিগের রাজনীতির সাথে জড়িত হলেও সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ড তিনি পছন্দ করতেন না। পরে তিনি বামপন্থি রাজনীতির সাথে জড়িত হন। সবশেষে তিনি আওয়ামী লিগের সাথে জড়িত হন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ঔষধ ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী পাঠাতেন। ১৯৮৯ সালের ১৫ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**মশিউর রহমান (যাদু মিয়া)**

১৯২৪ সালে ডিমলা উপজেলার খগাখড়িবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকে তিনি মুসলিম লিগের রাজনীতির সাথে জড়িত হন। তিনি পর পর দুইবার রংপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি পাকিস্তান সরকারের পক্ষাবলম্বন করেন। ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালের ১২ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**ডাক্তার এ. এ. শামসুল হক**

১৯২৭ সালে দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর উপজেলার পলাশবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৫৭ সালে ডাক্তারি পাস করার পর সৈয়দপুরে চলে আসেন। সৈয়দপুরে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। গরিব রুগিদেরকে তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গভীর রাতে পাক বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর ১২ এপ্রিল অন্যান্যদের সাথে তাঁকে রংপুর ক্যান্টনমেন্টের পশ্চিম পাশের বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়। তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য সৈয়দপুর শহরের একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে 'শহীদ ডাক্তার শামসুল হক সড়ক'।

**আমজাদ হোসেন**

ডোমার উপজেলার ভোগডাবুরী গ্রামে ১৯২৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি বাম রাজনীতির সাথে জড়িত হন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ৮ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**মহম্মদ মহসীন**

ডিমলা উপজেলার খগাখড়িবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁর কবিত্ব শক্তির বিকাশ ঘটে। ১৯৫৩ সালে তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ ' কবিতা ও শোরুম' প্রকাশিত হয়। তার সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ 'গৌরবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ' ১৯৫১ সালে তাঁকে 'কবি শেখর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

**আব্দুল হাফিজ**

১৯৩০ সালের ১৫ ডিসেম্বর সৈয়দপুর উপজেলার ব্রহ্মোত্তর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে মাগুড়া কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি লাভের পর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে কর্মরত ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো ছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি রাজনীতির সাথে জড়িত হন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার কারণে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে পাণ্ডুলিপি লেখক ও কথকের দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর 'দৃষ্টিপাত' নামক কথিকা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিলো। তিনি 'নতুন বাংলা' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখতেন। আব্দুল হাফিজের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন লোকঐতিহ্যের গবেষক। তিনি প্রায় সারাজীবন ফোকলোর নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হলো : লোককাহিনির দিকদিগন্ত, বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য, বাংলা রোমাঞ্চ কাব্য পরিচয় ইত্যাদি। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি উদার মনের মানুষ ছিলেন। দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ তার আনুকূল্য লাভ করতো। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক। তিনি সৈয়দপুর এলাকায় শিক্ষা বিস্তার ও এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। তিনি বেকার যুবক, দুস্থ ও অসহায় নারীদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন।

আব্দুল হাফিজ



www.pathagar.com

### আবু নাজেম মোহাম্মদ আলী

দেশবিভাগের পর নীলফামারীতে আসেন। তিনি তাঁর যৌবন ও বার্ধক্যের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো নীলফামারী জেলার শিক্ষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির উন্নয়নে ব্যয় করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাবিদ হিসেবে পরিচিত। তিনি পেশাগত জীবনে আইন ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৮১ সালের ৪ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

### আছির উদ্দিন আহমদ

১৯০২ সালে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৮ সালে নীলফামারী হাই ইংলিশ স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

### মোজাম্মেল হোসেন

১৯৪৪ সালে কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মহিলা মন্ত্রণালয়ের কর্মসংস্থান প্রকল্পের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে তিনি তাঁর এলাকায় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করেন। ১৯৯৬ সালের ২ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

### মোশারফ হোসেন চৌধুরী

১৯১৭ সালে তিনি নীলফামারী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬২ এবং ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি নীলফামারী মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। নীলফামারী স্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠায় তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

### মোঃ আব্দুল খালেক চৌধুরী

১৯৪৪ সালের ২৫ অক্টোবর জলঢাকা উপজেলার বালাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি জলঢাকা পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ২০০৪ সালের ২৪ অক্টোবর তিনি একই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৮ সাল থেকে নাটকসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত আছেন। তার সক্রিয় উদ্যোগে 'জলঢাকা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী' নামক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সাংস্কৃতিক সংগঠনটি ১৯৬৮ সাল থেকে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জলঢাকার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলো। ১৯৮৬ সালের পর থেকে এই সাংস্কৃতিক সংগঠনটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তিনি নাটকে অভিনয়ের পাশাপাশি 'পাপের শাস্তি' ও 'পরিণতি' শিরোনামে দুটি মঞ্চ নাটক লিখেছেন।

www.pathagar.com

## জ. মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালের ৬ই এপ্রিল। চারদিকে যুদ্ধের ভয়াবহ তান্ডবলীলা। সৈয়দপুর শহর থেকে ৮ মাইল দূরে টেক্সটাইলের কাছে ব্যারিকেড দিয়ে ক্যাম্প করেছে স্থানীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীরা। তাদের উদ্দেশ্য হলো সেখান থেকে আক্রমণ চালানো হবে। কিন্তু এ খবর পাক সেনারা জানতে পারে। তারা ৭ই এপ্রিল ওই ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যারিকেড ভেদ করে পাক বাহিনী নীলফামারী শহরে ঢুকে পড়ে। পাকবাহিনী অত্যাধুনিক ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আক্রমণ করে। চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে বাঙালীরা পাকবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে নিজেরাই আক্রান্ত হয়েছে। এই খবরে সবাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে যেতে থাকে। এপ্রিলের শেষের দিকেস্থানীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দিক থেকে এসে ডোমার থানার চিলাহাটি এলাকায় একত্রিত হন। সেখান থেকে তৎকালীন এম.এন.এ আফসার আলী আহমেদ, আবদু রউফ ও আবুল কালাম আজাদসহ রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতৃবৃন্দ প্রতিআক্রমণের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গঠন করেন। এছাড়াও এ সময় মরহুম এডভোকেট দবিরউদ্দিন, মরহুম ইয়াকুব আলী, সারোয়ার হোসেন আবু, আজহারুল ইসলাম, এন কে আলম চৌধুরী ও তৎকালীন মুনাফসহ অনেকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে সহযোগিতা করেন। এই জেলায় ৪৮২ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

৭ই এপ্রিলের পর থেকে পাক বাহিনী ও তার দোসররা নীলফামারী জেলাবাসীর ওপর চালাতে থাকে নির্মম অত্যাচার। এমন কোন নিষ্ঠুর কাজ নেই যা পাকবাহিনী নীলফামারীর অধিবাসীদের উপর চালায়নি। অনেক মা বোনের ইজ্জত দিতে হয়। সৈয়দপুর শহরের উচ্চশিক্ষিত বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগামী ছাত্রীদের খবর পাক বাহিনীর দোসররা রাখত এবং সময় সুযোগ বুঝে তাদের ধরে নিয়ে যেত। কারফিউ জারি করা অবস্থায় পাকবাহিনী মেয়েদের উপর এ অকথ্য নির্যাতন চালায়। সৈয়দপুর শহর ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চে পাক সেনাদের দখলে চলে যায়। ঐ বছর ১৩ই জুন একদিনে এই শহরে হত্যা করা হয়েছে ৩৩৮জনকে। এমনিভাবে জলঢাকা থানায় কলিগঞ্জ ব্যারেজের কাছে হত্যা করা হয় ১৮০জনকে।

নীলফামারী শহরে সেসময় সরকারী করেজের ছাত্রাবাসে পাক সেনারা ক্যাম্প করে। সেখানেই একটি কক্ষে নির্যাতন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। লোকদের ধরে এনে সেখানে চালানো হতো অমানবিক নির্যাতন। এই নির্যাতন কেন্দ্র থেকে দুই একজন ছাড়াও পেয়েছে টাকার বিনিময়ে। কেন্দ্রের নির্যাতনে যারা নিহত হয়েছে তাদেরকে কলেজের পিছনে গণকবর দেয়া হয়েছে। অনেককে গুলি না করে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। এসব নির্যাতনের তীব্রতা ছিল ১৯৭১ সালের ৮ই এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত।

এরমধ্যে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকরা পাল্টা আক্রমণ চালাতে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে এলাকায় ঢোকে। এসব দল ও উপদলের নেতৃত্ব দেন মতিয়ার রহমান, দেলোয়ার হোসেন বুলবুল, শাহজাহান আলী বুলবুল, তরিকুল ইসলাম, শাহজাহান সরকার, মহীদ গোলাম কিবরিয়া, আনছারুল

www.pathagar.com

আলম ছানু, জিকরুল হক, শওকত আলী টুলটুল, ফজলুল হক, জয়নাল আবেদীন প্রমুখ। এরা ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন স্থানে লড়াই করে। লড়াই চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে গোপনে শহরেরখবরাখবর পৌঁছে দিত রিকশাওয়ালা শামু ও আকবর। ডিমলায় টুনিরহাট এলাকায় সেপ্টেম্বর মাসে পাকসেনাদের একটি ক্যাম্পে আক্রমণ করতে গিয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হন ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর ২৮শে মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত হলে নীলফামারীর জনগণ আন্দোলনের জন্য সংগঠিত হতে থাকে। স্বত:স্ফূর্ত জনতা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। প্রস্তুতি হিসেবে প্রথমেই গঠন করা হয় সংগ্রাম পরিষদ। পরিষদের আহবায়ক মনোনীত হন তৎকালীন এম.এন.এ মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আফসার আলী আহমেদ। এই কমিটিতে অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এম.এন.এ এবং ৪ জন এম.পি.এ। এরা হচ্ছেন আবদু রউফ, শহীদ ডাঃ জিকরুল হক, মোহাম্মদ আমিন, আজহারুল ইসলাম, মরহুম আবদুর রহমান চৌধুরী। এরা ৬টি থানায় গঠিত সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক ছিলেন। পদাধিকার বলে মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন। এছাড়া অন্যদের মধ্যে সদস্য ছিলেন এডভোকেট দবিরউদ্দিন, আবুল কালাম ও সাবেক মন্ত্রী খয়বর হোসেনসহ আরও ৬জন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় অনেক আগেই। লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে রাইফেল চালনা, পিট-প্যারেড ও শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ চলতে থাকে টাউন ক্লাব চত্বরে। এসব প্রশিক্ষণ মূলত সমন্বয় করেন ছাত্র নেতারা ও জাতীয় লীগের আবুল কালাম। প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন আনসার কমান্ডার শহীদ আলী হোসেন ও লোকমান হোসেন। প্রশিক্ষণে অংশ নেয় কয়েকশ যুবকসহ এই মহকুমার আনসাররা। কাঠের তৈরী রাইফেল দিয়েই শুরু হয় প্রশিক্ষণ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিজ্ঞানের ছাত্ররা হাতবোমা তৈরীর কৌশল অন্যদের শেখাতে থাকে। এর পাশাপাশি চলতে থাকে খন্ড মিছিল, মিটিং সমাবেশ, প্রচারপত্র বিলি। এ ছাড়াও গণসঙ্গীতের মাধ্যমে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ চলতে থাকে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার কাজ চলতে থাকে। শহরে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাসহ সময় সময় বিভিন্ন কর্মসূচী সম্বন্ধে অবহিত ও সাবধানতা বজায় রাখার জন্য গঠন করা হয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিয়ে গঠিত সংগ্রাম পরিষদ দু'টির যৌথ আহবানে ৭১-এর ১৫ই মার্চ এক বিরাট লাঠি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় টাউন ক্লাব মাঠে। এই সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাসহ লড়াইয়ের প্রস্তুতি সম্বন্ধে অবহিত করা হয়।

নীলফামারীর পার্শ্ববর্তী থানা সৈয়দপুর। সেখানে ছিল সেনানিবাস ও বিহারীদের বাস। এই শহরের বাঙালীরা ২৩শে মার্চ সর্বপ্রথম আক্রান্ত হয়। সেদিন ইউপি চেয়ারম্যান মাহতাব বেগসহ বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালীকে হত্যা করা হয়। এই খবর নীলফামারীতে পৌঁছার সাথে সাথে সৈয়দপুরের বাঙালীদের উদ্ধার ও সৈয়দপুরকে শত্রুমুক্ত করতে নতুনভাবে প্রস্তুতি শুরু করা হয়। মূলত এই দিন থেকেই এ এলাকায়

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ লড়াই শুরু হয় বলা যায়। যার যা আছে তা নিয়েই সৈয়দপুর শহরকে ঘিরে ফেলে প্রায় কয়েক লাখ গ্রামবাসী এবং উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই চলতে থাকে। নীলফামারীর সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতে যে ২/৪ জন বাঙালী ইপিআর ছিলেন তাদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। একপর্যায়ে এলাকাবাসী সে সব ফাঁড়ির অস্ত্র দখল করে নেয়। ৪ঠা এপ্রিল বাঙালী ইপিআররা নীলফামারী শহরে চলে আসে। এর মধ্যে নীলফামারী ট্রেজারি থেকে কিছু অস্ত্র নেয়া হয়। শহরের কেন্দ্রস্থল প্রধান ডাকঘরের সামনে স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হয়।

## সৈয়দপুরের গোলহাট বধ্যভূমি

সৈয়দপুর মুক্ত হয় বিজয়ের দু'দিন পর ১৮ই ডিসেম্বর। সেদিন প্রথম নীলফামারী জেলার সীমান্ত এলাকা হিমকুমারি ক্যাম্প থেকে মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনী যৌথভাবে প্রবেশ করে সৈয়দপুর শহরে। সেইসাথে পাশের গ্রাম থেকে শহরে ঢুকে পড়ে কয়েক হাজার গ্রামবাসী। শহরের কেন্দ্রস্থলে ওড়ানো হয় জাতীয় পতাকা।

সারাদেশে ৭১ এর মার্চে যখন প্রতিরোধের সংগ্রাম চলছিল তখন ২৩শে মার্চ সৈয়দপুরে শুরু হয় প্রত্যক্ষ লড়াই। ২২শে মার্চ গভীররাতে কিছু অবাঙালী ও স্থানীয় সেনানিবাসের পাকসেনারা হঠাৎ করে শহরের বাঙালীদের ওপর আক্রমণ করে বসে। শহরের সংখ্যালঘু বাঙালীদের কিছু অংশ যে যেভাবে পারে শহর ছেড়ে পালিয়ে গ্রামে চলে যায়। পরেরদিন ২৩শে মার্চ ভোরবেলা পার্শ্ববর্তী এলাকার বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী পুরো শহরটি ঘেরাও করে ফেলে। শুরু হয় উভয় পক্ষে লড়াই। এ লড়াইয়ে প্রথম শহীদ হন ইউপি চেয়ারম্যান মাহতাব বেগ। এছাড়া ঐদিন যেসব বাঙালী শহরে আটকাপড়ে তাদের অনেককে হত্যা করা হয়। এরও ২/৩ দিন আগে সেনানিবাসের বাঙালী সৈনিকদের বন্দি করে রাখা হয়। দু'দিন ধরে অবাঙালী ও পাক সেনাদের সাথে গ্রামবাসীর লড়াই চলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঙালীরা পাক সেনাদের সাথে লড়াই করে টিকতে পারেনি। বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খানসেনারা শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ঢুকে পড়ে। শহরের চারিদিকে কয়েক মাইল এলাকা পুড়িয়ে দেয়া হয়। ১৭ই এপ্রিল সৈয়দপুর হাইস্কুল ও দারুল উলুম মাদ্রাসায় ক্যাম্প করে অন্যান্য বাঙালীদের রাখা হয়। তাদেরকে দিয়ে এখানে কাজ করানো হত। কেউ কাজ করতে অসমর্থ হলে তাকে নির্মম শারীরিক নির্যাতন করা হতো। তাদেরকে দিয়ে মাটি কাটার কাজ, ভেঙে দেয়া সৈয়দপুর বিমানবন্দর, বিভিন্ন ব্রিজ, কালভার্ট, পুল ও সড়ক নির্মাণ করা হত। তারা ১৩ই জুন পর্যন্ত এসব কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকে। এসব আটকেপড়া বাঙালীদের শেষ করে দেয়ার জন্য নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। মিথ্যা আশ্বাসে একত্রিত করে একই দিনে প্রায় ৩শ নারী-পুরুষকে এখানে হত্যা করা হয়। তাদেরকে শহরের বাইরে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে একটি ট্রেনে ওঠানো হয়। ট্রেনটি যখন রেলস্টেশন থেকে মাত্র আধকিলোমিটার দূরে গোলাহাট এলাকায় পৌঁছে ঠিক তখনই তাদেরকে ট্রেন থেকে নামিয়ে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকান্ডে লক্ষীরাম

www.pathagar.com

আগর আলী, ফুলচন্দ্র কেডিয়া, রামচন্দ্র আগরওয়ালা, নেমন্দ্র কেডিয়া ও সীতারাম পন্ডিতের পরিবারের একজন সদস্যও বাঁচতে পারেনি। এছাড়াও সৈয়দপুর এলাকা থেকে নির্বাচিত তৎকালীন এমপিএ ডঃ জিকরুল হকসহ সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে ড. ইয়াকুব আলী, ড. বদিউজ্জামান ও ড. শামসুল হককে হত্যা করা হয়।

## কালিগঞ্জের বধ্যভূমি

জলঢাকা থানার কালিগঞ্জে ব্যারেজের কাছে দেড় শতাধিক লোককে হত্যা করা হয়। ৮ই এপ্রিল নীলফামারী পুনরায় পাকিস্তানী সেনা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। বাঙালী সেনারা তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে কিন্তু পাকবাহিনীর ভারী অস্ত্রশস্ত্রের কাছে টিকতে পারেনি। ফলে মুক্তিবাহিনী প্রাথমিক আশ্রয় ও আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য ভারতের সীমান্তের দিকে সরে যায়।

পাকিস্তানী সেনারা মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের খুঁজতে থাকে এবং তাদের না পেয়ে নিরীহ, সাধারন গ্রামবাসীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। সাধারন গ্রামবাসীরা পাকিস্তানী সেনাদের অত্যাচার, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। সাধারণ মানুষ প্রাণের ভয়ে ভারতে যেতে শুরু করে। ২৭ এপ্রিল মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তারা জলঢাকা-চিলাহাটির পাশ দিয়ে আগাচ্ছিল। এ সময় ডোমার থেকে ৫টি জীপের একাট সামরিক খানসেনাদের দল জলঢাকার দিকে যাচ্ছিল। নিরীহ মানুষেরা সকলেই খানসেনাদের মুখোমুখি পড়ে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দ্রুত এদের ঘেরাও করে ফেলে খানসেনারা। এদেরকে পাখির মত গুলি করে হত্যা করা হয়। কালীগঞ্জ বধ্যভূমিতে প্রায় দেড়শতাধিক লোক নিহত হয়েছে।

**নিম্নে এদের নাম উল্লেখ করা হল :**

কেরকোস রায়, দ্বারকানাথ রায়, রাধিকা মোহন্ত, খোকা মোহন্ত, দেবেন হাজরা, কগেশ্বর রায়, চৈতন বর্মন, রাতা মোহনরায়, উমাকান্ত রায়, চন্দ্র রায়, গাদলা রায়, উমাকান্ত রায়, লালমোহন রায়, নীলমোহন রায়, টুরু রায়, মহীন্দ্রনাথ রায়, চাটিরাম রায়, গোপাল রায়, রামলাল রায়, শচীমোহন রায়, গিরীশচন্দ্র রায়, গেদা রায়, খগেন রায়, বাবু অশ্বিনী কুমার অধিকারী, কাশি ভুবন অধিকারী, ফণীভূষণ অধিকারী, অনাথচন্দ্র অধিকারী, রনজিৎ অধিকারী, লাল্টু রায়, শান্তনু রায়, রাখালচন্দ্র রায়, প্রিয়নাথ অধিকারী, রাজমোহন রায়, যতীন্দ্রনাথ রায়, খগেন্দ্রনাথ রায়, অমূল্য রায়, শুবাস রায়, বিপিনচন্দ্র রায়, শুধাংশু রায় প্রমুখ।

## '৭১ এ স্বজনহারা যবেদা খাতুন

যবেদা খাতুন '৭১ সালের এপ্রিল মাসে তার স্বামীকে হারিয়েছে, তিনি জেনেছেন যে তার স্বামীকে নির্মমভাবে অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে হত্যা করা হয়েছে। যবেদা খাতুনের স্বামী

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আলী চাকরি করতেন সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার গাড়ি মেরামত শাখায়। '৭১এর ২৬শে মার্চ যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তিনি পালিয়ে গিয়ে পরিবার পরিজনকে নিয়ে আশ্রয় নেন নীলফামারী শহরে। সেখানে কয়েকদিন থাকেন। কিন্তু চাকরি হারাবার ভয়ে তিনি তার কর্মস্থল সৈয়দপুরে ফিরে আসেন। তবে পরিবার পরিজন রেখে আসেন নীলফামারীতে। যবেদা খাতুন জানান তার স্বামী মোহাম্মদ আলী বলেছিলেন "তোমরা কোন ভয় পেওনা। আমি কয়েকদিনের মধ্যে এসে খবর নিয়ে যাব"। প্রতিবেশী অবাঙালীরা খবর পাওয়ার সাথে সাথে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে নিয়ে যায়, সেখানে ছুরিকাঘাতে তার হাত, পা ও মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

## '৭১ এ স্বজনহারা সখিনা খাতুন

'৭১এর ১৫ই এপ্রিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নাট্যশিল্পী নূর মোহাম্মদ তার কর্মস্থল সৈয়দপুর কারখানায় সহকর্মীদের হাতে শহীদ হন। তাকে বয়লারে দগদগে আগুনের কুন্ডলিকায় ফেলে হত্যা করা হয়। নূর মোহাম্মদ কারফিউয়ের মধ্যে তার কর্মস্থলে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

## সৈয়দপুরে যেভাবে আঘাত হানে

সৈয়দপুরে লড়াই শুরু হয় ২৩শে মার্চ। এই দিন গভীররাতে হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা শহরের বাঙালীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে হতাহত হয় অসংখ্য বাঙালী। এদিন প্রথম শহীদ হন ইউপি চেয়ারম্যান মাহতাব বেগ। সৈয়দপুর ছিল অবাঙালী প্রধান শহর। অনেক আগে থেকে এখানে বাঙালী, অবাঙালী নেতৃত্বের কোন্দল ছিল। এখানকার অনেক অবাঙালী নিজেদের পাকিস্তানিদের প্রতিনিধি মনে করতো। এসব কারণে স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের ক'দিন আগেই এখানে লড়াই শুরু হয়। তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ডা:জিকরুল হকসহ অনেক বাঙালী নেতাকে আটক করে হত্যা করা হয়। সাধারণ জনগণও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কাউকে কাউকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে দেয়া হয়েছে।

'৭১ এর ২৩শে মার্চ সৈয়দপুর শহরের বাঙালীরা আক্রান্ত হলে প্রত্যক্ষ লড়াই শুরু হয়। তবে এই শহরের কিছু অবাঙালী নেতার বিরোধের কারণে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রথম থেকেই বিভিন্নভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। সৈয়দপুর শহরে ২টি সিনেমা হল ছিল কিন্তু একটিতেও বাংলা সিনেমা চলত না। ২টি স্কুল বাদে সবকটি স্কুলেই উর্দুভাষায় লেখাপড়া শেখানো হত। এখানে একটি টেকনিক্যাল স্কুল ছিল। এখানে লেখাপড়ার মাধ্যম বাংলা না উর্দু হবে এ নিয়ে বিরোধ মেটাতে দু'বছর চলে যায়। ২৩শে মার্চ শহরে বাঙালীরা আক্রান্ত হলে ভোর থেকেই তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ সমস্ত গ্রামবাসী নিয়ে গোটা শহর ঘিরে ফেলে। কিন্তু পাকিস্তানীরা ছিল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তারা শহরের চতুর্দিকে বেরিকেড দিয়ে রেখেছিল যাতে গ্রামবাসীরা শহরে কেউ প্রবেশ করতে না পারে। ইউপি চেয়ারম্যান মাহতাব বেগ শহরের

www.pathagar.com

আটকেপড়া বাঙালীদের উদ্ধার করতে তার বন্দুক নিয়েই পাকিস্তানীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি পশ্চিমপাশের মিস্ত্রিপাড়া এলাকা দিয়ে শহরে ঢোকার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তিনি পাকিস্তানীদের গুলিতে মারা যান। পরে তাঁর পায়ে দড়ি লাগিয়ে তাকে টেনে হিঁচড়ে শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি এই অঞ্চলের প্রথম শহীদ।

পাকিস্তানীরা দু'দিন ধরে সৈয়দপুর শহর ঘিরে রাখে। হানাদার বাহিনী তাদের শহরের অবস্থানকে নিরাপদ করার জন্য শহরের চর্তুদিকে কয়েকমাইল এলাকার বাড়ি-ঘর ও জঙ্গল পুড়ে ছাই করে। সেইসাথে তারা নেতৃবৃন্দসহ বহুসংখ্যক লোককে গ্রেফতার করে আটকে রাখে। এসব নিষ্ঠুরতার ফলে বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন তীব্রভাবে জ্বলে ওঠে। এখানকার অনেকে সশস্ত্র ট্রেনিং গ্রহণ করে। শুরু হয় আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ। তরুণ ও যুবকেরা মূলত এ আক্রমণে মূল ভূমিকা রাখে। শত্রুকে আক্রমণের পাশাপাশি জনসাধারণের মনোবল অটুট রাখার পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক সৈয়দপুর শহর থেকে হানাদার বাহিনীর সদস্যদের বাইরে বের হওয়ার সকল পথে বেরিকেড দেয়া হয়। যেসব বাঙালী শহরে আটকা পড়েন তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। গোলাহাটে একসাথে সাড়ে ৩শ লোককে হত্যা করা হয়। এছাড়াও যুদ্ধকালীন সময়ে শহরের পাড়ায়, মহল্লায় হত্যা করা হয় অনেক নারী, পুরুষ ও শিশু কিশোরকে। এই শহরে বেশ ক'টি পরিবার আছে যেসব পরিবারের একটি সদস্যকেও বাঁচতে দেয়া হয়নি।

## সৈয়দপুর মুক্ত

'৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় হলেও সৈয়দপুর মুক্ত হয় ১৮ই ডিসেম্বর। কিন্তু শহরে কোন বাঙালী রাতে থাকতে সাহস পেতনা। সন্ধ্যার আগেই শহর ছেড়ে চলে যেতো। পাকসেনা ও দালালদের দুর্গ সৈয়দপুর শহরে মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ১৮ই ডিসেম্বর প্রবেশ করে। তারা সকল প্রস্তুতি নিয়েই নীলফামারী জেলার সীমান্ত এলাকা হিমকুমারী ক্যাম্প থেকে সৈয়দপুর শহরে প্রবেশ করে। সেইসাথে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে সৈয়দপুর শহরে কয়েক হাজার গ্রামবাসী প্রবেশ করে। তারা শহরের কেন্দ্রস্থল আওয়ামী লীগের অস্থায়ী কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা ওড়ায়।

## নীলফামারী যেদিন শত্রুমুক্ত হলো

'৭১এর ১৬ই ডিসেম্বর ভোরে সবাই জানতে পারে যে খানসেনারা গভীররাতে নীলফামারী শহর ত্যাগ করেছে। এ খবর শুনে শহরের অসংখ্য মানুষ আনন্দ উল্লাস করতে করতে বাইরে বেরিয়ে আসে। শহরের আশেপাশে অপেক্ষমাণ মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিব বাহিনীর সদস্যরা প্রকাশ্যে শহরে ঢুকে পড়ে। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন ২/১দিন আগেই নীলফামারী মুক্ত হয়েছে। অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পর স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।

www.pathagar.com

# নীলফামারী জেলার শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা

| নাম | পিতার নাম | ঠিকানা |
|---|---|---|
| বাবু ধীরেন্দ্রনাথ রায় | মৃত চানমল বর্মণ | জলঢাকা নীলফামারী |
| আব্দুল বারেক | মোঃ আব্দুল গফুরউদ্দিন | মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী |
| মো:শাহাব উদ্দিন | জহির উদ্দিন | ছিটরাজীব,কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী |
| আব্দুর রশীদ | মো:তফেল উদ্দিন | মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী |
| মো: আজাদ (মিস্ত্রি) | মো: আয়েন উদ্দিন | চাঁদখানা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী |
| আতাউর রহমান | আশরাফ আলী | ব্রমোত্তর, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী |
| মো: আব্দুস সাত্তার | মৃত আব্দুল গফুর | ছাতনই, ডিমলা, নীলফামারী |
| মো: শামসুল হুদা | অজ্ঞাত | খগাখড়ীবাড়ি, ডিমলা, নীলফামারী |
| শ্রী বীরেন্দ্রনাথ রায় | শ্রীকান্ত রায় | দক্ষিণ খুনাগাছ, ডিমলা, নীলফামারী |
| মো: মিজানুর রহমান | মো:বছির ইদ্দিন | ছিলমাটি, ডোমার, নীলফামারী |
| মো: আনছারুল হক ধীরাজ | মো: আব্দুল আজিজ | ছিলমাটি, ডোমার, নীলফামারী |
| মো:আহমাদুল হক প্রধান | আশেকুর রহমান | ডোমার, নীলফামারী |
| মো: মোজাম্মেল হক প্রধান | অজ্ঞাত | ডোমার, নীলফামারী |
| মো:আব্দুল বারী | অজ্ঞাত | ডোমার, নীলফামারী |
| জহিরুল ইসলাম | মৃত আলীমুদ্দিন | চিকনমাটি, ডোমার, নীলফামারী |
| মো: আলী হোসেন | অজ্ঞাত | আলী হোসেন সড়ক, নীলফামারী |
| শ্রী সুভাস সিংহ | খিতিশ চন্দ্র সিংহ | দোলা পাড়া, নীলফামারী |
| ক্যাপ্টেন খায়রুল বাশার | মৃত আছির উদ্দিন | সবুজপাড়া, নীলফামারী |
| মো: আব্দুল মজিদ | মো:গেন্দু মাসুদ | পূর্ব বেলপুকুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী |
| মো: জয়নাল আবেদীন | সফিউদ্দিন | গেতলাগাড়ী, সৈয়দপুর, নীলফামারী |

www.pathagar.com

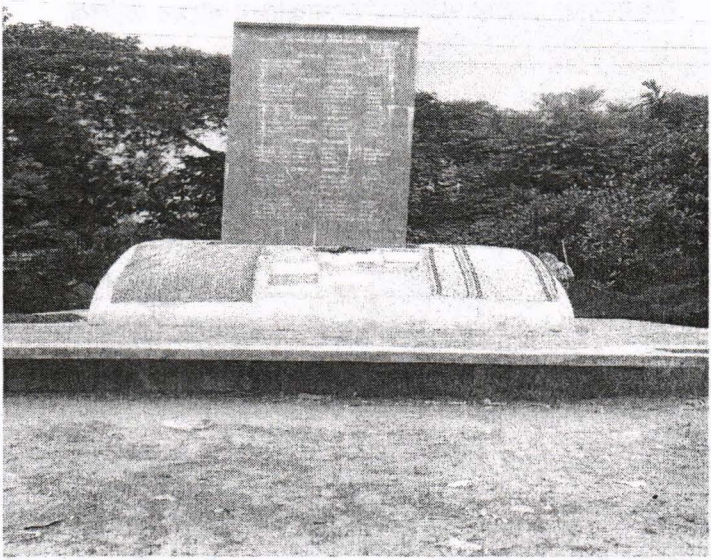

নীলফামারী জেলার শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা লিপিবদ্ধ

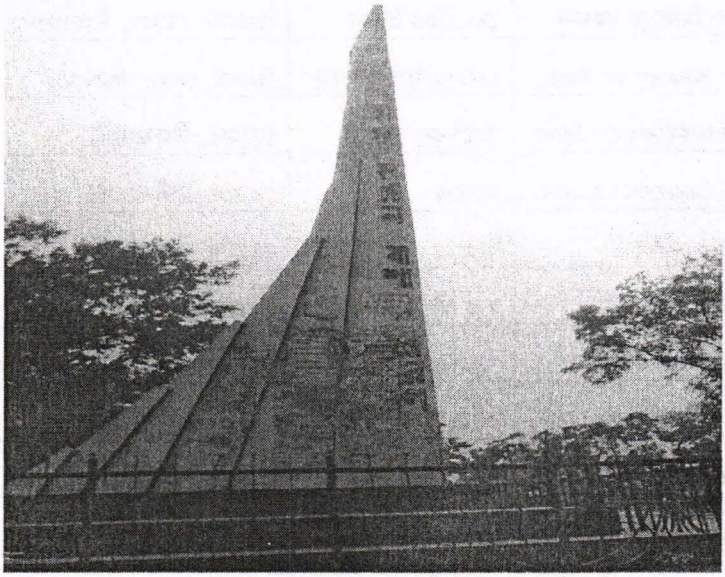

শহীদ ক্যাপ্টেন বাশার তোরণ

www.pathagar.com

## নীলফামারী জেলার শহীদদের স্মরণে

নীলফামারী সৈয়দপুর পৌরসভাসহ ২/১টি থানায় শহীদদের নামে কিছু সড়ক ও প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে। ডোমারে করা হয়েছে একটি পাঠাগার ও মিলনায়তন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শহীদ ক্যাপ্টেন বাশার সড়ক, শহীদ আলী হোসেন সড়ক, শহীদ আহমেদুল হক সড়ক, শহীদ ডাঃ জিকরুল হক সড়ক, শহীদ তুলশীরাম আগরওয়ালা সড়ক, শহীদ ডা:শামসুল হক সড়ক, শহীদ ডা: বদিউজ্জামান সড়ক, শহীদ ক্যাপ্টেন হুদা সড়ক, শহীদ মাহতাব বেগ সড়ক, শহীদ আনজারুল হক ধীরাজ পাঠাগার, শহীদ মিজানুর রহমান মিলনায়তন ও শহীদ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শহীদ স্মৃতি কলেজ। তবে সৈয়দপুরে হাসপাতাল চত্বরে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। নীলফামারী রোরঙ্গী মোড়ে মুক্তিযুদ্ধের একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করা হয়েছে।

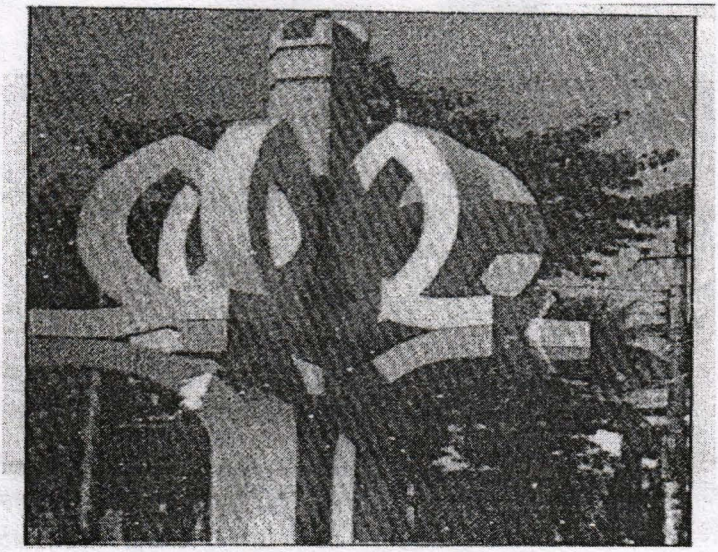

নীলফামারী চৌরঙ্গী মোড়ে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধে স্মৃতিস্তম্ভ

## ঝ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

**হরলাল রায়**

১৯২৩ সালের ৮ এপ্রিল নীলফামারীর সুবর্ণখুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতামহ হরসাধু রায় একজন সেবাপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। পিতামহের ইচ্ছায় হরলাল রায়

www.pathagar.com

ডাক্তারি পাস করলেও চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত না হয়ে তিনি পরিচিত হয়েছেন সংগীত শিল্পী হিসেবে। ছোটবেলায় শিল্পী আব্বাস উদ্দিন আহমদের কণ্ঠে 'ওকি গাড়িয়াল ভাই' গানটি শুনে তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। একদিন স্কুল যাওয়ার পথে এক যোগীর কাছ থেকে বারোআনা পয়সার বিনিময়ে দোতরার সাহায্যে একটি গান তুলে নেন। এরপর থেকে গানের নেশা তাঁকে পেয়ে বসে। এজন্য একদিন গানের টানে বাড়ি ছেড়ে সুদূর কলকাতার উদ্দেশে পাড়ি জমান। কলকাতায় যাওয়ার পর তিনি তুলসী লাহিড়ীর সান্নিধ্য লাভ করেন। তুলসী লাহিড়ীর সহযোগিতায় তিনি গান শেখার পাশাপাশি খণ্ডকালীন চাকরি নেন। হরলাল রায় নাট্যশিল্পীদেরকে আঞ্চলিক সংলাপ শেখানোর পাশাপাশি মঞ্চে নিয়মিত সংগীত পরিবেশনের সুযোগ লাভ করেন। এরমধ্যে তিনি মেগাফোন কোম্পানি থেকে তাঁর গানের রেকর্ড বের করেন। তখন থেকে শিল্পী হিসেবে পরিপূর্ণ প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করেন।

হরলাল রায়

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকা বেতারে সংগীত শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের সূচনালগ্ন থেকে তিনি জড়িত ছিলেন।

অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা ছিলো। এদেশের প্রথম দিককার চলচ্চিত্র 'ধারাপাত'-এ তিনি তার শিশু কন্যাকে নিয়ে দোতরা বাজিয়ে ভিক্ষুকের অভিনয় করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এছাড়াও তিনি জোয়ার এলো, নদী ও নারী, কাঁচকাটা হীরে প্রভৃতি ছায়াছবিতে অভিনয় করেছেন।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে' যোগদান করেন। নিজের লেখা ও সুরারোপিত উদ্দীপনামূলক গান কখনো তিনি নিজে আবার কখনো অন্যান্য শিল্পীদেরকে দিয়ে গাইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। চল্লিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত হরলাল রায়ের লেখা ও গাওয়া গান এদেশের সাধারণ মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছিলো।

www.pathagar.com

অত্যন্ত সাধাসিধে এই মানুষটির নিবিড় সংযোগ ছিলো এদেশের মাটি ও মানুষের সাথে। তিনি আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে একনিষ্ঠ সাধনার মধ্য দিয়ে মহিমামণ্ডিত করেছেন। তিনি তাঁর উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তার সুযোগ্য পুত্র রথীন্দ্রনাথ রায়ের মাঝে। হরলাল রায় ১৯৯৩ সালের ৪ নভেম্বর পরলোকগমন করেন।

**মহেশচন্দ্র রায়**

কিশোরগঞ্জ উপজেলার পুটিমারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সংগীত সাধনায় মহেশচন্দ্র রায়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন তাঁর পিতা বাবুরাম রায়। প্রথম জীবনে তিনি গ্রামের যাত্রা গান, পালাগান ও কীর্তনের দলে গান গেয়ে বেড়াতেন। আস্তে আস্তে সংগীত শিল্পী হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। প্রথম জীবনে ছড়া, কবিতা লিখলেও গানের সুর তাঁকে মোহিত করে রাখতো সবসময়। ছোটবেলায় তিনি আব্বাস উদ্দীনের কণ্ঠে 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে' নদীতে না যাইও রে বৈদ এসব গান শুনে চঞ্চল হয়ে উঠতেন। আব্বাস উদ্দীনের পর ভাওয়াইয়া গানকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য যেসব শিল্পীর অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে মহেশচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভাওয়াইয়া গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী , মহেশচন্দ্র রায়, নীলফামারী

তাঁর লেখা কবিতা ও গান নওরোজ, উত্তর বাংলা, উন্নয়ন, জাগরী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে গীতিকার, সুরকার ও সংগীত শিল্পী। মহেশচন্দ্র রায় ভাওয়াইয়া, পল্লিগীতি, ভক্তিমূলক ও বিভিন্ন পর্বভিত্তিক গান লিখেছেন। তবে তাঁর খ্যাতি মূলত ভাওয়াইয়া গানের জন্য। তিনি প্রথমে সংগীত শিল্পী হিসেবে রাজশাহী বেতারকেন্দ্রে তালিকাভুক্ত হন। এরপর রংপুরে বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি রংপুর বেতারে শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন।

www.pathagar.com

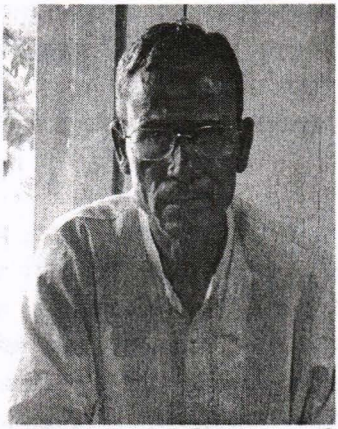

জন্মনিয়ন্ত্রণ গানের শিল্পী, আব্বাস আলী

মহেশচন্দ্র রায়ের গান মাটি ও মানুষের গান। তাঁর রচিত গানের ভাবসম্পদে উত্তরবঙ্গের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা চিত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর প্রকাশভঙ্গির কাব্যময়তা গানগুলোর সুরে এনে দিয়েছে চমৎকার লালিত্য। যা মহেশচন্দ্র রায়কে গীতিকার হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে সহায়তা করেছে। এজন্য ভাওয়াইয়া গানের জগতে নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন অনন্ত কাল। মহেশচন্দ্র রায় ১৯৯২ সালে পরলোকগমন করেন।

**তথ্যসহায়ক**

১. মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ডার জয়নাল আবেদীন, নীলফামারী
২. মুক্তিযোদ্ধা মজিবর রহমান কালিহাটি, জলঢাকা, নীলফামারী
৩. মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ডার এবং তৎকালীন জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বুলবুল, নীলফামারী
৪. নীলফামারীর ইতিহাস-এ. কে. এম নাসির উদ্দিন
৫. বাংলার প্রাচীন ইতিহাস ও বরেন্দ্রভূমি (প্রবন্ধ) মেহেরাব আলী, দৈনিক আজাদ, ১ বৈশাখ, ১৩৭৫
৫. বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা- গোপাল হালদার
৬. রংপুর জেলা গেজেটিয়ার
৭. নীলফামারী জেলার ইতিহাস-মনি খন্দকার সম্পাদিত
৮. সৈয়দপুর, নীলফামারী
৯. কিশোরগঞ্জ, নীরফামারী

www.pathagar.com

# লোকসাহিত্য

**ভূমিকা :** বিশেষ প্রয়োজনে ও সৃষ্টির আনন্দে গোষ্ঠীসমাজ প্রাথমিক অবস্থায় যে মৌখিক সাহিত্যের জন্ম দেয়, তাই ব্যাপক অর্থে লোকসাহিত্য বলে প্রচারিত হয়েছে। একক মানুষ এর স্রষ্টা হলেও সমগ্র সমাজ যখন একে মেনে নেয় তখনই বংশপরম্পরায় লোকসাহিত্য বয়ে চলে। লোকসাহিত্য শুধু গ্রামীণ মানুষই সৃষ্টি করেন না, নাগরিক শ্রমজীবী মানুষের সাহিত্যও এই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। লোকসাহিত্যের মধ্যে সমাজমনের কোনো আরোপিত তত্ত্ব স্থান পায়নি।

## ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা

লোককাহিনিতে অলৌকিকতার স্থান বেশি। সেখানে বাস্তবে যা সহজে পাওয়া যায় না, গল্পের বর্ণনায় তা সহজে পাওয়া যায়। বাস্তবে যা অতিক্রম করা যায় না, কাহিনিতে তা সহজে অতিক্রম করা যায়। কল্পনাশক্তি দিয়ে লোককাহিনির আখ্যানে সবই সম্ভব করে তোলা হয়। মন্ত্রশক্তি, যাদুশক্তি ইত্যাদি কাহিনির গতিপথে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নীলফামারী অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ দিকের পরিচয় বহন করে। লোকমানসে গল্প শোনা ও গল্প বলার প্রবণতা থেকে লোককাহিনিগুলোর জন্ম হয়েছে। এ অঞ্চলে জোলা-জুলি, পশুপাখি, জিন-পরি, রাজা-রানি, রাক্ষস-খোক্ষস ইত্যাদি বিষয়ক লোককাহিনি প্রচলিত আছে।

### জোলার পেঁয়াজ খাওয়া

এক জোলা তার শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে গেছে। জোলার শাশুড়ি জোলাকে পিঁয়াজ, মরিচ আর সরিষার তেল দিয়ে পান্তা খেতে দিয়েছে। জোলা পান্তা খেতে বসে পান্তার সাথে পিঁয়াজ দেখে তার শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করে, আম্মা এটা কি জিনিস? জোলার শাশুড়ি বলে, ওটা পিঁয়াজ। জোলা মনে মনে পিঁয়াজের নাম মুখস্ত রাখার চেষ্টা করে। পান্তা খাওয়া শেষ করে জোলা আবার তার শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করে, আম্মা কি দিয়া পান্তা খোয়াইলেন। জোলার শাশুড়ি বলে পিঁয়াজ দিয়া। জোলা মনে মনে পিঁয়াজ, পিঁয়াজ বলতে বলতে বাড়ি ফিরতে থাকে। মাঝ রাস্তায় এসে জোলা পায়খানা করতে বসে। পায়খানার চাপে জোলা পিঁয়াজের নাম ভুলে যায়। জোলা তার বাড়ির পথে নদী পার হতে গিয়ে নদীর পানিতে নেমে বলে হারে ফেলানু। আশপাশের লোকজন জোলাকে জিজ্ঞেস করে ভাই কি হারাইছে? কিন্তু জোলা কি হারিয়েছে সেটা সে নিজেই জানে না। বলবে কি করে? জোলার কথা শুনে তারা ধরে নিয়েছে জোলা কোনো মূল্যবান জিনিস হারিয়ে ফেলেছে। এজন্য সবাই মিলে খুঁজতে শুরু করে। ততক্ষণে সেখানে অনেক লোক জমেছে। সবাই যখন খুব মনোযোগ সহকারে জোলার হারানো জিনিস খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ঠিক তখনি এক লোকের পাছা দিয়ে খুবই দুর্গন্ধযুক্ত

www.pathagar.com

বাতাস বের হয়। এক লোক হঠাৎ বলে ওঠে কায় রে পিঁয়াজ দিয়া ভাত খাইচে? পিঁয়াজ শব্দটি শোনার সাথে সাথে জোলা লাফিয়ে উঠে বলে, পাছুং। লোকজন জোলাকে জিজ্ঞেস করে, দেখি কি পাইলেন। জোলা বলে, পিঁয়াজ।

**জোলার মাছ খাওয়া**

একদিন জোলা মাছ মারতে যাবে। মাছ ধরার জাল হাতে নিয়া জোলা জুলিক কইলো, জুলি মুই মাছ মারির যাং। যদি দুইটা মাছ পাং তা হলে দুজনে একটা করি খামো। আর যদি তিনটা মাছ পাং তা হলে মুই দুইটা খাইম, তুই একটা খাবু। জুলি জোলাক কয় মাছ মারার আগে ভাগ করার দরকার নাই। তোমরা আগোত মাছ মারি আনো। তারপর এলা মনের সুখে ভাগ করেন। জোলা মাছ মারতে গেল। অনেক চেষ্টা করে জোলা মাত্র তিনটা মাছ পেল। সেই তিনটা মাছ নিয়ে জোলা বাড়ি আসলো। জুলিক কইলো, জুলি তাড়াতাড়ি মাছ কুটিয়া আন্দেক। মাছ মারতে অনেক সময় গেইচে, প্যাটত ভোক নাগচে।

জুলি মাছ কুটিয়া আন্দিল। তারপর দুজনে ভাত খাবার বসিলো। জোলা কয়, জুলি মোক দুইটা মাছ দে। তুই একটা খা। জলি কয়, ক্যা তোমরা দুইটা মাছ খাইবেন। জোলা কয়, তোক তো মুই আগতে কনু অনেক কষ্ট করি মুই মাছ মারি আইনচোং সেই জন্যে মুই দুইটা মাছ খাইম। জুলি কয়, মাছ মারি আনতে কষ্ট হয় আর ঐ আন্দাবাড়ি কইরতে বুঝি কোনো কষ্ট হয় না। জুলি কয়, মুই দুইটা মাছ খাইম। জোলা কয়, মুই দুইটা মাছ খাইম। জোলা জুলি কেউ তার দাবি ছাড়ে না। তখন জোলা জুলিক কইলো, জুলি হইচে এলা চুপ করি শোন। হামরা দুইজনে চুপ করি বসি থাকমো। যার মুখ দিয়া আগোত কতা বাহির হইবে তায় খাইবে একটা আর যায় পরে কতা কইবে তায় খাইবে দুইটা। জোলা আর জুলি দুজনে চুপ করি বসি আছে। কিছুক্ষণ চুপ করি বসি থাকার পর জোলা ক্ষিধার জ্বালা সইতে না পেরে জুলিকে বলে, নে জুলি তুই দুইটা খা। মুই একটা খাং।

**জোলার শ্বশুর বাড়ি যাওয়া**

এক দিন জোলা শ্বশুর বাড়ি যাইবে। জোলার মাও জোলাক কইলো, তোর তো বুজ জ্ঞান একেবারে নাই। তা ঐ শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার সময় তোর শালা-শালির জন্যে কিছু নিয়া যাইস। আর তোর শাশুড়ি তোক কিছু খাবার দিলে বেশি করি খাইস না। তোর শাশুড়ি খাবার দিলে প্রথমে না না কবু। শ্বশুর বাড়ি যায়া উচা জাগাত বসবু। জোলা তার মায়ের সব কথা শুনি কয় ঠিক আছে।

জোলা শ্বশুর বাড়ির পথে হাঁটা শুরু করে দেয়। কিছুদূর যাওয়ার পর তার মায়ের কথা মনে হইলো। তার মা তাকে বলে দিয়েছে শালা-শালির জন্য কিছু নিয়ে যেতে বলেছে। তখন জোলা বাজার থেকে একটা বড় কচু কিনে নেয়। শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পর শালা-শালিরা জোলার সাথে ঠাট্টা মশকরা শুরু করে দেয়। জোলা তার শালা শালিকে খুশি করার জন্য লম্বা কচুটা দিয়ে দেয়। জোলার শালা-শালিরা তাদেরকে কচু দিতে দেখে অবাক হলো। এরপর জোলা ঘরে গেল। জোলাকে খাটে বসতে বললো,

www.pathagar.com

জোলা খাটের ডাসায় উঠে বসলো। শালি বললো, দুলাভাই আপনি ওখানে বসছেন কেন? তখন জোলা বললো, আমি তোমাদের চাইতে বড় এইজন্য আমি উপরে বসছি। শ্বশুরের অনুরোধে জোলা নিচে নামল। শাশুড়ি নাস্তা নিয়ে আসলো। নাস্তা দেখে জোলার জিভে পানি আসলো। এত সুস্বাদু পিঠা জোলা জীবনে কখনো দেখে নাই।

জোলা মনে মনে বললো পিঠাগুলো এত সুন্দর, এর ভিতরে না জানি কত মজা আছে। পিঠা খাওয়া শুরু করতেই তার মায়ের কথা মনে পড়লো। তার মা তাকে বলেছে, তার শাশুড়ি তাকে কিছু খেতে দিলে না না করবি। এরপর জোলাকে ভাত খেতে দিয়েছে। জোলা তখনও না না বলে। রাতে ঘুমানোর সময় জোলা যে ঘরে শুয়েছে সেই ঘরের শিকায় ছিলো পিঠার হাঁড়ি। মাঝ রাতে জোলার খুব ক্ষুধা লাগে। তখন জোলা উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা হাঁড়ি ঝুলছে। তখন জোলা হাঁড়ির ভিতরে কি আছে তা দেখার চেষ্টা করে। হাঁড়ির ভিতর পিঠা দেখে জোলা আর লোভ সামলাতে না পেরে হাঁড়ি থেকে পিঠা নিয়ে খাওয়া শুরু করে। এক সময় হাঁড়ির ভিতর জোলার মাথা ঢুকে যায়। জোলা অনেক চেষ্টা করেও আর খুলতে পারে না। তখন জোলা ভাঙা হাঁড়ি গলায় ঝুলিয়ে সকাল হওয়ার আগে বাড়ি চলে যায়।

**গণক জোলা**

এক ছিলো জোলা আর এক ছিলো জুলি। একদিন জোলার পিঠা খাওয়ার ইচ্ছা হলো। জোলা জুলিকে পিঠা বানাতে বললো। জুলি পিঠা বানানোর জন্য আটা, তেল, গুড় জোগাড় করে সকালবেলা পিঠা বানাতে বসে। জোলা বাহিরে জাল বানাতে বসে। জোলা জাল গাঁথে আর জুলি পিঠা ভাজে। জুলি যখনই কড়াইয়ের মধ্যে পিঠা ছেড়ে দেয় জোলা তখনই মাটিতে একটা করে দাগ দেয়। জুলির পিঠা ভাজা শেষ হলে জোলা দাগগুলো গুনে দেখে জুলি ২০টা পিঠা ভেজেছে। এরপর জোলা পিঠা খেতে বসে জুলিকে জিজ্ঞেস করে সে কয়টা পিঠা ভেজেছে। জুলি জোলাকে বলে সে ১৬টা পিঠা ভেজেছে। জোলা খাবে ৮টা, জুলি খাবে ৮টা। জোলা জুলিকে এভাবে পিঠা ভাগ করতে দেখে বললো বাকি চারটা পিঠা কোথায় রেখেছো? তখন জুলি জোলাকে বললো যে, সব পিঠা ভেজে আমি এখানে রেখেছি। বাড়িতে তো আর কেউ নেই যে, তার জন্য পিঠা রেখে দেব। তখন জোলা জুলিকে বললো, আমি জানি তুমি ২০টা পিঠা ভেজেছো। জাল বানানোর সময় আমি বাহিরে বসে গুনেছি। তুমি পিঠা বের কর। তা না হলে তুমি কোথায় পিঠা রেখেছো আমি গনাপড়া করে বের করবো। এই বলে জোলা গনাপড়া করতে বসে।

কালী কালী ন্যাংটা কালী
কালী কালী চুনিয়া কালী
কালী মা কয় না মিছা কথা
মাগুরে খায় শিঙ্গির ফিচা
ছ্যাঙ্গোত করি উঠে বিশটা পিঠা।

www.pathagar.com

জোলাকে গনাপড়া করতে দেখে জুলি ভয় পেয়ে বলে যে, হ্যাঁ আমি বিশটা পিঠা ভেজেছি। এই বলে জুলি জোলাকে তার ভাগের দুইটা পিঠা বের করে দেয়।

এদিকে রাজকন্যার সোনার মালা হারিয়ে গেছে। রাজা তার রাজ্যে ঘোষণা দিয়েছে, যে লোক রাজকন্যার মালা বের করে দিতে পারবে তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। ঘোষণা শুনে রাজ্যের অনেক গণক ছুটে এসেছে। কিন্তু কেউ আর রাজকন্যার হারানো মালা বের করে দিতে পারছে না। জুলি ঘোষণা শুনে জোলাকে রাজবাড়িতে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। কিন্তু জোলা যেতে রাজি হচ্ছে না। এক সময় জুলির পিড়াপীড়ি সহ্য করতে না পেরে জোলা রাজবাড়িতে যায়। জোলা একজন ভালো গণক। একথা শুনে রাজা খুশি হয়।

জোলা রাজাকে বলে গনাপড়া করার জন্য তার একটি আলাদা ঘরের দরকার। সেই ঘরে জোলা একাকী বসে গনাপড়া করবে। রাজার হুকুমে জোলাকে একটি আলাদা ঘর দেওয়া হলো। জোলা ঘরের মধ্যে একাকী বসে ভাবছে এবার কি হবে। রাজকন্যার মালা বের করে দিতে পারলে সে পুরস্কার পাবে। কিন্তু মালা বের করে দিতে না পারলে তার কি হবে। এই ভাবনায় সে অস্থির। অনেক ভেবেও সে কোনো কিনারা করতে পারছে না। ভাবতে ভাবতে রাত গভীর হয়ে যায়। জোলার চোখে ঘুম এসে যায়। কিন্তু ঘুমালে তো চলবে না। যে করেই হোক গনাপড়া করে রাজকন্যার মালা বের করে দিতে হবে। এক সময় জোলা ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের ঘোরে জোলা বলতে থাকে নিন্দো টুপো। রাজবাড়ির দুজন চাকরানির নাম নিন্দো আর টুপো। জোলাকে গনাপড়া করতে দেখে নিন্দো টুপোর চোখের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। জোলার মুখ থেকে তাদের নাম শুনে তারা জোলার কাছে ছুটে আসে। তারা যে, লোভে পড়ে রাজকন্যার মালা চুরি করেছে জোলার কাছে তা স্বীকার করে। তখন জোলা তাদেরকে বলে তোমরা মালাটা কোথায় রেখে দিয়েছো। নিন্দো টুপো জোলাকে বলে আমাদের তো সোনার মালা রাখার মতো কোনো ভালো জায়গা নাই। রাজবাড়িতে রাখলে খোঁজাখুঁজি করতে করতে এক সময় মালাটি রাজার লোকেরা পেয়ে যাবে। তারা যে, মালাটি চুরি করেছে একথা জানাজানি হয়ে গেলে তাদের চাকরি চলে যাবে। এমনকি আরো অনেক কঠিন শাস্তিও হতে পারে। রাজার লোকেরা যাতে মালাটি খুঁজে না পায় এজন্য তারা রাজবাড়ির পাশের গোবরের ভিড়ার মধ্যে মালাটি লুকিয়ে রেখেছে। তারা জোলাকে অনুরোধ করে মালাটি ফিরিয়ে দিলে তাদের যেন কোনো শাস্তি না হয়। জোলা তাদেরকে আশ্বস্ত করে বলে যে, তারা যাতে কোনো শাস্তি না পায় সে ব্যবস্থা সে করবে। জোলার কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়ার পর নিন্দো টুপো নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যায়।

এদিকে মালা খুঁজে পেয়ে জোলাও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে যায়। পরদিন সকাল বেলা রাজা ঘুম থেকে উঠে জোলার খোঁজ করে। রাজার লোকেরা অনেক ডাকাডাকি করার পরও জোলার ঘুম ভাঙে না। তখন রাজা জোলার ঘুম ভাঙার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সকাল পেরিয়ে গেলেও জোলার আর ঘুম ভাঙে না। অনেক দেরিতে জোলা ঘুম থেকে ওঠে। রাজ দরবারে গণক জোলার ডাক পড়ে। জোলা খুব ধীরে সুস্থে রাজ দরবারে উপস্থিত হয়। রাজ দরবারের সবাই জোলার গনাপড়ার ফলাফল জানতে চায়। জোলা খুব আয়েশ করে রাজার সামনে বসে বলে রাজকন্যার মালার হদিস পাওয়া

www.pathagar.com

গেছে। তবে অনেক বেলা হলেও এখন পর্যন্ত তার নাস্তা খাওয়া হয় নি। সে নাস্তা না খাওয়া পর্যন্ত মালা খুঁজে পাওয়ার বৃত্তান্ত বলবে না। রাজার হুকুমে জোলাকে অনেক ভালো ভালো খাবার খেতে দেওয়া হলো।

জোলা নাস্তা খাওয়া শেষ করে, তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বললো, রাজকন্যার মালা পাওয়া গেছে। তবে মালাটি ফেরত পাওয়ার পর রাজা যেন চোরের নাম জানতে না চায়। কারণ কোনো হারানো জিনিস ফেরত পাওয়া গেলে মালিকের কাছে সেটি দেওয়ার পর চোরের নাম যাতে কোনোভাবে প্রকাশ না পায় সে ব্যাপারে তার ওস্তাদের নিষেধ আছে। তার ওস্তাদের নিষেধ উপেক্ষা করে সে চোরের নাম প্রকাশ করতে পারবে না। চোরের নাম প্রকাশ করলে সে আর গনাপড়া করতে পারবে না। একথা শুনে রাজা জোলাকে বললো, তিনি শুধুমাত্র রাজকন্যার সোনার মালাটি ফেরত পেতে চান। চোরের নাম জানার তার কোনো ইচ্ছা নেই। তখন জোলা রাজাকে বললো যে, সে এক্ষুনি গনাপড়া করে রাজকন্যার মালাটি বের করে দিচ্ছে। এই বলে জোলা গনাপড়া করতে বসে।

কালী কালী ন্যাংটা কালী
কালী কালী চুনিয়া কালী
কালী মা কয় না মিছা কথা
মাগুরে খায় শিঙ্গির ফিচা
রাজকন্যার মালা গোবরের ভিরাত
আছে পোতা।

তখন রাজার হুকুমে রাজার চাকরবাকরেরা গোবরের ভিড়ার গোবর সরিয়ে মালা খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে রাজকন্যার সোনার মালা পাওয়া যায়। রাজা খুশি হয়ে জোলাকে অনেক মূল্যবান পুরস্কার দেয়। রাজার কাছ থেকে পুরস্কার পেয়ে জোলার আর কোনো দুঃখ থাকে না। জোলা জুলি সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে থাকে।

**জোলা রাজা**

এক গ্রামে এক জোলা বাস করতো। একদিন জোলার বউ জোলাক খুব গালিগালাজ করি কইলো, যে দিন তুই কোনো ভালো কাজ করবার পাবু সে দিন তুই বাড়ি আসপু। জোলা মন খারাপ করি ঘাটা দিয়া হাঁটতে হাঁটতে একটা নিধুয়া পাথার পার হয়া দেখে একটা কচ্ছপ। জোলা কচ্ছপটাক ধরি ব্যাগত ঢুকি থোয়। কিছুদূর যাওয়ার পর জোলা একটা মোটা দড়ি পাইল। জোলা দড়িটাও তুলি নিয়া ব্যাগত থুইল। আর কিছুদূর যায়া বামন একটা বাঁশের ডাকালি পাইল বামন সেটাও কুড়ি নিয়া ব্যাগত থুইল। সব শ্যাষত বামন একটা চুনের খুঁটি কুড়ি পাইল। বামন সেটাও ব্যাগত থুইল। এরপর বামন হাঁটতে হাঁটতে একটা গ্রামের ভিতর ঢুকিল। গ্রামত ঢুকতেই বামন দেখে গ্রামের সউগ মানুষ দল বান্দি চলি যাবার নাইগচে। বামন ওমাক কইলো, তোমরা কোন্‌টে যান। সগায় কইলো হামরা গ্রাম ছাড়ি যাবার নাগচি তোমরা ফির কোটে যান। সগায় বামনক গ্রামের ভিতরা যাবার মানা করিল। বামন বোকাসোকা মানুষ। কারো কথা না শুনি

www.pathagar.com

বামন গ্রামের ভিতরা যায়া ঢুকিল। ঢুকিয়া দেখে অনেক বড় একটা বাড়ি। বামন সেই বাড়িটার ভিতরা ঢুকি দেখে অনেক ধান চাল, টাকাপয়সা সউগ ফ্যালে থুইয়া সগায় চলি গেইচে। বামন খুব খুশি হয়া ভাত আন্দি খায়াদায়া মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে বিছনাত শুতি ঘুম গেইলো। গভীর রাইতে একদল রাক্ষস আসি সেই বাড়ি ঢুকিয়া কয়, হাঁউমাঁউখাঁউ মানুষের গন্ধ পাউ। রাক্ষসের কথা শুনি বামন ভয় পাইলেও চুপ করি থাকিলো। রাক্ষস ফির কয়, হাঁউমাঁউখাঁউ মানুষের গন্ধ পাউ। তখন বামন ঘরের ভিতর থাকি কয়, তুই কায় রে। রাক্ষস কয়, আমরা রাক্ষস। বামন কয় আমি রাক্ষসের বড় ভাই খোক্ষস। বামনের কথা শুনি রাক্ষসগুলা ঘাবড়ে গেইলো। খোক্ষস আবার কি জিনিস। তখন রাক্ষস বামনক কইলো, তোর চুল দেখাও তো। বামন তখন মোটা দড়িটা ঘরের ফাঁক দিয়া বাহির করি দেইল। এরপর রাক্ষস কইলো তোর দাঁত দেখি। বামন তখন বাঁশের ডাকালিটা বাহির করি দেইল। রাক্ষস কইলো তোর মাথার উকুন দেখি। বামন কচ্ছপটা বাহির করি দেইল। রাক্ষস বামনক কইলো তোর থুথু দেখি। বামন এবার চুনের খুঁটিত একনা পানি ঢালি চুনগুলা গ্যালগ্যালা করি রাক্ষসের গাওত ছিটি দেইল। চুনগুলা যায়া রাক্ষসের চোখে মুখে পইলো। চোখত চুন পড়ি চোখ কানা হয়া গেইলো। মুখত পড়ি মুখ পোড়া গেইলো। তখন সউগ রাক্ষস ভয় পায়া পালে গেইলো। রাক্ষসের কোনো সাড়া শব্দ না পায়া বামন ফির ঘুম গেইলো। ঘুম থাকি উঠি দেখে অনেক বেলা হয়া গেইচে। বামন ভয়ে ভয়ে দরজা খুলি বাহির হয়া দেখে মানুষজন কোনো কিছুই নাই। বামন বাড়ি থাকি বাহির হয়া চাইরো পাকে ঘুরি দেখে গাছগাছালি কোনো কিছুরই অভাব নাই। বামন একদিন যায়া বামনিক নিয়া আসিল। তারপর তারা দুজনে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল।

## জোলার কাঁঠাল খাওয়া

জোলা আর জুলি। একদিন জুলি জোলাক কইলো, জোলা তোক মুই টাকা দেংচং, তুই হাট থাকি মোক একটা কাঁটোল আনি দে। জোলা টাকা নিয়া হাটে যায়া একটা ছোট কাঁটোল কিনিলো জুলির জন্যে। কাঁটোল কিনি বাড়ি আইসার সময় আধ ঘাটা আসি জোলার খুব লোভ হইলো। জোলা ঘাটাতে বসি গোটায় কাঁটোলটা খায়া ফেলাইলো। জোলা বাড়ি আইসার পর জুলি জোলাক কইলো, মোর কাঁটোল কই। জোলা জুলিক কইলো, হাটোত আজ কাঁটোল ওঠে নাই। জুলি জোলাক আর কিছু না কয়া চুপ করি থাকিলো। মাঝ রাইতে ঝড় উঠে। ঐ সময় জোলার খুব হাগা নাগিলো। জুলি জোলাক কইলো কাইঞ্চাবাড়ি যায়া হাগো। জোলা কাইঞ্চাবাড়ি যায়া গাছের তলোত বসি আরাম করি হাগিলো। এদিকে ঝড়ির পানিত গু ধুইয়া সাফ হয়া গেইচে। গাছের তলোত খালি কাঁটোলের বিচিলা পড়ি থাকিলো। পরদিন সকালে জোলা হাল ধরি গেইলো। জুলি কি তরকারি আন্দিবে এই নিয়া ভাবনায় পড়িল। এমন সময় জুলি কাইঞ্চাবাড়ি যায়া দেখিল অনেকগুলা কাঁটোলের বিচি পড়ি আছে। জুলি খুব খুশি হয়া কাঁটোলের বিচিলা কুড়ি নিয়া আসি তাকে ভর্তা করছে। জুলি খায়াদায়া জোলার জন্যে দোলাবাড়ি নিয়া গেইলো। জোলাক খুব ভোক নাইগচে। এজন্যে জোলা কোনো কতা না কয়া আগোত প্যাট ভরে খায়া নেইল। তারপর পান চাবাইতে চাবাইতে জুলিক কইলো, তুই

www.pathagar.com

কাঁটোলের বিচিলা কোন্‌টে পালু। জুলি কয় কেনে কাইঞ্চাবাড়িত পাচুং। এই কতা শুনি তো জোলা মটমট করি উকপার ধইচ্ছে। জুলি কয় কেনে উকান। জোলা কয়, উকপার নও তো কি করিম। কেনে তোর মনে নাই কাইল আইতোত তুই যে মোক কলু কাইঞ্চাবাড়ি যায়া হাগো। মোর ঐ হাগার সাতে কাঁটোলের বিচিলা বেড়াইচে জানিস। আর তুই সেই বিচিলা আনি ভত্তা কচ্ছিস। ছেকো, ছেকো।

## ডাইনি বুড়ি ও রাজকন্যা

এক দেশে ছিলো এক রাজা। অনেক দিন পর তাদের একটি ফুটফুটে মেয়ে হলো। সেই খুশিতে রাজা-রানি তাদের রাজ্যে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করলেন। তিন পরি দাওয়াত পেয়ে উৎসবে যোগ দিল। তারা রাজকন্যাকে আশীর্বাদ করলো। প্রথম পরি রাজকন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, তুমি হবে জগতের সবচেয়ে সেরা সুন্দরী। দ্বিতীয় পরি বললো, তোমার গলার স্বর খুব মিষ্টি হবে। সবাই তোমার কথা শোনার জন্য তোমাকে ঘিরে রাখবে। তুমি ভালো গান গাইতে পারবে। তোমার গান শুনে সবাই মুগ্ধ হবে। তৃতীয় পরি আশীর্বাদ করার আগেই সেখানে এক ডাইনি এসে উপস্থিত হলো। সে দাওয়াত না পেয়ে খুব ক্ষেপে গেল। সে রাজকন্যাকে আশীর্বাদ না করে এই বলে অভিশাপ দিল রাজকন্যার বয়স যে দিন ষোলো বছর পূর্ণ হবে সে দিন তার ডান হাতের আঙুলে সুতো কাটার চরকার সূঁচ ফুটবে। তারপর সে মারা যাবে। রাজকন্যা বড় হলো। একদিন রাজকন্যা বাগানে খেলছিলো। এমন সময় ডাইনি বুড়ি এসে রাজকন্যাকে বললো, তুমি চরকায় সুতা কাটা শিখবে। রাজকন্যা বুড়িকে বললো, হ্যাঁ শিখব। ডাইনি বুড়ি চরকায় সুতা কাটছে আর রাজকন্যা পাশে বসে দেখছে। এক সময় রাজকন্যা চরকার কাছে গিয়ে ডান হাত দিয়ে চরকার এক মাথা ধরলো। এরপর রাজকন্যার হাতের আঙুলে সুচ ফুটল। সাথে সাথে রাজকন্যা অচেতন হয়ে পড়লো। তখন ডাইনি বুড়ি রাজবাড়ির সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রাখলো। অনেক দিন পর এক রাজকুমার এসে রাজকন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে রাজকন্যা জেগে উঠে রাজকুমারকে দেখে খুব খুশি হলো। রাজা রানি তারাও জেগে উঠল। রাজকুমারের পরিচয় পেয়ে মহাধুমধাম করে রাজকন্যার সাথে তার বিয়ে দিল। রাজ্যের সব প্রজারা আনন্দ উৎসব করলো।

## সুয়োরানি ও দুয়োরানি

এক রাজার ছিলো দুই রানি। দুয়োরানি আর সুয়োরানি। সুয়োরানি থাকে ধবধবে সাদা পাথরের প্রাসাদে। কত তার জাঁকজমক। পরনে তার পাটের শাড়ি, গায়ে সোনার গয়না, পায়ে নূপুর। রুনুঝুনু আওয়াজ তুলে সুয়োরানি রাজপ্রাসাদে ঘুরে বেড়ায়। আর দুয়োরানি থাকে রাজপ্রাসাদ থেকে একটু দূরে একটা খড়ের ঘরে। দুয়োরানির কোনো ছেলেপুলে নাই তো, তাই রাজবাড়িতে তার কোনো আদরও নাই। সুয়োরানি তাকে একদম দেখতে পারে না। সুয়োরানি সারাদিন শুয়ে, বসে থাকে আর সব কাজ দুয়োরানিকে দিয়ে করিয়ে নেয়। কিন্তু দুয়োরানি তবুও সুয়োরানির মন পায় না। সুয়ো যদি দেখে দুয়ো বসে একটু আরাম করছে অমনি সে তাকে তার পা টিপতে বলে।

www.pathagar.com

সুয়োরানি যা বলে দুয়োরানি তাই করে। একদিন বিকাল বেলা দুয়োরানি সব কাজ শেষ করে একটা খুদের নাড়ু খেতে খেতে রাজবাড়ির ছাদে উঠে শাড়ির আচল পেতে শুয়ে পড়ে। শোয়ার সাথে সাথে ক্লান্ত শরীরে দুয়োরানি ঘুমিয়ে পড়ে। এমন সময় রাজবাড়ির উপর দিয়ে তারার দেশের দুটি পাখি শুক আর সারি উড়ে যাচ্ছিল। শুক বললো, চল রাজবাড়ির ছাদে বসে একটু জিরিয়ে নেই। ছাদে নেমে তারা দেখে দুয়োরানি সেখানে ঘুমিয়ে আছে। শুক বললো, দেখ দুয়োর দাঁতের ফাঁকে ক্ষুদের কণা আটকে আছে আয় দুজনে মিলে খাই। এই বলে তারা দুজনে ক্ষুদের কণা খেতে খেতে দুয়োরানির দাঁতগুলোও খেয়ে ফেলে। খাওয়া শেষ করে তারা দেখল ওরা দুয়োরানির দাঁতগুলোও খেয়ে ফেলেছে। তখন সারি বললো, হায় আমরা দুয়োর দাঁত খেলাম কেন? এখন দুখিনী মেয়েটার কি হবে। শুক বললো, তুই কোনো চিন্তা করিস না। চল আমরা তারার দেশ থেকে সোনার দাঁত নিয়ে এসে লাগিয়ে দেই। এই বলে ওরা দুজনে উড়ে গিয়ে সোনার দাঁত নিয়ে এসে দুয়োর মুখে লাগিয়ে দেয়। দুয়োরানি কিন্তু এসবের কিছুই জানল না। সুয়োরানি দুয়োর মুখে সোনার দাঁত দেখে বললো, কিরে দুয়ো তুই সোনার দাঁত কোথায় পেলি? দুয়োরানি বললো, তাই নাকি, আমি তো এর কিছুই জানি না। আমি খুদের নাড়ু খেয়ে ছাদের উপর শুয়ে ছিলাম। সেখান থেকে উঠে তোমার কাছে এলাম। পরদিন বিকালে সুয়োরানি খুদের নাড়ু খেয়ে ছাদের উপর গিয়ে শুয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকল। সেদিনও শুক সারি রাজবাড়ির ছাদে বসে আরাম করার সময় সুয়োরানির দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খুদের কণা খেতে গিয়ে তার দাঁত খেয়ে ফেলল। তখন শুক সারিকে বললো চল তারার দেশ থেকে সোনার দাঁত এনে লাগিয়ে দেই। সুয়োরানি অমনি বলে উঠল, আমাকে দুয়োর চেয়ে ভালো দাঁত এনে না দিলে তোদেরকে লোহার খাঁচায় আটকিয়ে রাখব। একথা শুনে শুক সারি ভয় পেয়ে উড়ে পালিয়ে গেল। সুয়োরানি ফোকলা হয়ে নিচে নেমে এল। রাগের মাথায় সে দুয়োরানিকে বললো, তুই এক্ষুণি আমার সামনে থেকে দুর হয়ে যা। দুয়োরানি মনের দুঃখে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসল। এরপর সে পথে পথে ঘুরতে, ঘুরতে দেখল একটা দিঘি। দুয়োরানি ভাবল পুকুরের পানিতে নেমে গোসল করে নেই। গোসল করে গাছের ফল পেড়ে খাব। দুয়োরানি পুকুরের পানিতে নেমে ডুব দিয়ে উঠে দেখে তার সারা শরীর সোনার অলংকার দিয়ে ভরে গেছে। আর মাথা ভর্তি কালো চুল মাটিতে লুটাচ্ছে। তাই দেখে দুয়োরানির মন খুশিতে ভরে গেল। তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আকাশে উঠেছে রূপালী চাঁদ। চাঁদের আলোতে তার গয়নাগুলো ঝিকমিক করছে। দুয়োরানি হেঁটে রাজবাড়িতে এল। দুয়োরানি রাজবাড়িতে এসে সুয়োরানির কাছে গিয়ে সবগুলো গয়না তাকে খুলে দিল। কিন্তু এতগুলো গয়না পেয়েও সুয়োরানির মন ভরল না। হিংসায় তার মন জ্বলে উঠল। সে দুয়োরানিকে বললো, বল এত গয়না তুই কোথায় পেলি। আর মেঘের মতো কালো লম্বা চুল কেমন করে হলো। দুয়ো সুয়োর কাছে সব কথা খুলে বললো। দুয়োর কাছ থেকে সব কথা শুনে সুয়ো তার ঘরে গিয়ে সব গয়না খুলে রেখে কাউকে কিছু না জানিয়ে সেই পুকুর পাড়ে গেল। পুকুরের পানিতে ডুব দিয়ে উঠে দেখল তার সারা শরীর গয়না দিয়ে ভরে গেছে। তার মাথার চুলও মেঘের মতো কালো আর লম্বা হয়ে গেছে। সুয়ো ভাবল আর একবার পুকুরের

www.pathagar.com

পানিতে ডুব দিলে আমি দুয়োর চেয়ে আরো বেশি গয়না পাব। আমার মাথার চুলও দুয়োর চেয়ে আরো বেশি লম্বা আর কালো হবে। এই ভেবে সুয়ো আবার পুকুরের পানিতে ডুব দিল। কিন্তু উঠে দেখে তার সেই গয়নাও নেই, মাথার চুলও নেই। সুয়ো এবার মনের দুঃখে কাঁদতে, কাঁদতে রাজবাড়ির দিকে চললো। কিন্তু সে রাজবাড়ির পথ হারিয়ে ফেলে আর রাজবাড়িতে যেতে পারল না।

**রাজপুত্র ও নাপিত**

এক রাজপুত্রের ছিলো এক নাপিত বন্ধু। রাজপুত্র বিয়ে করার পর তার নাপিত বন্ধুকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবে। কিন্তু তার নাপিত বন্ধু যেতে রাজি হচ্ছে না। নাপিত রাজপুত্রকে বলে তার কোনো ভালো জামা কাপড় নেই। ভালো জামা কাপড় না থাকায় তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারছে না। রাজপুত্রের দামি পোশাকের পাশে তার পোশাক খুবই বেমানান দেখাবে। তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তখন তাকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করবে। আমি তোমার মতো দামি পোশাক পাব কোথায়? তখন রাজপুত্র তার নাপিত বন্ধুকে বলে, তোমার রাজকীয় পোশাক নেই তাতে কি হয়েছে? আমরা দুজন শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার সময় দুজনের পোশাক অদল বদল করে পরব। যেমনি বলা তেমনি কাজ। তারা দুজন শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলো। প্রথমে রাজপুত্র তার দামি পোশাক পড়লো। নাপিতও তার নিজের পোশাক পড়লো। অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পর নাপিত রাজপুত্রকে বললো প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবার তাদের পোশাক বদল করার পালা। রাজপুত্র সরল বিশ্বাসে তার নাপিত বন্ধুর সাথে পোশাক বদল করলো। সামনেই রাজপুত্রের শ্বশুর বাড়ি। শ্বশুর বাড়ি পৌঁছানোর পর নাপিতের গায়ে দামি পোশাক দেখে তারা নাপিতকে তাদের জামাই মনে করে নাপিতকে অনেক আদর আপ্যায়ন করে। রাজা তার নকল জামাইয়ের কাছ থেকে তার সঙ্গী যুবকের পরিচয় জিজ্ঞেস করে। নাপিত উত্তর দেয় ও আমার ঘোড়ার ঘাসি।

রাজপুত্র তার নাপিত বন্ধুর চালাকি বুঝতে পারলেও তখন তার কিছুই করার ছিলো না। রাজপুত্র সবকিছু মেনে নিয়ে ঘোড়ার ঘাসি পরিচয়ে নাপিতের সাথে সময় কাটায়। আর মনে মনে ভাবে সে-ই যে আসল জামাই। সেটা যে করেই হোক তাকে প্রমাণ করতে হবে। একদিন রাজপুত্র ঘোড়ার ঘাস কাটতে গেছে। এরপর হঠাৎ করে সেখানে এক উপকারী জিন এসে উপস্থিত হয়। জিন রাজপুত্রকে বলে আমি তোমার কষ্ট দেখে তোমার কাছে ছুটে আসলাম। আমি তোমাকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, তুমি এই মন্ত্র কাজে লাগিয়ে শ্বশুর বাড়ির লোকদের কাছে তোমার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারবে। তা হলে তোমার দুঃখ ঘুচে যাবে, তোমার নাপিত বন্ধুও তার চালাকির জন্য শাস্তি পাবে। মন্ত্রটি হলো 'লাগ চোট আর খোল চোট'। জিন রাজপুত্রকে এই মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। রাজপুত্র জিনের কাছ থেকে শেখা মন্ত্রটি মনে মনে আউড়িয়ে মুখস্ত করে নেয়। এরপর জিনের শেখানো মন্ত্রটি কাজে লাগানোর জন্য সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। একদিন রাজপুত্র কাঁঠাল খেতে বসেছে। এ সময় রাজপুত্র তা দেখে বলে 'লাগ চোট' সঙ্গে সঙ্গে কাঁঠালের চাপিসহ নাপিতের মুখে লেগে যায়। আবার 'খোল চোট' বলার সাথে সাথে নাপিতের মুখ থেকে তা খুলে যায়। রাতের বেলা নাপিত

www.pathagar.com

রাজকন্যার পাশে বসে গল্প করতে করতে রাজকন্যার গালে চুমু দেওয়ার সাথে সাথে রাজপুত্র বলে 'লাগ চোট'। সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার গালের সাথে নাপিতের ঠোঁট আটকে যায়। অনেক চেষ্টা করেও তারা তা খুলতে পারে না। এ নিয়ে রাজবাড়িতে হৈচৈ পড়ে যায়। রাজা মহাশয় খুবই অস্থির হয়ে পড়েন। কিন্তু কারো কোনো চেষ্টাই কাজে আসছে না। এরপর রাজপুত্র একইভাবে রাজাকে তার সিংহাসনে আটকিয়ে রাখে। রাজকন্যা এবং রাজাকে উদ্ধার করার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক হেকিম, কবিরাজ, গণক আসে। কিন্তু সবাই নিরুপায় হয়ে বসে আছে। রাজপুত্র মন্ত্রের সাহায্যে তাদেরকেও একই কৌশলে আটকিয়ে রাখে। এভাবে রাজপুত্র সবাইকে শাস্তি দেয়।

রাজপুত্র প্রথমে 'খোল চোট' বলে রাজাকে মুক্ত করে। এরপর রাজকন্যাকে মুক্ত করে। সবশেষে অন্যদেরকেও মুক্ত করে দেয়। রাজপুত্র রাজাকে মুক্ত করার পর রাজার কাছে তার প্রকৃত পরিচয় দেয়। সব কিছু শোনার পর রাজা রাজপুত্রের কথা বিশ্বাস করে। নাপিতের চালাকির কারণে তারা তাকে চিনতে না পেরে অনেক কষ্ট দিয়েছে। ভুল বোঝাবুঝির কারণে রাজপুত্রকে কষ্ট দেওয়ার জন্য রাজপুত্রের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে। খুব ধুমধাম করে রাজপুত্রকে বরণ করে নেয় এবং রাজা নাপিতকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্য হুকুম দেয়।

## বুড়ো বুড়ি

এক বুড়ো আর এক বুড়ি আড়াই গাড়তে ধরছে। একদল শিয়াল এসে বললো, বুড়ো আড়াই কাচা না সিদ্ধ করে গাড়তেছ। বুড়ো বললো, কেন কাচা। তখন শিয়ালগুলো বললো, আড়াই সিদ্ধ করে গাড়তে হয়। তা হলে দেখবে কালই তোমার আড়াই হয়ে গেছে। এই কথা শুনে বুড়ো বুড়ি আড়াই সিদ্ধ করে গাড়ল। তারপর শিয়ালেরা রাতে দল বেঁধে এসে সবগুলো আড়াই খেয়ে পায়খানা করার পর অন্য একজনের আড়াই গাছ কেটে নিয়ে এসে জমিতে সেগুলো লাগিয়ে রেখে চলে যায়।

পরদিন সকাল বেলা বুড়ো এসে দেখল তার জমিতে আড়াইয়ের গাছ হয়ে গেছে। বুড়ো খুশি হয়ে বাড়িতে গিয়ে বুড়িকে বললো, বুড়ি, বুড়ি আমি জমিতে হাল নিয়ে যাচ্ছি। তুমি আমার জন্য পান্তা আর আড়াই ভর্তা করে নিয়ে এসো। এই বলে বুড়ো হাল নিয়ে চলে গেল। বুড়ি গিয়ে আড়াই খুড়তে শুরু করলো। কিন্তু বুড়ি পুরো জমি খুড়ে মাত্র একটি আড়াই পেলো। বাকী সবগুলো আড়াই শেয়ালেরা খেয়ে সেখানে পায়খানা করে রেখেছে। বুড়ি তখন ঐ একটি আড়াই ভর্তা করে মনে মনে ভাবল, একটু খেয়ে দেখি, কেমন মজা হয়েছে। বুড়ি একটু খেয়ে দেখল বেশ মজা হয়েছে। তাই বুড়ি সবগুলো ভর্তা খেয়ে ফেলল। এখন বুড়োর জন্য সে কি নিয়ে যাবে, সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লো। আর ওদিকে বুড়ো খিদের জ্বালায় রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু বুড়ি আর পান্তা নিয়ে আসে না।

বুড়ি শেষ পর্যন্ত কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে শুধু লবণ আর মরিচ দিয়ে বুড়োর জন্য পান্তা নিয়ে বের হয়েছে। ওদিকে বুড়ো খিদের জ্বালা সইতে না পেরে রাগ করে বাড়ির দিকে আসতে শুরু করেছে। আর মনে মনে ঠিক করেছে বাড়িতে গিয়ে সে বুড়িকে মারবে। এমন সময় পথে বুড়ির সাথে বুড়ার দেখা হয়। বুড়ো বুড়ির উপর প্রচণ্ড

www.pathagar.com

রাগ। তখন বুড়ি বুড়োকে বললো, শিয়ালেরা তোমাকে মিথ্যে বলেছে। ওরা সবগুলো আড়াই খেয়ে ফেলে পায়খানা করে সেখানে অন্য গাছ নিয়ে এসে লাগিয়ে রেখেছে। আমি শুধু একটা আড়াই পেয়েছি। ওটা ভর্তা করে রেখেছিলাম। আমি পান্তা নিয়ে আসার সময় দেখি ভর্তাগুলো বিড়াল এসে খেয়ে ফেলেছে। বুড়ো বুড়ির কথা বিশ্বাস করে রাগে, দুঃখে অভিশাপ দিয়ে বললো, যে আমার আড়াইয়ের ভর্তা খেয়ে ফেলেছে তার আড়াই ইঞ্চি বাচ্চা হবে।

## চাঁদের মা বুড়ি

এক ছিলো চাঁদের মা বুড়ি। সে সারাদিন চরকায় সুতা কাটে। সেগুলো বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায়। একদিন একটি মেয়ে চরকায় সুতা কাটতে বসলো, আর অমনি জোরে বাতাস বইতে শুরু করলো। বাতাসের ধাক্কায় মেয়েটির সবগুলো সুতা উড়ে গেল। মেয়েটি দিশেহারা হয়ে কাঁদতে শুরু করলো। মেয়েটিকে কাঁদতে দেখে বাতাস তাকে বললো, কেঁদো না আমার সাথে চলো। বাতাসের কথা শুনে মেয়েটি কান্না থামিয়ে বাতাসের সাথে সাথে চললো। বাতাস মেয়েটিকে নিয়ে এক বাড়ির সামনে এসে থামল। বাতাস মেয়েটিকে বললো, এই বাড়িতে থাকে এক চাঁদের মা বুড়ি। তুমি বুড়ির কাছে যাও। বুড়ি তোমাকে অনেক সুতা দিবে। একথা বলে বাতাস চলে গেল। মেয়েটি আস্তে আস্তে সেই বাড়ির কাছে গেল। কিছুক্ষণ পর চাঁদের বুড়ির সাথে তার দেখা হলো। মেয়েটি বুড়ির কাছে তার দুঃখের কথা জানাল। বুড়ি মেয়েটিকে একটি পুকুর দেখিয়ে দিয়ে বললো, তুমি ঐ পুকুরে নেমে তিনটি ডুব দাও। বুড়ির কথা শুনে মেয়েটি পুকুরের পানিতে নেমে তিনটি ডুব দিল। পানিতে ডুব দেওয়ার পর মেয়েটি দেখতে পেল তার সারা শরীর মণি, মুক্তা, হীরা, জহরতে ভরে গেছে। মেয়েটি খুশি হয়ে পুকুর থেকে উঠে এসে বুড়িকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। তখন তার আর কোনো দুঃখ থাকে না।

## চতুর শেয়াল

এক বনে এক চতুর শেয়াল বাস করতো। এক সময় সে শেয়ালদের সর্দার ছিলো। সে খুবই শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান ছিলো। এজন্য সে আশপাশের সব মুরগি একাই ধরে খেত। সে তার সঙ্গী শেয়ালদেরকে মুরগির ভাগ দিত না। কিন্তু এক সময় শেয়াল বেচারা বুড়ো হয়ে যায়, সে আর চলতে পারে না। তখন তার দলের অন্য শেয়ালগুলো তার সামনে মুরগি ধরে এনে খায়। অন্য শেয়ালগুলো তার সামনে মুরগি ধরে এনে খেলেও সে কিছু করতে পারে না। হঠাৎ তার মাথায় একটি বুদ্ধি আসে। সে হজ করতে যাবে একথা চারদিকে প্রচার করে। সে তার মুখে দাড়ি এবং মাথায় টুপি পড়ে এলাকার সব মুরগির কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নেয়। সে হজে যাওয়ার আগে সব মুরগিকে দাওয়াত খাওয়াতে চায়। সে মুরগিদের উদ্দেশ্যে বলে যে, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমি আর চলতে পারি না। তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি হজে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে দাওয়াত খাওয়াতে চাই। শেয়ালের চালাকি বুঝতে না পেরে সব মুরগিই শেয়ালের বাড়িতে দাওয়াত খেতে যায়। তখন সুযোগ বুঝে শেয়াল তার গর্তের মুখ বন্ধ করে দিয়ে প্রতিদিন বসে বসে একটা করে মুরগি ধরে আরাম করে খেতে থাকে।

www.pathagar.com

### পাঠা ও শিয়াল

এক ছিলো পাঠা। এই পাঠা এক পাল বকরিকে চরাত। পাঠা প্রতিদিন একটি জঙ্গলে বকরিগুলোকে চরাতে নিয়ে যেতো। পাঠা যে বনে বকরিগুলোকে চরাত সেই বনের পাশে একটি শিয়াল থাকত। একদিন শিয়াল পাঠাকে বলে, ঐ পাঠা মোক একটা ভালো চায়া হাইলন দেইস। তা না হইলে মুই তোকে খাইম। এই কথা বলে শিয়াল ভালো দেখে একটা বকরিকে ধরে নিয়ে যায়। এদিকে পাঠা বকরিটিকে না দেখে খুঁজতে খুঁজতে অনেক গভীর বনে চলে গেছে। ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে। পাঠা একটা ঝাপুর ঝুপুর গাছের আড়ালে শুয়ে পড়ে। পাঠা চিন্তা করে এখন কি হবে। সেখানে থাকত একটি বাঘ। বাঘ শিকার থেকে ফিরে এসে দেখে কে যেন জায়গায় শুয়ে আছে। পাঠা নিশ্চিন্তে জাবর কাটতে থাকে। বাঘ বলে কে রে? পাঠা বলে তিনটা শিয়াল খাইছোং আর একটা বাঘ খাইলে মোর প্যাটটা ভইবরে। বাঘ একটা শিয়ালকে নিয়ে এসেছে। তখন পাঠা শিয়ালকে দেখে বলছে, তোক তখনে পটে দিছোং আর তুই এত দেরি করি একটা বাঘ ধরি আসলু। এই বলে পাঠা বাঘ আর শিয়ালকে রশি দিয়ে বাঁধতে যায়। বাঘ ঘটনা বুঝতে না পেরে পালিয়ে যায়। শিয়াল কয় পাঠা রে?

### রাজার কবুতর

এক ছিলো রাজা আর এক ছিলো রানি। তার রাজ্যে সুখের কোনো অভাব ছিলো না। প্রজারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিলো। কিন্তু রাজা ছিলেন খুবই খেয়ালি। একদিন রাজার ইচ্ছা হলো বিদেশে বেড়াতে যাওয়ার। রাজা রানিকে নিয়ে বিদেশে বেড়াতে যাবেন। মন্ত্রী তাদের বিদেশ যাওয়ার সব ব্যবস্থা করলেন। রাজবাড়িতে রাজা তার একটি পোষা কবুতরকে পাহারা রেখে গেলেন। রাজ্যের সব প্রজাই খুব যত্ন করে তাদের জমিতে ফসল ফলাল। ধান পাকার পর ধান কেটে শুকিয়ে রাজবাড়ির গোলায় তুলে রাখলো। রাজা ফিরে এসে সব প্রজাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো এবার আবাদ কেমন হয়েছে। সবাই জবাব দিল হুজুর খুব ভালো হয়েছে। এরপর রাজা ধান দেখতে চাইলেন। গোলার দরজা খুলে রাজা দেখলেন গোলায় কোনো ধান নেই। তিনি শুধুমাত্র কবুতরের গু দেখতে পেলেন। রাজা ভাবলেন, কবুতর তার সব ধান খেয়ে ফেলে পায়খানা করে গোলা ভর্তি করে রেখেছে। রাজা রেগে গিয়ে কবুতরের ঘাড় মটকে দিলেন। কবুতরের ঘাড় মটকানোর সাথে সাথে সব গু সোনা হয়ে গেল। তখন রাজা মাথায় হাত দিয়ে বললেন, হায় হায় আমি একি করলাম নিজের সোনাকে নিজেই মেরে ফেললাম।

### একটা চেংরার পিটা খাওয়া

একটা চেংরা একদিন উয়ার মাক কইলো, মা মোক কেনে বা খুব পিটা খাবার মনায়ছে, মুই পিটা খাইম। কিন্তু ওমরা খুবে গরিব। উয়ার মাও শুনি কইলো। পিটা বানাইতে গেইলে আটা নাইগবে, গুড় নাইগবে, তেল নাইগবে। এইগলা না হইলে পিটা বানা যাবার নয়। চেংরার কাচোত কোনো টাকা নাই। তখন চেংরাটা করিল কি ওমার গরু মাইনসের ধানবাড়িত ছাড়ি দিয়া আসিল। খানেক পরে যায়া গরুর পাওত নাগি

www.pathagar.com

যেইগলা ধান পইচ্চে সেইগলা কুড়ি নিয়া হাট ধরি গেইলো। হাটোত ধান বেচেয়া আটা কিনিলো, গুড় কিনিলো, ত্যাল কিনিলো। সউগ কিনি নিয়া বাড়ি আসি উয়ার মাক কইলো, মা তুই এলা পিটা বানে মোক দে। তখন চেংরার মাও চেংরাক পিটা বানে দেইল। চেংরা বাড়িত বসি কয়টা খাইল আর একটা পিটা উয়ার বাড়ির পাশোত মাটি খুড়ি গাড়ি দেইল। ইয়ার পর তো একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘটি গেইলো। চেংরা যে পিটাটা মাটিত গাড়ি দিচে পরদিন যায়া দেখে সেটে একটা পিটার গাছ হয়া গেইচে। চেংরা খুশি হয়া সেই গাচোত চড়ি মনের হাউসে পিটা খায় আর খায়। এমন সময় ওই পাক দিয়া একটা বুড়ি যায়। বুড়ি কয় ঐ চেংরা মোকো একটা পিটা দে তো খাং। চেংরা একটা পিটা ছিড়ি বুড়িক ঢেলে দেইল। পিটাটা মাটিত পড়ি গেইলো। তখন বুড়ি কয় মুই তোর মাটিত পড়া পিটা খাবার নং। মোক যদি তুই পিটা ছিড়ি নামি আসি হাতোত দেইস তাহইলে মুই তোর পিটা খাইম। চেংরা বুড়ির চালাকি না বুজিয়া পিটা ছিড়ি হাতোত নিয়া গাছ থাকি নামি আসি বুড়িক দেইল। এদিকে বুড়ি ছিলো একটা ডাইনি। বুড়ি পিটার সাথে চেংরাকও একটা বস্তাত ঢুকাইল। তারপর বুড়ি বস্তাটা ঘাড়োত নিয়া বাড়ি গেইলো। বুড়ি বস্তাটা বাড়ি নিয়া যায়া উয়ার ব্যাটার বউওক কইলো, বস্তার ভিতরা একটা চেংরা আছে উয়াক কাটি আন্দি থো। মুই গাও ধুইয়া আসি খাইম। তখন বউটা বস্তার মুখ খুলি চেংরাক বের করিল। চেংরার দাঁতলা খুব ঝকঝকা দেখি বুড়ির বউ কইলো, তোর দাঁতলা এমন ঝকঝকা হইলো কেমন করি। তখন চেংরা কইলো নিশি দিয়া দাঁত মাঞ্জিলে দাঁত এমন চকচকা হয়। চেংরা বউটাক কইলো, এক হাঁড়ি গরম ত্যাল হইলে তাক দিয়া মুই নিশি বানে দিবার পাইম। এই কতা শুনিয়া বউটা চেংরাটাক এক হাঁড়ি গরম ত্যাল আনি দেইল। চেংরা গরম ত্যাল পায়া নিমিষে ডাইনি বুড়ির বউয়ের গাওত ঢালি দেইল। গরম ত্যালের ছাংটাতে ডাইনি বুড়ির বউ মরি গেইলো। তখন চেংরা আর দেরি না করি ঝটপট ডাইনি বুড়ির বউয়ের কাপড়লা পড়ি নিয়া বুড়ির বউওক কাটি আন্দি থুইল। বুড়ি বাড়ি আইসতে বউটা বুড়িক খাবার দেইল। চেংরাক খাবার পায়া বুড়ি তো খুব খুশি হইলো। বুড়ির খাওয়া শ্যাষ হইতেই বউটা কইলো থালিবাসনলা নদীর পাড় থাকি ধুইয়া নিয়া আইসোং। চেংরা সুযোগ পায়া থালিবাসনলা ধরি নদীর পাড় গেইলো। থালিবাসন মাঞ্জি থুইয়া চেংরা কইলো মুই মাজ নদী যায়া ঐ পদ্মফুলটা ধরি আইসোং। এই কতা কয়া চেংরা নদী সাতরি পার হয় আর মাতা তুলি ডাইনি বুড়িক কয় :

তোর বউওক তুইয়ে খালু
মোক তুই ঘেচু খাবার পালু।

**চালাক বামনের গল্প**

এক ছিলো বামন। তার ছিলো তিনটা ছেলে। বামনের সংসার ভালোভাবে চলত না। তারা ঠিক মতো খাইতে পেত না। বামন যে গ্রামে বাস করতো তার পাশে ছিলো একটা গহিন বন। ভয়ে কেউ সেই বনে ঢোকার সাহস পেত না। একদিন বামনকে বামনের বউ খুব গালিগালাজ করে খাওনের বাদে। কিন্তু বামন খাওন জোগাড় করির পায় না। বামন মনের দুঃখে বাড়ি থাকি বাহির হয়া সেই বনের দিকে যায়। বনে

www.pathagar.com

ঢোকার আগে বামন দেখে গাছের বাকলত একটা প্রদীপ পড়ি আছে। বামন প্রদীপটা হাতে নিয়া নাড়াচাড়া করি দেখে। হঠাৎ প্রদীপের ভিতরা থাকি একটা দৈত্য বেড়ায়। বামন দৈত্যকে দেখি ভয় পায়। কিন্তু বামন ছিলো খুব চালাক সে ভয় পাইলেও চুপ করি থাকে। দৈত্যটা বাহির হয়া বামনক কয়, ক তোর কি চাই। তুই যেটায় চাবু মুই তোক সেটাই দেইম। কিন্তু একটা শর্ত আছে, তুই যে জিনিসটা চাবু তার চায়া দুই গুন বেশি হইবে তোর গ্রামবাসীর। বামন প্রদীপটা হাতত নিয়া বাড়ি যায়া উয়ার বউওক কয়, এটা ভালো করি থো। নাড়াচাড়া করিস না। মুই বাজার থাকি আইসোং। এই কথা কয়া বামন বাজার চলি গেইলো। বামনের বউয়ের মনটা চাইল প্রদীপটা দেখির। বামনের বউ প্রদীপটা হাতত নিয়া নাড়াচাড়া করতেই দৈত্যটা বাহির হয়া আসি বামনের বউওক কইলো, ক তোর কি চাই। বামনের বউ ভয় না পায়া দৈত্যটাক কইলো, মোর বাড়িটা পাকা করি দে। সাথে সাথে বামনের বাড়ি একতলা হয়া গেইলো। আর প্রতিবেশীগুলার বাড়ি দোতলা হয়া গেইলো। বামনের বউ দৈত্যের শর্তের কথা কিছুই জানে না। এটা দেখি বামনের বউ খুবই অবাক হইলো। বামন উয়াক মানা কইরচ্ছে প্রদীপটা নাড়াচাড়া কইরবার। তাও তায় প্রদীপটা নাড়াচাড়া কইরচ্ছে। বামনী ভয়ে অস্থির। বামন ফিরি আসি কি কইবে। বামন হাট থাকি বাড়ি আইসপার ধইচ্ছে। কিন্তু বামন আর বাড়ি খুঁজি পায় না। অনেক কষ্ট করি বামন বাড়ি খুঁজি বাহির করে। বামনের বউ বামনক সউগ কথা খুলি কয়। বামন ছিলো খুবে চালাক। বামন প্রদীপটা হাতত নিয়া ফির ঘষিল। দৈত্য বাহির হয়া কইলো, ক তোর কি চাই। বামন কয় মোর বাড়ির দুই পাকে পুকুর বানে দে। তারপর বামন দৈত্যক কইলো, মোর এক চোখ কানা করি দে। সাথে সাথে বামনের এক চোখ কানা হয়া গেইলো। আর গ্রামের সবারে দুই চোখ কানা হয়া গেইলো। গ্রামের সউগ লোকের চোখ কানা। সেই জন্যে ওমরা যখন বাড়ি থাকি বাহির হবার গেইলো তখন সবাই পুকুরের পানিত ডুবি মরি গেইলো। তখন সেই গ্রামত বামন আর বামনের বউ ছওয়া মিলি সুখে-শান্তিতে বাস করে।

## খ. কিংবদন্তি

যে লোককাহিনিগুলোতে অতীতকালের কোনো বীরপুরুষ, কোনো জনপ্রিয় সম্রাট, কোনো সমাজসেবী জননেতা, কোনো বিখ্যাত কবি, দুর্দান্ত ও অত্যাচারী সম্রাট বা ক্ষমতাধর ব্যক্তি এবং এই জাতীয় চরিত্রের এক বা একাধিক কাহিনি বর্ণিত হয়, সেগুলোই কিংবদন্তি। কিংবদন্তি ইতিহাস না হলেও ইতিহাসের উৎস হিসেবে কাজ করে। কিংবদন্তির কাহিনি কোনো সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। তবে সেই ঘটনার সাথে জনশ্রুতি, লোককল্পনা ইত্যাদি যুক্ত হয়। নিচে নীলফামারী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের নামকরণ নিয়ে প্রচলিত কয়েকটি কিংবদন্তি তুলে ধরা হলো :

**ধাইজান নদী :** জলঢাকা উপজেলার স্থানীয় ধাইজান নদী নিয়ে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। তিস্তা নদীর ক্যানেল অতিক্রম করে রহমানিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশের ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে ধাইজান নদীর স্রোত উজান দিকে প্রবাহিত হয়। সাধারণত নদীর পানি ভাটির দিকে প্রবাহিত হলেও ধাইজান নদীর স্রোত উজান দিকে প্রবাহিত হয়। নদীর উজান স্রোতের স্থানে স্থানীয় লোকদের মধ্যে অনেকেই আশু রোগ মুক্তির

www.pathagar.com

আশায় গোসল করে। আবার কেউ, কেউ রোগ মুক্তির আশায় এখানকার পানি পান করে থাকে। এই নদীর পানি পান করে অনেকে রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছে বলে জানা যায়।

**এলংমারী :** অতীতে এই এলাকায় এলং মাছের প্রাচুর্য থাকায় এলাকার নামকরণ করা হয়েছে এলংমারী।

**টেঙ্গনমারী :** টেঙ্গনমারী এলাকায় নীলকর সাহেবদের টাঙ্গন ঘোড়াগুলো মারা যাওয়ায় এলাকার নাম হয়েছে টেঙ্গনমারী।

**কুখাপাড়া :** এই এলাকায় কুকুয়া নামক পাখির প্রাচুর্য থাকায় এলাকার নাম হয়েছে কুকুয়া পাড়া। পরবর্তীতে কুকুয়াপাড়া কুখাপাড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে।

**ভীমের মায়ের চুলা :** কিশোরগঞ্জ উপজেলার ডাকবাংলোর উত্তর দিকে অবস্থিত 'ভীমের মায়ের চুলা' নামে কথিত স্থানটি সকলের কাছে সুপরিচিত। এই ভীম মহাভারতে উল্লিখিত ভীম নন, ইনি কৈবর্তরাজ। কিংবদন্তি অনুসারে ভীম নামে জনৈক বীরের নাম পাওয়া যায়। ভীমের মায়ের চুলার নিকটে 'মারগলা নদী' নামে একটি মজা নদী মহাবীর ভীমের স্মৃতি বহন করছে।

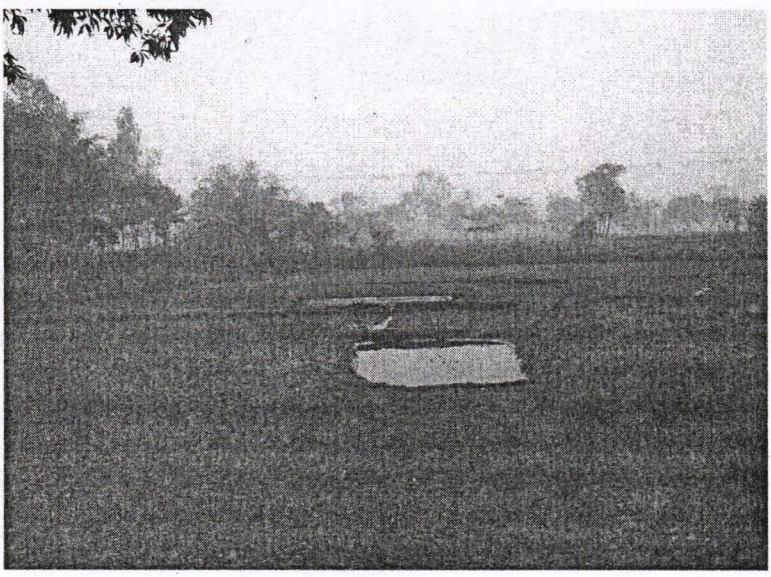

ভীমের মায়ের চুলার মূল অংশ

রামপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভীম উল্লিখিত গভীর বনের নিকটে রাস্তার পাশে দুর্গ নির্মাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। হয়ত এই দুর্গ নির্মাণ শেষ হওয়ার পূর্বে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। অথবা যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করতে হয়েছে। কিন্তু দুর্গের জন্য খননকৃত স্থানটি অবিকৃত অবস্থায় তা চুলা সদৃশ বলে মনে হচ্ছে।

www.pathagar.com

ভীমের মায়ের চুলার মুখ গহ্বর

**চিলাহাটি :** কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ ওরফে চিলারায় ছিলেন কোচরাজ্যের অন্যতম সেনাপতি। তিনি সম্পূর্ণ কামরূপ রাজ্যে শান্তি স্থাপন করার পর রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, কামরূপের জনৈক রাজার ভাগিনা ও সেনাপতি চিলারায় বর্তমান চিলাহাটি নামক স্থানে রাজপ্রতিনিধি হিসেবে বসবাস করতেন। চিলারায়ের নামানুসারে চিলাহাটি নামক স্থানের নামকরণ হয়েছে বলে জানা যায়।

**দাউদ :** নীলফামারী সদর উপজেলার টুপামারী ইউনিয়নে অবস্থিত 'দাউদ' নামক গ্রামটি বাংলার কররানি বংশের অন্যতম শাসক দাউদ কররানির স্মৃতি বহন করছে।

**ঢিং ঢিং পাড়া :** বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে সংঘটিত প্রজাবিদ্রোহের সময় নুরল দীনকে নবাব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে 'প্রজা বিদ্রোহ' পরিচালনা করা হয়। প্রজা বিদ্রোহ পরিচালনা করার জন্য সেসময় প্রজাদের কাছ থেকে 'ঢিং খরচা' নামে একপ্রকার কর আদায় করা হতো। নীলফামারী সদর উপজেলার 'পঞ্চপুকুর' ইউনিয়নে অদ্যাবধি 'ঢিংঢিং পাড়া' নামক গ্রামটি প্রজা বিদ্রোহের স্মৃতি বহন করছে।

**মুশা :** কিংবদন্তি অনুসারে জানা যায় যে, ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা মজনু শাহের ভ্রাতা মুশা শাহ বর্তমান কিশোরগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণে অবস্থিত মুশা নামক গ্রামে সৈন্য সামন্ত নিয়ে আখড়া তৈরি করে সেখানে বসবাস করতেন। এর পার্শ্ববর্তী গ্রামে তিনি তার অধীনস্থ সিপাহিদেরকে যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। মুশা

www.pathagar.com

শাহ তার অধীনস্থ সিপাহিদেরকে বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র চালনার কৌশল শেখাতেন। মুশা শাহ যে স্থানে তার সৈন্যদেরকে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন সেই চাদমারী নামক স্থানটি বর্তমানে চাঁদখানা সংক্ষেপে চানখানা নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

অনেকের মতে ভীমের মায়ের চুলার কাছে অবস্থিত শুকনো পুকুরটি মহাবীর ভীমের কীর্তি নয়। এটি মুশা শাহ কর্তৃক খননকৃত হয়েছে। মুশা শাহ তার অধীনস্থ সৈন্যদের প্রয়োজনে পুকুরটি খনন করে থাকতে পারেন।

**ভবানীগঞ্জ/ভবানন্দ হাট :** ফকির সন্ন্যাসী ও প্রজা বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ভবানী পাঠক ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার সময় ভবানী পাঠক নৌপথে চলাফেরা করতেন। বর্তমান নীলফামারী জেলার বিভিন্ন স্থানে ভবানী পাঠক যুদ্ধ সংঘটনের কাজে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভবানী পাঠকের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নীলফামারী সদর উপজেলার উত্তর দিকে অবস্থিত একটি উল্লেখযোগ্য হাটের নামকরণ করা হয়েছে 'ভবানীগঞ্জ'। অনেকে ভবানী পাঠককে ভবানন্দ পাঠকও বলে থাকেন। ভবানী পাঠকের স্মৃতিকে স্মরণীয় রাখার জন্য সদর উপজেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য হাটের নামকরণ করা হয়েছে 'ভবানন্দ হাট'।

**মাদারের থান/সন্ন্যাসীর থান :** নদীবহুল ও জঙ্গলাকীর্ণ নীলফামারী অঞ্চল বিদ্রোহী ফকির ও সন্ন্যাসীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ছিলো। নীলফামারী জেলার বিভিন্ন স্থানে ফকিরের থান বা মাদারের থান রয়েছে। এসব থানে বিদ্রোহীরা সংগঠিত হতেন। স্থানীয়ভাবে আশ্রমকে থান বলা হয়। সুবিধাজনক স্থানে মাদারী ফকির ও সন্ন্যাসীরা আস্তানা তৈরি করতো। বিদ্রোহীদের একত্রিত করার জন্য কতকগুলো স্থান নির্দিষ্ট করা ছিলো। সদর উপজেলার সোনারায় ইউনিয়নের পূর্ব দিকে অবস্থিত মাদারগঞ্জের হাট মাদারী ফকিরদের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

**পাঠানপাড়া :** জলঢাকা উপজেলার পাঠানপাড়ার গোড়াপত্তন হয়েছে পাঠান বংশীয় লোকদের দ্বারা। অতীতে পাঠান সুলতানদের বংশধর বা পাঠান সৈন্যরা এখানে বসতি গড়ে তোলেন। এজন্য এই এলাকাটি পাঠানপাড়া নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

**দারোয়ানী :** মুসলিম শাসনামলে দারোয়ানেরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করতো। দারোয়ানেরা সীমানা চৌকি পাহারার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সুদূর অতীতে করতোয়া নদী কামরূপ ও গৌড় রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করতো। সুলতানি আমলে কামরূপ রাজ্যের সাথে যোগাযোগের অন্যতম পথ ছিলো দারোয়ানী। বিভিন্ন কারণে দারোয়ানীর গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে একটি চৌকি স্থাপন করা হয়েছিলো। হোসেন শাহের আমলে এখানে চৌকিদার বা দারোয়ানের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিলো। দীর্ঘদিন ধরে দারোয়ানের অবস্থানের কারণে এলাকার নামকরণ হয়েছে দারোয়ানী। দারোয়ানীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত সর্বমঙ্গলা নদীর পূর্বতীরে একটি বন্দর গড়ে উঠেছিলো। এই বন্দরে দারোয়ানেরা হাটবাজার করার কারণে এই স্থানের নামকরণ হয়েছে দারোয়ানী। ইংরেজ আমলে দারোয়ানীর গুরুত্ব বিবেচনা করে ইংরেজরা দারোয়ানীতে থানা স্থাপন করেন।

www.pathagar.com

**পঞ্চপুকুর :** সদর উপজেলার পঞ্চপুকুর নামক স্থানে পাণ্ডবেরা কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। এখানে বসবাসকালে পাণ্ডবেরা একই স্থানে পাশাপাশি পাঁচটি পুকুর খনন করেছিলেন। পাণ্ডবদের খননকৃত পঞ্চপুকুর পাণ্ডবদের স্মৃতি বহন করছে।

**নীল সাগর :** সদর উপজেলার গোড়গ্রাম নামক স্থানে ইতিহাসখ্যাত বিরাট রাজার 'উত্তর গো-গৃহে' পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাস করেছিলেন। গো-গৃহ থেকে গো গ্রাম এই গো-গ্রাম পরিবর্তিত হয়ে গোড়গ্রাম নামের প্রচলন হয়েছে। গোড়গ্রামে বিরাট রাজার গরুর বাথান ছিলো। বিশাল গরুর বাথানের পানীয় জলের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে রাজা বিরাট গোড়গ্রামে একটি বিশাল পুকুর খনন করেছিলেন। রাজার নামানুসারে পুকুরের নামকরণ করা হয় বিরাট দিঘি।

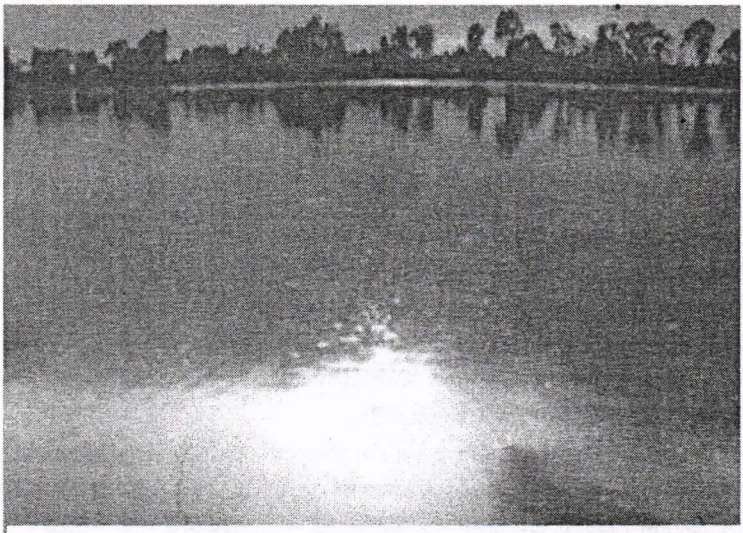

নীল সাগর

কালক্রমে বিরাট দিঘির নাম পরিবর্তিত হয়ে বিরান দিঘিতে পরিণত হয়। এরপর ক্রমে বিরান দিঘি বিরনা দিঘি বা বিন্না দিঘি নামে রূপান্তরিত হয়। অনেকের মতে, বর্তমান বিন্না দিঘির দক্ষিণ পাশে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট পুকুর ছিলো। কিন্তু উক্ত পুকুরের জল সুপেয় না হওয়ায় সেই পুকুরের জল দিয়ে পাণ্ডবদের পূজা-অর্চনা বা তর্পণের ব্যাঘাত ঘটায় রাজা বিরাট উত্তর দিকে পূর্ববর্তী পুকুরের তুলনায় একটি বিশালাকৃতির পুকুর খনন করেন।

পুকুরের পূর্ব পাড়ে একটি মন্দির ও পশ্চিম পাড়ে মুসলমান দরবেশের আস্তানা রয়েছে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার সময় বারুণী স্নান উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। এই দিঘির পানি খুবই স্বচ্ছ ও নির্মল। পুকুরের পানিতে কোনো প্রকার জলজ

www.pathagar.com

উদ্ভিদ বা আবর্জনা নেই। পুকুরের তলদেশে মধ্যবর্তী স্থানে একটি ছোট মন্দির আছে। এই দিঘির পানিতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন গাভীর প্রথম দুধ তর্পণ করতো। কিছুক্ষণের মধ্যে তর্পণকৃত দুধ চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে দিঘির মধ্যস্থলে চলে যেতো। এই সংস্কার হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। সবাই মনে করতো যে, গাভীর প্রথম দুধ এই দিঘিতে তর্পণ করলে গাভীর দুধ বৃদ্ধি পাবে। এই দিঘির আয়তন ৫৪ একর। এর মধ্যে ২০ একর জুড়ে পুকুরের উঁচু পাড় বিদ্যমান।

১৯৭৯ সালে তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক আব্দুল জব্বার এই ঐতিহাসিক দিঘিটিকে একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এর আনুষঙ্গিক সংস্কারের পাশাপাশি নীলফামারী নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন নামকরণ করেন নীল সাগর।

**কুন্দ পুকুর :** বর্তমানে নীলফামারী শহরের তিন মাইল পশ্চিমে কুন্দপুকুর নামে একটি বিশালাকৃতির পুকুর রয়েছে। এই পুকুরের আয়তন প্রায় ২০ একর। এই পুকুরটি কে বা কারা খনন করেছেন সে সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি আছে যে, এখানে কুন্দ নামক জনৈক সামন্ত রাজার রাজবাড়ি ছিলো। সম্ভবত স্থানীয় কুন্দ রাজাই এই পুকুরটি খনন করেছেন। স্থানীয়ভাবে জানা যায় যে, পুকুরের পশ্চিম পাড় সংলগ্ন স্থানে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজবাড়ি ও কাছারি বাড়ির চিহ্ন রয়েছে। স্থানীয় লোকজন ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করে রাজবাড়ির জায়গাটিকে আবাদি জমিতে পরিণত করেছে। কিংবদন্তি সূত্রে জানা যায় যে, নিঃসন্তান সামন্তরাজ কুন্দ রাজপুরোহিতের পরামর্শক্রমে পুকুরটি খনন করেন। কিন্তু পুকুরের খনন কাজ শেষ হওয়ার পরও পুকুরে পানি না ওঠায় রাজা তার গৃহ দেবতার স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুকুরের মধ্যবর্তী স্থানে পূজামণ্ডপ নির্মাণ করে পূজা দিতে যাওয়ার সময় জনৈক কামেল পির তাকে পুকুরে পূজা না করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। এতে রাজা ক্রোধান্বিত হয়ে পির সাহেবের গর্দান কাটার নির্দেশ দেন। এরপর পির সাহেবের কেরামতিতে পুকুরটি আকস্মিকভাবে পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ফলে রাজা তার পারিষদবর্গসহ পুকুরের পানিতে ডুবে মারা যান।

**রসুল পিরের মাজার :** দারোয়ানীর পাশে সর্বমঙ্গলা নদীর তীরে জনৈক রসুল পিরের মাজার অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এটি রসুলের দরগা নামে পরিচিত। কিংবদন্তি সূত্রে জানা যায় যে, হজরত মুহম্মদ (সা.) একদা তায়েফ অঞ্চল থেকে ফেরার পথে আরবের ধূসর মরুভূমিতে নামাজ আদায় করেন। রাসুল (সা.) যে সমতল পাথরের উপর দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেছিলেন সে পাথরে তাঁর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে। রাসুল (সা.) এর পদচিহ্ন অঙ্কিত পাথরের খণ্ডটি সাথে নিয়ে গাদলু গাজি ওরফে গাদলু কাজী নামক জনৈক বুজর্গ ব্যক্তি ইসলাম প্রচারের কাজে বের হন। মসজিদের স্থানে পূর্বে একটি শিব মন্দির ছিলো। আশপাশের শিব ভক্তরা প্রতি বৃহস্পতিবার দেবতার ভোগের জন্য দুধ নিয়ে আসত। গাদলু গাজী আকস্মিকভাবে মন্দিরের সামনে উপস্থিত হয়ে মন্দিরের সেবাইতের কাছে নামাজ আদায় করার জন্য একটু জায়গা চান। কিন্তু মন্দির প্রাঙ্গণে মুসলিম পিরের আস্তানা গড়ার প্রস্তাবে সেবাইত সাড়া দেননি। ফলে গাদলু গাজীর কেরামতিতে পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদি পশুর মহামারি দেখা দেয়। এরপর দুধের অভাবে পূজায় বিঘ্ন ঘটে। অতঃপর মন্দিরের সেবাইত হরিপদ ঠাকুর

www.pathagar.com

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। এই মাজারের পাশে পূর্ববর্তী মন্দিরের স্থানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। হরিপদ ঠাকুর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর মন্দিরটির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে সেটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। এই মসজিদের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে গাদলু গাজীর কবর রয়েছে।

**ময়নামতি :** ময়নামতি বা ময়নাবতি ছিলেন তিলক চন্দ্র রাজার কন্যা। ষোলো বঙ্গের বিলাসী রাজা ছিলেন মানিক চন্দ্র। ত্রিপুরা রাজ্যের মেহেরকুল ছিলো তার রাজধানী। তিনি পরিণত বয়সে ময়নামতিকে বিয়ে করেন। ময়নামতির জন্মস্থানও মেহেরকুল। ময়নামতির বাল্যনাম শিশুমতি। শৈশবে তিনি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য জালন্ধরী পা'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জালন্ধরী পা'র অপর নাম হাড়িপা, সংক্ষেপে হাড়িসিদ্ধা। তিনি জাতিতে ডোম ছিলেন, না পেশাগতভাবে ডোমের কাজ করতেন, তা সঠিক জানা যায় না। মানিক চন্দ্র বৃদ্ধ বয়সে একাধিক বিয়ে করেন এবং ময়নামতিকে ফেরুষা নামক স্থানে নির্বাসনে প্রেরণ করেন। সেখানে যোগসাধনায় কাল কাটাতে থাকেন। মানিক চন্দ্রের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে নিঃসন্তান ময়নামতি রাজধানীতে ফিরে আসেন। মানিক চন্দ্রের মৃত্যুর পর শিবের বরে ময়নামতি পুত্র সন্তান লাভ করেন। ময়নামতির পুত্রের নাম ছিলো গোপীচন্দ্র। গোপীচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলে হরিশ চন্দ্র রাজার কন্যা অদুনার সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর গোপীচন্দ্র তার শ্যালিকা পদুনাকে যৌতুক হিসেবে লাভ করেন। হাড়িপার সাথে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ময়নামতি গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করলে গোপীচন্দ্র তা অস্বীকার করেন। ফলে মাতা পুত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়।

রাজমাতার চরিত্রে কালিমা লেপন করার চেষ্টা করলে ময়নামতি যোগবলে তা মিথ্যা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। এরপর ময়নামতি গোপীচন্দ্রকে হাড়িসিদ্ধার সাথে বারো বছরের জন্য বনবাসে যেতে বাধ্য করেন। পথে হিরা নাবী গণিকার কূটজালে পড়ে বনবাসে গিয়ে গোপীচন্দ্রকে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর গোপীচন্দ্র রাজধানীতে ফিরে এসে দু'রানিও প্রজাদের সাথে মিলিত হন। ময়নামতির এই ঐতিহাসিক কাহিনি পরবর্তীকালে কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত হয়। সেই কিংবদন্তিকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে 'ময়নামতির পালা'। এই পালার প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রোতা জলঢাকা পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ নূরুজ্জামান স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেন :

যা ভাই খেতুয়া তুই
মা বুড়ি ময়নার কাছে
ধাঁ ধা করিয়া নিয়া আয় তুই
আমার কাছে।

**বাবুর হাট :** ডিমলা উপজেলার একটি জায়গার নাম বাবুর হাট। জনশ্রুতি আছে যে, বাবুর হাটে কামিনীকান্ত রায় নামক একজন জমিদার ছিলেন। তার দুই পুত্র সন্তানের নাম হেরেম্ব বাবু ও দিলীপ বাবু। কামিনী কান্ত রায় ছিলেন উদার প্রকৃতির লোক।

www.pathagar.com

তিনি তার জমিদারি এলাকায় অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। এজন্য পরবর্তী কালে ঐ এলাকার নামকরণ করা হয় বাবুর হাট।

## গ. লোকপুরাণ

পৌরাণিক কাহিনির সাথে লোককাহিনির সংমিশ্রণে প্রচলিত কাহিনিই লোকপুরাণ। এরকম কয়েকটি পৌরাণিক কাহিনি নীলফামারীর গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। উল্লেখযোগ্য একটি কাহিনির পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

**পাথাইবাড়ির ডাঙ্গা :** মীরগঞ্জ হাটের পাশে অবস্থিত পাথাইবাড়ির ডাঙ্গা। পাথাইবাড়ির ডাঙ্গা নামে পরিচিত এলাকায় কোনো আবাদ হয় না। এটি পতিত জমি হিসেবে পড়ে আছে। এই পতিত জমিতে শুধুমাত্র 'বিশল্যকরণী' নামক গাছ জন্মে। এই ডাঙ্গার আশপাশের এলাকায় হিন্দু বসতি থাকায় তারা পৌরাণিক কাহিনি স্মরণ করে তা সংরক্ষণ করে আসছেন। প্রচলিত লোক কাহিনিতে বলা হয়েছে লক্ষ্মণকে সুস্থ করে তোলার জন্য হনুমান 'ঔষধি পর্বত' নিয়ে আসার সময় সেই পর্বত থেকে 'বিশল্যকরণী'র একটি গাছ পাথাইডাঙ্গায় পড়ে যায়। রামায়ণে উল্লিখিত 'বিশল্যকরণী' গাছ এখনো পাথাইডাঙ্গায় জন্মে বলে এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা বিশ্বাস করে থাকেন। হনুমান পর্বত নিয়ে ফিরে আসার সময় সূর্য উদিত হতে যাচ্ছে দেখে সে সূর্যের সাথে মিতালি করে। লোক কাহিনিতে বলা হয়েছে হনুমান সূর্যকে তাদের দুজনের নামের সাথে মিল আছে একথা বলে সূর্যের সাথে মিতালি করতে চায়।

আমি হনু, তুমি ভানু
এসো দুজনে মিতালি করি।

একথা বলার পর হনুমান সূর্যকে তার হাতের বগলে চেপে ধরে। উদ্দেশ্য যাতে হনুমান তার গন্তব্যে পৌছানোর পূর্বে আকাশে উদিত হতে না পারে। কারণ সে পৌছানোর পূর্বে সূর্য উদিত হলে লক্ষ্মণকে সুস্থ করে তোলা যাবে না। এই পৌরাণিক কাহিনির সাথে রামায়ণে উল্লিখিত কাহিনির সাদৃশ্য লক্ষ্যমান। যেমন :

বাল্মীকি রামায়ণে উল্লিখিত রাম রাবণের যুদ্ধে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' (সর্গ ৯৯-১০১) সর্গে রাবণ লক্ষ্মণকে উদ্দেশ্য করে 'ময়দানব নির্মিত অষ্টঘণ্টা যুক্ত শত্রুশোণিতপায়ী অস্ত্র' নিক্ষেপ করেন। লক্ষ্মণ সেই অস্ত্রের আঘাতে ভূতলে পড়ে যান। লক্ষ্মণকে ভূতলে পড়ে যেতে দেখে তাকে মৃত ভেবে রাম প্রথমে বিলাপ করলেও পরে লক্ষ্মণ জীবিত আছেন কি না তা নিশ্চিত হওয়ার পর সুষেণের পরামর্শক্রমে হনুমানকে একটি ঔষধি পর্বতে পাঠান। এই পর্বতে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানী এই চার প্রকার ঔষধি গাছ জন্মাত। এজন্য 'ওঝা ধন্বন্তরী'র নির্দেশিত পূর্বে উল্লিখিত চার প্রকার ঔষধি গাছ নিয়ে আসার জন্য পবনপুত্র বীরহনুমান মহাবেগে ঔষধি পর্বতের দিকে ধাবিত হলেন। ঔষধি পর্বতে পৌছানোর পর হনুমান ওঝার নির্দেশিত ঔষধি গাছ খুঁজে পেতে বিলম্ব হতে পারে এই আশঙ্কা করে সম্পূর্ণ পর্বতটিকে ডান হাতে তুলে নিয়ে আসার পথে দেখতে পান সূর্য উদিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু সূর্য উদিত হওয়ার আগে ঔষধি গাছ নিয়ে আসতে না পারলে লক্ষ্মণকে সুস্থ করে তোলা

www.pathagar.com

সম্ভব হবে না। তাই হনুমান সূর্যকে বাম হাত দিয়ে ধরে বগলদাবা করে 'ঔষধি পর্বত' নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণের কাছে পর্বতসহ উপস্থিত হওয়ায় লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

## ঘ. লোকছড়া

লোকছড়া নীলফামারী অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং নন্দিত শাখা। এখানকার লোকমানসের আবেগ-অনুভূতিজাত হৃদয় থেকে এ অঞ্চলের ছড়াগুলো উৎসারিত হয়েছে। এ অঞ্চলে প্রচলিত ছড়াগুলোর মধ্যে ছেলে-ভুলানো ছড়া, খেলাধুলা বিষয়ক ছড়াই প্রধান। এছাড়া ছোট, ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করতে গিয়ে একে অপরকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতে গিয়েও ছড়া কেটে থাকে। নিচে নীলফামারী অঞ্চলে প্রচলিত কিছু লোকছড়া তুলে ধরা হলো :

১.

মাসি খুশি বন পাটাশি বনোত পইলো টিয়া
হাট মাসি তোক থুবার যাং, চেংরা ভাতার দিয়া।

২.

একিনা একটা ডালিম
খাইস কি? বিচি
ফেলাইস কি? চোচা
তিন বাড়ি পোকা।

৩.

ওত্তি একটা টিনের বাড়ি
গড়গড়াইতে গড়গড়াইতে যায়
নাড়িয়া বাবু বুট ভাজা খায়
মুশিয়ার বাবু গু ভাজা খায়।

৪.

নাড়িয়া বাবু কলা খাবু
কলার পাইসা কদ্দিন দিবু।
আজ দিমো কাল দিমো
পুরুত করি হাগি দেইম।

৫.

কুসুর মুসুর দারগা দুসুর
তিন তালিয়া মার আলিয়া, কুমড়ার চাক
হাতের কড়ি হাততে থাক।

www.pathagar.com

৬.
অকদুল বকদুল কম্পুল ফোটে
কম্পুলের রাজা দুলদুল করে
কাঁপাকাঁপি নিমের ঢ্যাক
ওনেয়া পকি বোনেয়া ব্যাক।
স্যাক সেন্দুর তুলা।
৭.
ইতল পিতল ধরতে পিতল ধরে না
কাঁঠাল খোয়া বনে না।
ইস বিশ ধানের শিস
কাউয়া ডোগা উনিশ বিশ।
৮.
ইকরি বিকরি চাম চিকরি
চামত পইলো মাছি
কোদাল দিয়া চেচি,
কোদাল হইলো ভোতরা
টাটক মাছের ধোতরা।
৯.
উপরান্টি বাসকো
নাইন টেন টেসকো
চুরি আনা বিবি আনা
আজ বাড়ি গেলাম
পান সুপারি খেলাম
পানের আগাল মিনিমিনি।
১০.
টিকটাক পাটাশাক
পিড়ার তলোত ছোড়ানি
মোর মাইয়াটা দোয়ানি।
১১.
দুই পাশে দুই কলার গাছ
দুই বাদুড়ে খায়
ছোট মামার হরিণ কোনা
চোরে নিয়া যায়।

www.pathagar.com

১২.
অবু টিপটাপ লিচুর বাগানে
একটা লিচু পড়ে গেলো চায়ের দোকানে।
ও চা ওয়ালা ও চা ওয়ালা দোকান খোল না
ইষ্টি মেরে বৈ আনবে দেখতে চলো না।
১৩.
ইচিং বিচিং ছিচিং চা
প্রজাপতি উড়ে যা।
ইস্টিশনের মিষ্টি ফুল
আম, জাম, গোলাপ ফুল।
১৪.
আমার দুলাভাই ধনী
টাকা দেয় গনি।
আমার দুলাভাই নুচুরা
টাকা দেয় খুচুরা।
হাতও বান্দিয়া, হাতও খুলিয়া।
পাও বান্দিয়া, পাও খুলিয়া।
মুখও বান্দিয়া, মুখও খুলিয়া
চোখও বান্দিয়া, চোখও খুলিয়া।
১৫.
একুশে আইসো, বাইশে বইসো, তেইশে তেলিপাটি
চব্বিশে লাখ, পঁচিশে ঝাঁক।
১৬.
ছিরি ভাই দিল্লি যাবো, দিল্লিত বাসা
ছয়ে রেক্ক, সাতে সালুক, আটে ভালুক
নয়ে নয় লিক্কা, দশে পিপীলিকা
এগারো এক রুলি, বারোয় বিয়ার কুলি।
তেরোয় তেছি রিকাটা, চোদ্দই রূপার বেটা,
পনেরোই পান খায়, ষোলোয় গান গায়।
সতেরোই শতক ধান, আঠারোয় এটে আয়
উনিশে উম উম, বিশে ঝুম ঝুম।

www.pathagar.com

১৭.
ছাই কুড়াতে গেছিলাম
মালা কুড়ে পাছিলাম
মালার তলোত লেখা
গুটু গুটু খেলা
রেশমা, রেশমা, রেশমা।

১৮.
হাঁড়িত থুঁনু পাকা কলা
বউ বেড়াইছে দুপুর বেলা।
ও বউ তুই বেড়াইস না
বটের তলোত যাইস না।
বটের আটা পড়বে
বিয়ার স্বামী মরবে।
মাটি দিবে কোনো খানে
বট গাছের নিচে
বট গাছের পাতা নাই
ডেসকো মাগির ভাতার নাই।

১৯.
টিকটাক পাটাশাক
পিড়ার তলোত ছোড়ানি
মোর মাইয়াটা দোয়ানি।

২০.
ইচিং বিচিং ছিচিং চা
প্রজাপতি উড়ে যা।
ইস্টিশনের মিষ্টি ফুল
আম, জাম, গোলাপ ফুল।

২১.
ইচন বিচন ধাপড়ি বিচন
ঢাল কাউয়াটা নড়েছে
আয় সবি হাট যাই
দুধ দিয়া মাখি ভাত খাই।

www.pathagar.com

২২.

ফুললোন ফুললোন ফুললোন
এক্কে দুললোন, তিনলোন।
ঝামন ঝামন ঝামন, এক্কে দোঝামন।
সুরুসাম সুরুসাম, এক্কে দুসুরুসাম।
বকুল বকুল বকুল, কদম কদম কদম
মুকপেতা মুকপেতা মুকপেতা
ওহারি বদলি তোক্কা, চিরিপঞ্চ পাক্কা
মেঘের কোলে ঢাক্কা।
ছয়ে রেক্কা, সাতে সালাম নাশি
আটে বান্দা গুটি, নয়ে ঘোড়া
দশে দিলাম চোরা।
এগারো-এ একরুলি, বারো-এ খেল বুড়ি।
তেরো-এ কাচরিকাটা, চোদ্দয় উপরবাটা।
পনেরো-য় পান খায়, ষোলোয় গান গায়।
সতেরোয় সতেরো ধান, আঠারোয় কেটে আন।
উনিশে উনকা, বিশে ঝুমকা।
একুশে আইসো, বাইশে বইসো।
তেইশে তেলের বাটি
চব্বিশে লাখ, পঁচিশে ঝাক।

২৩.

নাড়িয়া মাতা হাত্তিম টিম
বোগরের গাছোত টাঙ্গি থুইম।
বোগর হইবে ঝোপা ঝোপা
নাড়িয়া মাথাত টোকা টোকা।

২৪.

গোল গোল পেয়ারা
মেয়েদের কি চেহারা
রাস্তার পাশে বাড়ি
সাইকেল মারি চলে যাব বাড়ি।
সাইকেল হলো নষ্ট
বাড়ি যেতে কষ্ট।

www.pathagar.com

২৫.
ছি রে হরিয়া
বাঘ মারে ধরিয়া।
বাঘের রক্ত
মহিষের শিং
নাচে বগিলা হিটিংটিং। [হাজারী হাট]
২৬.
এল গাঠিয়া ব্যাল গাঠিয়া
ব্যালের তলোত কেরে।
মুই তোর মামা শ্বশুর
মাথাত কাপড় দে রে।
২৭.
ওত্তি একটা কলার গাছ
কলা ধরে সাতটা
মুই খাং আটটা
আন তো মাই ব্যাগটা
দশ ঝোনকাক ভাই করি।
কাউয়ার ভাই কে রে
কাপড় কাচি দে রে।
পালকির উপর পাকা ধান
বিলকিসের স্বামী মুসলমান।
২৮.
ও মিলো বিলো চলো আপেল গারি
সাইকোল মারি, সাইকেলওয়ালা সাত ভাই
এক ভাই এগিয়ে, দাদু গেলো বেরিয়ে
ভাইয়াকে বলো না চিড়িয়াখানায় চলো না।
চিড়িয়াখানায় হাতি নাই
তোমার আমার খেলার সাথী নাই।
২৯.
আতা পাতা হা হা
কাক ডাকে কা কা
আম মিম ষাড়ের ডিম
অমাবস্যা ঘোড়ার ডিম।

www.pathagar.com

৩০.
গুয়া বাড়ি খান গেনু
ময়না পাকিটাক খেদানু
ময়না পাখিটার নাম কি?
রসি রসি
পিড়া আন তো বসি।
কলসি আনো তো পানি খাং
টুকনি আনো তো বাড়ি যাং।
৩১.
দোলা বাড়ির ইট্টা, ভাগা পিঠ্ঠা।
৩২.
চি বারী খেলাঁনু
তবলা বাজাঁনু
তবলার তলে
মোমবাতি জ্বলে।
৩৩.
দোফরকি আন্দন
ছাওয়ার কাঁন্দন।
৩৪.
হাঁড়িত আছে টোংড়া
মুই তোর সোংড়া।
৩৫.
দেইসতো ভাবি নোড়াটা
ঝালেয়া আইসো পাড়াটা।
৩৬.
কলার গাছোত্ আয়না
মাইয়া পোষা যায় না।
৩৭.
কাসার থালি চিকচিক করে
কায় মোক্ ধইততে পারে।
৩৮.
আমি যাবো আকাশে
জল খাবো বাতাসে।

www.pathagar.com

৩৯.
খুটার ওফর চাইলোন
গ্যালগেলা হাইলোন।
৪০.
তরোয়াল কাপ্পে
পুঁঠি মাছ ঝাপ্পে।
৪১.
খুটার ওফর ছাব্বা
মুই তোর আব্বা।
৪২.
চুলার পারোত ঘষি
মুই তোর মসি।
৪৩.
কিৎ কিৎ মালা, কিৎ কিৎ দই
ও দইআলা তোর বাড়ি কই।
৪৪.
আমসু আমসু চিনিয়া বাদামসু
চিনিয়া মে পয়েসা
লাল বাগায়চা।
৪৫.
ইলশা মাছের পেটি
গোলামের ব্যাটি।
৪৬.
খুটার তলত আলু
মুই তোর খালু।
৪৭.
টিয়া পাখিটা কাঁঠল খায়
মোখো এনা না দেয়।
আজার বেটির বিয়াও হয়
লম্বা লম্বা ধুতি পায়।
ধুতির উপর সইস্যার ফুল
খালার বাড়ি বহু দূর।

www.pathagar.com

খালা গো খালা
বালটি নিবু, না কলসি নিবু
কলসির উপর ঢোড়া সাপ
ফিকরি ওঠে কইন্যার বাপ।
কইন্যার বাপের নাম কি?
পানি তোলা বালটি
ধাপ্পু দিয়া চলঝাট্টি।

৪৮.
হাইস্কিম ক্লাস ফোর
আপলা ধানের বাপলা ফোটে
ধনীর ধান চটকি ওঠে।
এক তারিয়া বল্টু
ডবেল ডবেল টু বল্টু।
এক বাঁশ পানি
ভো ভো রানি।
বাঁশের ডুম আনতে গেলাম।

৪৯.
টিকটাক পাটাশাক
পিড়ার তলোত ছোড়ানি
মোর মাইয়াটা দোয়ানি।

৫০.
দুই পাশে দুই কলার গাছ
দুই বাদুড়ে খায়
ছোট মামার হরিণ কোনা
চোরে নিয়া যায়।

৫১.
অবু টিপটাপ লিচুর বাগানে
একটা লিচু পড়ে গেলো চায়ের দোকানে।
ও চা ওয়ালা ও চা ওয়ালা দোকান খোল না
ইস্টি মেরে বৈ আনবে দেখতে চলো না।

৫২.
ইচিং বিচিং ছিচিং চা
প্রজাপতি উড়ে যা।

www.pathagar.com

ইস্টিশনের মিষ্টি ফুল
আম, জাম, গোলাপ ফুল।

৫৩.
একিনা ছোয়া ভালো
খড়ি কুড়াইতে গেলো
খড়ির তলত মাকলা বাঁশ
একিনা ছোয়া ম্যাট্রিক পাশ।

৫৪.
চিকা করে চিকচিক
মাটি কাটে ঢিকঢিক
আনতো বাপই দাও খান
চিকার কাটোং পাও খান।

৫৫.
কেচ নাই মামলা নাই
ফাকত খাটিল হাজত
কাহও চড়িলো অটো ভটভটিত
কাহও চড়িল বাসত।

৫৬.
আজকালকার লোকের ফুটানি বেশি
ধনী-গরিব, রিকশাওয়ালা, মাস্টার সবাই পেন্দে ছুট।
একি সময়ের মধ্যে চারটা বাজার হয় লুট।

৫৭.
নয়া হালুয়া বাচ্চাউ
বাগা আব্দুল বুড়ারটে
নাগে নেইল তালের ইশ
আর বাড়ি যেয়া জমিলার ব্যাটা
খাইল এক বোতল বিষ।

৫৮.
চায়না ধান কাটি, মানুষ সথে বান্ধে আঁটি
চেতনের ব্যাটা নয়া গুণ্ডা, দুলালের মাইয়া দিলে পোতা কাটি।

৫৯.
এমন জায়গায় বাড়ি করলো কালটা সৈয়দ
রাত দিন কামাল চার সথে

www.pathagar.com

ক্যালেংকার কাজিয়া যাবার না পায় ঘাটা
আর মেইল চলাইতে জবানের ব্যাটার
পোতা গেলো কাটা।

৬০.

কুসুর মুসুর দারগা দুসুর
তিন তালিয়া মার আলিয়া, কুমড়ার চাক
হাতের কড়ি হাততে থাক।

৬১.

চিকা করে চিকচিক
এ্যান্দুর কাটে ধান
চিকার পুন্দিত জোক সোন্দাইছে
ডাক্তার ডাকে আন।

৬২.

অকদুল বকদুল কম্পুল ফোটে
কম্পুলের রাজা দুলদুল করে
কাঁপাকাঁপি নিমের ঢ্যাক
ওনেয়া পকি বোনেয়া ব্যাক।
স্যাক সেন্দুর তুলা।

৬৩.

আয় আয় ওরে হাঁস তৈ তৈ তৈ
মোলা দেব মুড়ি দেব আরও দেবো খই।
ও তুই পাখনা মেলে, কাছে আয় না চলে
তোর সঙ্গে প্রাণ খুলে, দুটি কথা কই।

৬৪.

ছোট্ট পাখি টুনটুন
গান গেয়ে যাই গুনগুন।
মেলে তার দুটি ডানা
ছোট্ট পাখি টুনটুন।
বকুল ফুলের সাথে
মিতালি সে করে
মেলে তার দুটি ডানা
ছোট্ট পাখি টুনটুন।

www.pathagar.com

বিশাল আকাশ পানে
প্রাণের প্রদীপ জ্বলে
মেলে তার দুটি ডানা
ছোট্ট পাখি টুনটুন।

৬৫.

চড়ুই পাখির কিচিরমিচির
ঝিঁঝি পোকার বিয়ে
পেঁচা বলে চেচাসনে আর
গান শোনাবে টিয়ে।
ময়না বলে গয়না কই
শালিক বলে আয়না সই
শিয়াল ভাইয়া পাগড়ি পড়ে
পালকি এলো নিয়ে।

৬৬.

ঐ দেখ এক বনের ময়ূর কেমন সেজেছে
ঝুমুর ঝুমুর নূপুর সে তার পায়ে বেঁধেছে।
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ময়ূর পেখম মেলেছে
ঝুমুর ঝুমুর নূপুর সে তার পায়ে বেঁধেছে।
ঐ দেখ এক বনের ময়ূর কেমন সেজেছে
ঝুমুর ঝুমুর নূপুর সে তার পায়ে বেঁধেছে।
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ময়ূর মান করেছে
ঝুমুর ঝুমুর নূপুর সে তার পায়ে বেঁধেছে।

৬৭.

আঁকতে পারি প্রজাপতি, আঁকতে পারি চিল
মেঘের ডানা ছাগল ছানা, শাপলা ভরা বিল
শিশিরভরা শিউলি বকুল, দিঘির কালো জল।
নদীর ধারে বকের সারি, আষাঢ় মাসের ঢল।

৬৮.

বাক বাকুম পায়রা ডাকে উঠান বাড়িতে
লাল পুতুলের বিয়ে দেবো হলুদ শাড়িতে।
ধুলা বালি কাদা মাটি মেখে আনন্দে
লাল পুতুলের বিয়ে দেবো হলুদ শাড়িতে।
পুঁতির মালা পরিয়ে দেবো তারি গলেতে

www.pathagar.com

মনের মতো সাজিয়ে দেবো জড়ির ফিতাতে
লাল পুতুলের বিয়ে দেবো হলুদ শাড়িতে।
বউ সাজবে কাল কি চড়বে সোনার পালকি
আনন্দে সে চলে যাবে শখের মেলাতে
লাল পুতুলের বিয়ে দেবো হলুদ শাড়িতে।

৬৯.

দোল দোল দোল
কিসের এতো গোল
খোকা যাবে বিয়ে করতে
সঙ্গে ছয়'শ ঢোল।

৭০.

টিয়ে পাখি আয়না
খুকু ধরে বায়না।
একটি টিয়ে আসবে
খুকু ভালোবাসবে।

৭১.

কাউয়া রে কা কা, আম ফেলে দে পাকা
আমের তলে পোকা, ধর শালির খোপা
খোপা কেনে ঢিল, শালিক ধরি কিল।

৭২.

বিথি নাচে কোন্ খানে,
শত দলের মাঝখানে
সেখানে বিথি কি করে
চুল ঝাড়ে ফুল পাড়ে
ডুব দিয়া সে মাছ ধরে।

৭৩.

পাদু গেইচে পাত কাটিবার
ব্যাঙে দিচে ঢোলাই
আইসো রই চেংরি গিলা
পাদুক ধরি কিলাই।

৭৪.

নাড়িয়া মাতা হাট্টিম টিম
বোগরের গাছোত টাঙ্গি থুইম।

www.pathagar.com

বোগর হইবে ঝোপা ঝোপা
নাড়িয়া মাথাত টোকা টোকা।
৭৫.
আইসো গো চেংরি কুনা
কালাই খাবার যাই।
না খাং মুই কাচা কালাই
প্যাট বিষাইবে আইতত করি
হাগির যাইম মাও গাইলাইবে।
৭৬.
আমার নাম লাকি
সবার তকাই চাকি
লবণের দাম বারো টাকা
লাকির সাথে ভালোবাসা।
৭৭.
জিটি রে জিটি
ঠোকঠোকালু কোটে
আটিয়া কলার থোপে।
আটিয়া কলা ফাটিয়া যায়
জিটির মাইয়ার ছোয়া হয়।
ছোয়া দুকুনার নাম কি?
আপাল আর গোপাল
হায় রে মোর কপাল।
৭৮.
ট্যাপ ট্যাপ ট্যাপারু
কয়টা আম পাড়ালু
এক'শ একটা
কোটে থুয়া খালু
ভাঙ্গা ডুলির মাঝে।
প্যাট ক্যানে তোর বাজে
মাইয়া ছোয়ায় ভাত না দে
বন্যার নল ধীরে ধীরে চল।
৭৯.
টুনটুনি পাখি নাচ তো দেখি
না বাবা নাচবো না


www.pathagar.com

পড়ে গেলে বাঁচব না।
বড় আপুর বিয়ে
কসকো সাবান দিয়ে।
কসকো সাবান ভালো না
বড় আপুর বিয়ে হবে না।

৮০.
ওত্তি একটা কলার গাছ
কলা ধরে সাতটা
মুই খাং আটটা
আন তো মাই ব্যাগটা
দশ ঝোনকাক ভাই করি।
কাউয়ার ভাই কে রে
কাপড় কাচি দে রে।
পালকির উপর পাকা ধান
বিলকিসের স্বামী মুসলমান।

৮১.
ও মিলো বিলো চলো আপেল গারি
সাইকোল মারি, সাইকেলওয়ালা সাত ভাই
এক ভাই এগিয়ে, দাদু গেলো বেরিয়ে
ভাইয়াকে বলো না চিড়িয়াখানায় চলো না।
চিড়িয়াখানায় হাতি নাই
তোমার আমার খেলার সাথী নাই।

৮২.
আতা পাতা হা হা
কাক ডাকে কা কা
আম মিম ষাড়ের ডিম
অমাবস্যা ঘোড়ার ডিম।

৮৩.
উপর থেকে নেমে এল ছোট একটি পেন
সেই পেনে বসেছিল লাল টুকটুক ম্যান।
ম্যানকে আমি জিজ্ঞাস করলাম
হোয়াট ইজ ইউর নেম?
ম্যান আমাকে উত্তর দিল
মাই নেম ইজ সাকিলা খান।

www.pathagar.com

৮৪.
গুয়া বাড়ি খান গেনু
ময়না পাখিটাক খেদানু
ময়না পাখিটার নাম কি?
রসি রসি
পিড়া আন তো বসি।
কলসি আনো তো পানি খাং
টুকনি আনো তো বাড়ি যাং।
৮৫.
গোল গোল আলু
চ্যাপটা চ্যাপটা কালাই
তোর মতো চেংরা
মোর দরকার নাই।
৮৬.
মিষ্টি রে মিষ্টি তোর বেলে বিয়ে
কে বললো? কে বললো? ওই বাড়ির টিয়ে
মরার টিয়ে মরে না, হলুদ বাটা হয় না
হলুদ হবে বাসি।
গাও ধুইস কোটে? বিরিজের উপরে
চুল শুকাইস কোটে? চিকন ডালে।
বুড়া দাদা মোর বসতে চায়
বুড়া দাদা মোর আলতা চায়।
৮৭.
লাল টিসটিস পাকা মরিচ
কাইল সকালে দেখা করিস।
একটা টাকায় দুইটা পান
ভাবি তোর কয়টা নাং।
৮৮.
হাইস্কিম ক্লাস ফোর
আপলা ধানের বাপলা ফোটে
ধনীর ধান চটকি ওঠে।
এক তারিয়া বল্টু
ডবেল ডবেল টু বল্টু।
এক বাঁশ পানি
ভো ভো রানি।
বাঁশের ডুম আনতে গেলাম।

www.pathagar.com

৮৯.
স্বর্ণলতা বাঁশের পাতা
বাঁশ ঝুমঝুম করে
জমিদারের ঘোড়া
এক পাং তার খোড়া
দুই পাং তার লম্বা।

৯০.
আমরা দুজন মিস্ত্রি টিনের কাজ করি
ভাত না পাইলে রাগ করি।
এক ঝোনকার বাড়ি গেছিলাম
ডাইল ভাত খাছিলাম।
ডাইল হইলো ঘনো
আমার নাম মনো।
আলু ভাজি চটচটি
ডিম ভাজি পটপটি।

৯১.
আম আম আম কাঁচা মিটা আম
বাজারে বিক্রি করলাম, পাঁচ'শ টাকা দাম।

৯২.
পানি পড়ে ঝিরিঝিরি
আঙিনা ভিজালি, বউ দুলালি।
এক থাকি বার, টেবিল ঝাড়
টেবিলের উপর চাবি, বিজলি আমার ভাবি।
বিজলি ভাত আন্দে প্যাচকা তকাই দেয় কম
বিজলি ঝগড়া করির জম।

৯৩.
মেন্দি ছিড়িবার গেছিলাম
ডাল ভাঙিয়া পড়ছিলাম।
আলে তোর গালে কি?
লাল লাল সুপারি।
ভাত আন্দিবে কে রে? মৈরম খালা
ভাত খাবে কে রে? দুলাভাই শালা

www.pathagar.com

আমার দুলাভাই ধনী, টাকা দেয় গনি
আমার দুলাভাই নুচুরা, টাকা দেয় খুচুরা
আচমা আচমা আচমা, মাগো মা।
৯৪.
ঝরনার পানি ওমরসানি
ঢাকা যাব মানা হবো
মৌসুমীকে বিয়ে করবো
কলেজের পাশে পাখির বাসা.
পাখি বলে টিউ টিউ
মৌসুমী বলে আই লাভ ইউ।
৯৫.
হায়রে মোর হায়
কাউয়া কাঁঠল খায়
বিছি পড়ে ধধ্ধরে
মধুনা দ্যাখা যায়।
৯৬.
নিন্দোবালী নিন যায়
পাখইরের পাত
খুটা কাটা পাখি আইসে
চুপ করিয়া থাক।
৯৭.
ফুলতি মাই ফুলতি মাই
এগিনা ঘর কাঁয় নেপিছে
ফুলতি নেপিছে।
ফুলতির হাতত্ কাদো পানি
ফুল ফুটিছে।
৯৮.
মাও মুই কইলা কাটোঁ কাত
চুয়ার পারের ভাঙা ডোগাটাত
মাও গেইছে হাট, বাপও গেইছে হাট
মাও আনিবে নাড়ুকলা।
সেই খাটোত্ চড়িয়া গেনু

www.pathagar.com

দ্যাগলা গঞ্জের হাট্
দ্যাগলা গঞ্জের চেংড়িগুলা
তাস খেলায়ছে
বাড়ি আসি পাকা বুড়া
মাথা চুলকায়ছে।

৯৯.
একখান কোদালে দুইখান কোদালে
মালি বাঁন্ধেছে
মালিত বসি বালা
নয়ন কাঁন্দেছে।

১০০.
আমবাড়ি, জাম বাড়ি
অদি যা তোর মামার বাড়ি।

১০১.
নসিব হামার ভালো
খড়ি কুড়াইতে গেলো
দুইটা লেছু পাইলো
একটা খাইলো একটা দিলো।

১০২.
সাগাই আইসসে বড় বড়
ধর মুরগা জবো কর।

১০৩.
সাগাই আইসসে হাঁটিয়া
বসির দ্যাও খাটিয়া।

১০৪.
আজার বেটি ছকিনা
তিনদিন হাতে দেখি না।
ভাত খায় না, চাউল খায়
টুপুর টুপুর হাগির যায়।

১০৫.
আলিব বে তে
মা মোক ভাত দে।
মাও গেইছে ঐ পাড়া

www.pathagar.com

ভাত হইছে ঠট্‌ঠোড়া
সেই ভাত খাবো না
স্কুল যাবো না।

১০৬.
স্বরে অ স্বরে আ বগের ঠ্যাং
মাস্টার বাবু ছুটি দেন।
তোমার স্কুলে পড়বো না
ব্যাতের ডাং খাবো না।
বেত গেলো উড়িয়া
মাস্টার বাবু কুড়িয়া।

১০৭.
আই বিনছি লতাপাতা
কালকে যাবো কলিকাতা।
কলিকাতার গাছটা
গুয়া হয় পাঁচটা।
যদি গুয়া লাল হয়
হাজার টাকা দাম হয়।

১০৮.
বখ্‌রি খায় ছিমার পাত্
কাউয়ায় খায় দই
আয়রে আলম দুঃখের কথা কই।

১০৯.
হাটো হোই চ্যাংরি গিলা
কালাই খাবার যাই।
না যাও তোর কালাই খাবার
মাও ডাঙ্গাইবে।
মায়ের ডাং যেমন তেমন
বাপের ডাং কালা।

**তথ্যসহায়ক**

১. অন্তরা, পিতা : দুন্দু দাস, বয়স : ৮ বছর, লেখাপড়া : ২য় শ্রেণি, বোড়াগাড়ি, ডোমার
২. জিবিত কুমার, বয়স : ১০ বছর, লেখাপড়া : চতুর্থ শ্রেণি, বোড়াগাড়ি, ডোমার
৩. শরিফা ইসলাম, পেশা : গৃহিণি, বয়স ২৩, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এস.এস.সি, হরিণচরা ডোমার
৪. জিবিত কুমার, বয়স : ১০ বছর, লেখাপড়া : চতুর্থ শ্রেণি, বোড়াগাড়ি, ডোমার
৫. বিপব, পিতা :, রেশন, বয়স : ১২ বছর, লেখাপড়া : ৭ম শ্রেণি, বোড়াগাড়ি, ডোমার

www.pathagar.com

৬. রাত্রি, পিতা :, দিপু, বয়স : ৭ বছর, লেখাপড়া : ১ম শ্রেণি, বোড়াগাড়ি, ডোমার
৭. অন্তরা, পিতা : দুন্দু দাস, বয়স : ৮ বছর, লেখাপড়া : ২য় শ্রেণি, বোড়াগাড়ি, ডোমার
৮. চন্দনা, পিতা : শ্রী ভোন্দা, বয়স : ১১ বছর, লেখাপড়া : চতুর্থ শ্রেণি, বোড়াগাড়ি, ডোমার
৯. পূর্বোক্ত
১০. সুজন দাস, পিতা : কানু দাস, বয়স : ১৪ বছর, লেখাপড়া : নবম শ্রেণি, বোড়াগাড়ি, ডোমার
১১. জিবিত কুমার, বয়স : ১০ বছর, লেখাপড়া : চতুর্থ শ্রেণি, বোড়াগাড়ি, ডোমার
১২. পূর্বোক্ত
১৩. পূর্বোক্ত
১৪. তথ্যদাতা : মোছাঃ সিমু আক্তার, গ্রাম : নতিব চাপড়া, উপজেলা : সদর
১৫. পূর্বোক্ত
১৬. পূর্বোক্ত
১৭. তানজিনা আক্তার রুজি, গ্রাম : চেরেঙ্গা, উপজেলা : জলঢাকা
১৮. পূর্বোক্ত
১৯. সুজন দাস, পিতা : কানু দাস, বয়স : ১৪ বছর, লেখাপড়া : নবম শ্রেণি, বোড়াগাড়ি, ডোমার
২০. জিবিত কুমার, বয়স : ১০ বছর, লেখাপড়া : চতুর্থ শ্রেণি, বোড়াগাড়ি, ডোমার
২১. ফণিভূষণ, পিতা : ভূইচাদ, বয়স : ৭০ বছর, লেখাপড়া : ৩য় শ্রেণি, ছোটরাউতা, ডোমার
২২. পূর্বোক্ত
২৩. বিপব, পিতা : রেশন, বয়স : ১২ বছর, লেখাপড়া : ৭ম শ্রেণি, বোড়াগাড়ি, ডোমার
২৪. পূর্বোক্ত
২৫. রাত্রি, পিতা :, দিপু, বয়স : ৭ বছর, লেখাপড়া : ১ম শ্রেণি, বোড়াগাড়ি, ডোমার
২৬. ফণিভূষণ, পিতা : ভূইচাদ, বয়স : ৭০ বছর, লেখাপড়া : ৩য় শ্রেণি, ছোটরাউতা, ডোমার
২৭. মোতাহারা বেগম, পিতা :, মোজাম্মেল হক, বয়স : ২৫ বছর, লেখাপড়া : আই.এ, পেশাঃ শিক্ষকতা, রাউতা, ডোমার
২৮. পূর্বোক্ত
২৯. পূর্বোক্ত
৩০. পূর্বোক্ত
৩১. পূর্বোক্ত
৩২. পূর্বোক্ত
৩৩. পূর্বোক্ত
৩৪. পূর্বোক্ত
৩৫. পূর্বোক্ত
৩৬. পূর্বোক্ত
৩৭. শরিফা ইসলাম, পেশা : গৃহিণি, বয়স ২৩, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এস.এস.সি, হরিণচরা ডোমার
৩৮. পূর্বোক্ত

www.pathagar.com

৩৯. পূর্বোক্ত
৪০. পূর্বোক্ত
৪১. পূর্বোক্ত
৪২. মোছাঃ তাজমিনা আক্তার, পিতা : জামিলুর রহমান, বয়স : ১২, লেখাপড়া : চতুর্থ শ্রেণি, কাজির হাট, জোড়াবাড়ি, ডোমার
৪৩. সালমা বেগম, বয়স : ১৪ বছর, পিতা : নিরাশ মামুদ, গ্রাম : কুন্দল, সৈয়দপুর
৪৪. আদুরী বেগম, বয়স : ১২ বছর, পিতা : কাশেম আলী, গ্রাম : কুন্দল, সৈয়দপুর
৪৫. ববিতা, বয়স : ১০ বছর, পিতা : সুব্রত কুমার, বাঙালিপুর সৈয়দপুর
৪৬. তিশা, বয়স : ১০ বছর, পিতা : তপন কুমার, বাঙালিপুর, সৈয়দপুর
৪৭. সুমাইয়া, বয়স : ৮ বছর, পিতা : সাইদুল ইসলাম, বাঙালিপুর, সৈয়দপুর
৪৮. কল্পনা রায়, বয়স : ২০ বছর, পিতা : ক্ষিতিশ কুমার রায়, সঙ্গলসী
৪৯. তারেক হোসেন, বয়স : ১৮ বছর, পিতা : আমিনুল ইসলাম, গ্রাম : কুন্দল, সৈয়দপুর
৫০. জয়ন্ত, পিতা : শ্রী জীবন, বয়স : ৮ বছর, লেখাপড়া : ২য় শ্রেণি, বোড়াগাড়ি, ডোমার
৫১. মমিনুর রহমান, পিতা ইউসুফ আলী, পেশা : ছাত্র, বয়স : ২৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই.এ, সাতজান, কাকড়ার বাজার, নাউতারা, ডিমলা
৫২. পূর্বোক্ত
৫৩. অলিয়ার রহমান, পেশা : কৃষি, বয়স : ৮০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : চতুর্থ শ্রেণি, চান্দখানা, চিলাহাটি, ক্যাটকিবাড়ি, ডোমার
৫৪. মমিনুর রহমান, পূর্বোক্ত
৫৫. নিশা রায় নবনী, জলঢাকা
৫৬. বিনীতা বিশ্বাস, পিতা : বিপুল বিশ্বাস, আদর্শ পাড়া, জলঢাকা
৫৭. পপি রাণী, উপজেলা : জলঢাকা
৫৮. মিতু আক্তার, জলঢাকা
৫৯. মমিনুর রহমান, পূর্বোক্ত
৬০. শাহানাজ আকতার, পিতা : সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম : দুন্দিবাড়ি, ডাকঘর : বালাপাড়া, উপজেলা : জলঢাকা
৬১. নুসরাত ইসলাম বন্যা, পিতা : নূর ইসলাম, গ্রাম : বগুলাগাড়ি, ডাকঘর : রাজারহাট, উপজেলা : জলঢাকা
৬২. মমিনুর রহমান, পূর্বোক্ত
৬৩. মমিনুর রহমান, পূর্বোক্ত
৬৪. শাহনাজ পারভীন, জলঢাকা
৬৫. বিনীতা বিশ্বাস, পিতা : বিপুল বিশ্বাস, আদর্শ পাড়া, জলঢাকা
৬৬. আনিছা আক্তার আশা, পিতা : মোঃ আমজাদ হোসেন, বালাগ্রাম, জলঢাকা
৬৭. মোঃ মোহসীন, প্রধান শিক্ষক, বিন্যাকুড়ী উচ্চবিদ্যালয়, জলঢাকা
৬৮. মোঃ নূরুজ্জামান, সহকারি শিক্ষক, জলঢাকা পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়
৬৯. মোঃ নূরুজ্জামান, পূর্বোক্ত
৭০. রাজশেখর বসু অনূদিত : বাল্মিকী রামায়ণ পৃ. ৩৬৯-৩৭২, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৬-৭, কলকাতা

www.pathagar.com

# বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

কর্মনির্ভর লোক ও কারুশিল্পের ভিত্তিতে বস্তুগত লোকসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বস্তুগত লোকসংস্কৃতি লোকপরম্পরাগতভাবে ঐতিহ্য বহন করছে। মৃৎশিল্প, নকশিকাঁথা ও নকশিপাটি বা শীতলপাটি, পটচিত্র, শখের হাঁড়ি প্রভৃতি এর উদাহরণ। বস্তুগত লোকসংস্কৃতি গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করে। এর মধ্য দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের মানসিক রুচি ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটে।

## লোকশিল্প

নীলফামারীর লোকশিল্প এ অঞ্চলের লোকজীবনের পেশা, নেশা ও শৌখিনতারই বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছু নয়। বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্যের নিপুণ কারুকার্যময়তা আধুনিক শিল্পীমানসকেও হার মানিয়ে দেয়। এ অঞ্চলের লোকশিল্পীদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর।

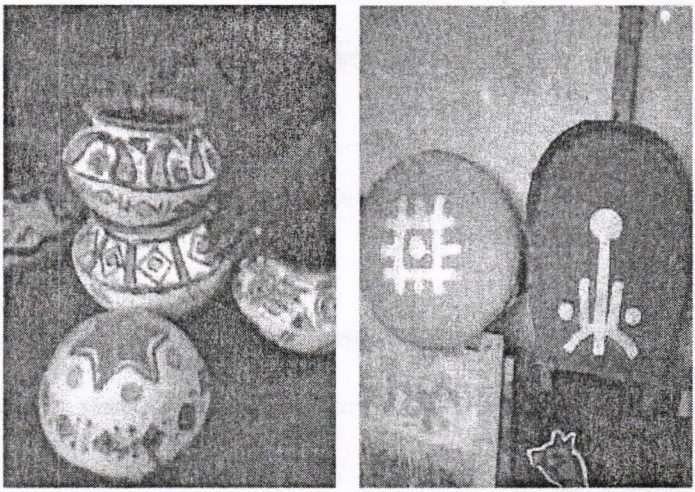

চারুশিল্প জাত পণ্য : শখের হাঁড়ি, শখের কুলা, শখের চালুন। নীলফামারী সদর

কিন্তু নিরক্ষরতা তাদের সংস্কৃতি চেতনাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি। এখানকার সাধারণ গৃহস্থ বধূরা পাট দিয়ে তৈরি করে নকশিশিকা, সাধারণ হাতপাখার সাথে ঝালর লাগিয়েও তারা চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারে। এ অঞ্চলের লোকমানুষের হাতে তৈরি শখের হাঁড়ি, শখের পাখা, শখের পুতুল, শখের কুলা, শখের চালুন প্রভৃতি চারুশিল্পের নান্দনিক কারুকার্য সহজেই মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করে থাকে। এ অঞ্চলের অন্যান্য

www.pathagar.com

কারুশিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্প, বাঁশশিল্প, লৌহশিল্প, কাঁথাশিল্প, শতরঞ্জিশিল্প, কাঠশিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ব্যবহারগত দিক থেকে এসব শিল্পজাত দ্রব্যকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণি বিভাজন করে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো। যেমন :

১. মৃৎশিল্প : অতীতে কুমারের তৈরি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আধুনিকতার অজুহাতে কুমারের তৈরি জিনিসপত্রের ব্যবহার সীমিত হয়ে পড়েছে। কুমারের তৈরি মাটির জিনিসপত্রের মধ্যে হাঁড়ি-পাতিল, কলস, থালা, মটকি, চুলা, চুনের খুটি, ফুলেরটব, ফুলদানি, খেলনা পুতুল, ফল-মূল, মাছ, পাখি, ডিয়ার, সরোয়া বা সরা ইত্যাদি।

মৃৎশিল্পজাত বিভিন্ন পাত্র, কুমার পাড়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী

শৌখিন হাঁড়ি, কলমদানি, ফুলদানি, শোপিচ, খেলনা পুতুল, পশু-পাখির মূর্তি এসবের মধ্যে মৃৎশিল্পীদের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

২. কারুশিল্প : নীলফামারী জেলার সর্বত্রই অতি প্রাচীনকাল থেকে বাঁশের তৈরি নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জলঢাকা উপজেলা সদরের বগুলাগাড়ি, বারঘড়িপাড়া, উত্তর দেশীবাই, ধারাপেচাটারি, নেকবক্ত ইউনিয়নের ঢিমপাড়া ও বসুনিয়াটারিতে বাঁশ দিয়ে তৈরি নিত্য প্রয়োজনীয় ডালি, কুলা, চালা, খাঁচারিসহ বিভিন্ন জিনিস এলাকায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই জেলার অন্য উপজেলাগুলোর প্রায় প্রতিটি গ্রামে বাঁশের কাজ হয়ে থাকে। ব্যবহারের বৈচিত্র্য অনুযায়ী এসব বস্তুর পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো :

www.pathagar.com

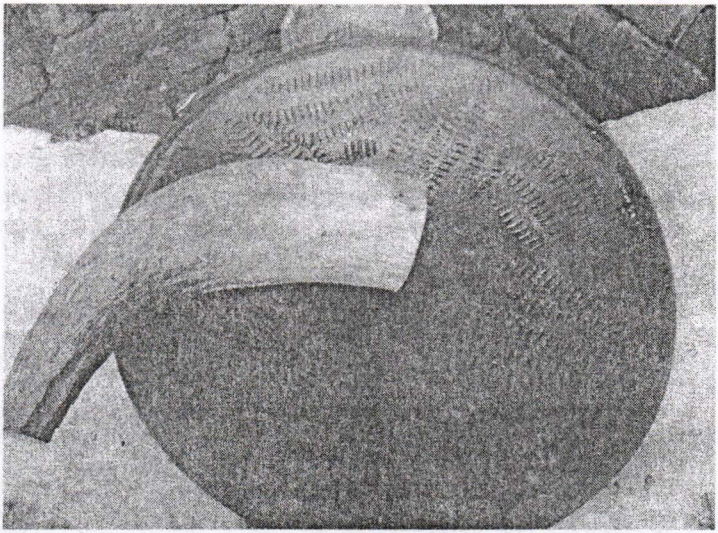

বাঁশের মুড়া বা শেকড় দিয়ে তৈরি ভত্তাপিসনী

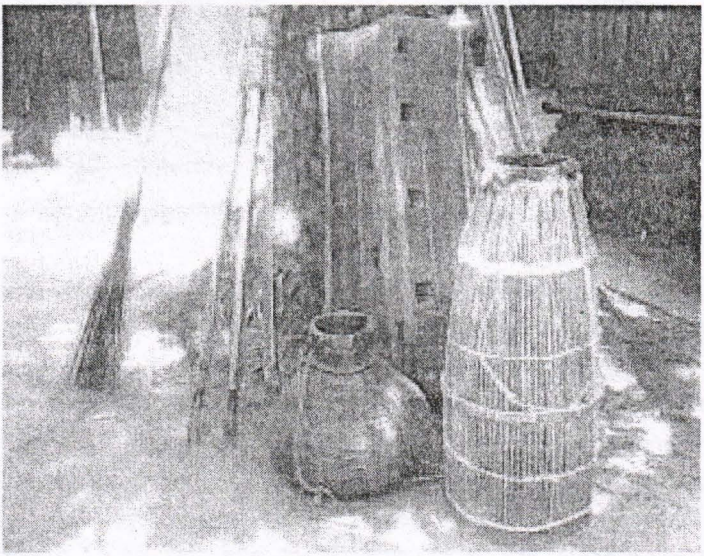

মাছ শিকারে ব্যবহৃত টেপাই, খোচা, বড়শি, পলাই, ডারকি, খলাই।
বাবুরহাট, ডিমলা, নীলফামারী।

www.pathagar.com

**গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত বস্তু :** ডালি, কুলা, চাইলন, ডুলি, ঝাড়ু, ঘুটনি, নাকড়ি, ফুঁকনি, ভত্তাপিসনি ইত্যাদি।

**গৃহনির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বস্তু :** কাবারি বা বাতা, চাটাই, পই, তীর বা ধরনা, রুয়া, বাতি, পাইর ইত্যাদি।

**আসবাবপত্র হিসেবে ব্যবহৃত বস্তু :** বসার মোড়া, ফুলদানি, কলমদানি, ছাইদানি, বাঁশের কলম ইত্যাদি।

**মাছ শিকারের কাজে ব্যবহৃত বস্তু :** ডারকি, বানা, খলাই, হেঙ্গা, টনি, পলাই, পেস্টি, টেপাই, জলঙ্গা, ভেরু, ঠুসি, ছিপ ইত্যাদি।

**কৃষিকাজে ব্যবহৃত বস্তু :** মই, হালুয়াপেন্টি, কাড়াইল, কোদালের হাতল, গরু-ছাগলের খুঁট ইত্যাদি।

**৩. দারুশিল্প :** নীলফামারী জেলার সর্বত্রই অতি প্রাচীনকাল থেকে কাঠের তৈরি নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই এলাকায় কাঠশিল্পের সাথে জড়িত ছুতারদের শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের হাতের তৈরি সুনিপুণ আসবাবপত্রগুলো দেখে। এখানকার ছুতারদের তৈরি খাট, সোফা, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, শোকেস সব কিছুতেই রয়েছে শিল্পীর নিপুণ কারুকাজ। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত কাঠের তৈরি বস্তুগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হলো :

**গৃহে ব্যবহৃত বস্তু :** দরজা, জানালা, চৌকি, খাট, চেয়ার, টেবিল, টুল, পিড়া, জলচৌকি, বাকসো, আলমারি, শোকেস ইত্যাদি।

**রান্নার কাজে ব্যবহৃত বস্তু :** ঘুটনি, নাকড়ি, উড়ুন, গাইন, ঢেঁকি, রুটি তৈরির পিড়া, বেলনা ইত্যাদি।

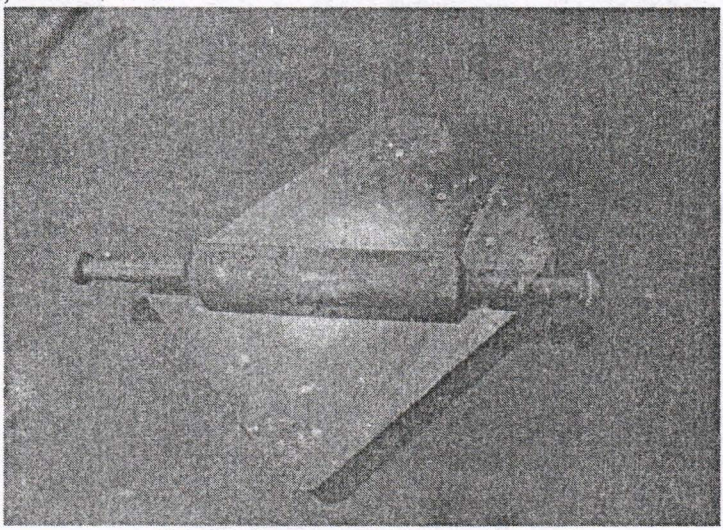

রুটি তৈরির পিড়া ও বেলনা, সৈয়দপুর, নীলফামারী

www.pathagar.com

**গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত বস্তু :** দা, দুড়াল, পাসুন, খন্তা, চাকু বা ছুরি, কাটার এসবের হাতল তৈরি হয় কাঠ দিয়ে।

**কৃষিকাজে ব্যবহৃত বস্তু :** লাঙ্গল, জোয়াল ইত্যাদি।

কৃষকের কাঁধে কাঠের ও বাঁশের তৈরি লাঙ্গল ও জোয়াল

**৪. পাটজাতশিল্প :** নীলফামারী অঞ্চলে পাটজাত পণ্যের ব্যবহার এখনও প্রচলিত। এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের হাতে এখনও পাট দিয়ে তৈরি হচ্ছে দড়ি বা রশি, সুতলি, শিকা, বসার মোড়া ইত্যাদি। গ্রামে প্রায় প্রতিটি ঘরেই হাতে হাতে পাটজাত পণ্য তৈরি হয়।

পাটজাতশিল্প

www.pathagar.com

**৫. শতরঞ্জি শিল্প :** এ শিল্পে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর মধ্যে কার্পেট, জায়নামাজ, দস্তরখানা, পাপশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ অঞ্চলে বগুলাগাড়ি গ্রাম শতরঞ্জি শিল্পের জন্য সুপরিচিত। বর্তমানে আকর্ষণীয় বুনন কৌশল ও নকশার সাহায্যে ওয়ালমেট, টেবিলক্লথ, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে এ শিল্পে। বিদেশেও শতরঞ্জির ব্যাপক চাহিদা থাকায় এখানকার শিল্পীদের তৈরি শতরঞ্জি বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।

## তথ্যসহায়ক

১. সদর, নীলফামারী
২. বাবুরহাট, ডিমলা, নীলফামারী
৩. সৈয়দপুর, নীলফামারী
৪. শালন গ্রাম, জলঢাকা
৫. গাড়গ্রাম, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
৬. কুমারপাড়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী

www.pathagar.com

# লোকস্থাপত্য

(টিনের ঘর, ছনের ঘর, মাটির ঘর, ঘরের ঝাপ, টিনের ঘরের নকশী কারুকাজ)

**নীলফামারী জেলার বিভিন্ন ধরনের লোকস্থাপত্য**

১. আধাপাকা/হাফওয়াল ঘর
২. টিনের ঘর। এটি বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন :
    (ক) এলপাটান
    (খ) চৈয়ারি
    (গ) বাংলা ঘর
    (ঘ) চালাম ঘর
৩. খেড়ি ঘর/কুঁড়ে ঘর
৪. মাটির ঘর

**বসবাসের পরিপ্রেক্ষিতে নীলফামারী জেলার বিভিন্ন জায়গার ঘরের নাম**

১. বড় ঘর/শোয়ার ঘর/থাকার ঘর
২. গোয়াল ঘর/গোইল ঘর
৩. রান্না ঘর/আন্দর ঘর/পাকের ঘর
৪. খাংকা ঘর/আটাল ঘর/ডারি ঘর
৫. মাচার ঘর/চাংড়া পাতা ঘর/গোলা ঘর
৬. খড়ির ঘর/খড়ি থোয়া ঘর।

## বিভিন্ন ঘরের বর্ণনা

নীলফামারী জেলার বিভিন্ন জায়গায় বর্তমানে দালান ঘর/পাকা বাড়ি দেখা যায়। এসব বাড়ি সংখ্যায় অনেক কম। এ বাড়িগুলো রড, সিমেন্ট, ইট, বালু ও খোয়া ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত হয়। এসব বাড়ি শহরের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এ বাড়িগুলো সম্পূর্ণই পাকা। তবে লোকস্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে বাড়িঘরের সংখ্যাই বেশি।

**১. আধাপাকা/হাফওয়াল বাড়িঃ** নীলফামারী জেলায় অনেক জায়গায় হাফওয়াল/ আধাপাকা বাড়ি গড়ে ওঠে। এসব বাড়ির অর্ধেক দেয়াল ইট দিয়ে গাঁথানো হয় আর বাকি অর্ধেক টিন/বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরী করা হয়।

**২.টিনের ঘরঃ** নীলফামারী জেলায় বেশির ভাগ বাড়ি টিন দিয়ে তৈরী। ঘরের মধ্যে বাঁশের পই অথবা গাছের পিলার দিয়ে নিমির্ত হয় এসব বাড়ি বাঁশের ধারা অথবা কাঠ

www.pathagar.com

দিয়ে এসব বাড়ির চাটি/বেড়া দেওয়া হয়। অনেক বাড়ি সম্পূর্ণ টিন দিয়ে নির্মান করা হয়। কেউ আবার শিন্ডা/পাটখড়ি দিয়ে এসব বাড়ির চাটি/বেড়া দিয়ে থাকে। টিনের বাড়ি বিভিন্ন ধরনের দেখা যায়-

**(ক) এলপাটান :** ইংরেজি "L"অৰরের মতো করে কয়েকটি ঘর এক সাথে নির্মান করা হয়। এসব বাড়ি নীলফামারী জেলায় সব জায়গায় পাওয়া যায়।

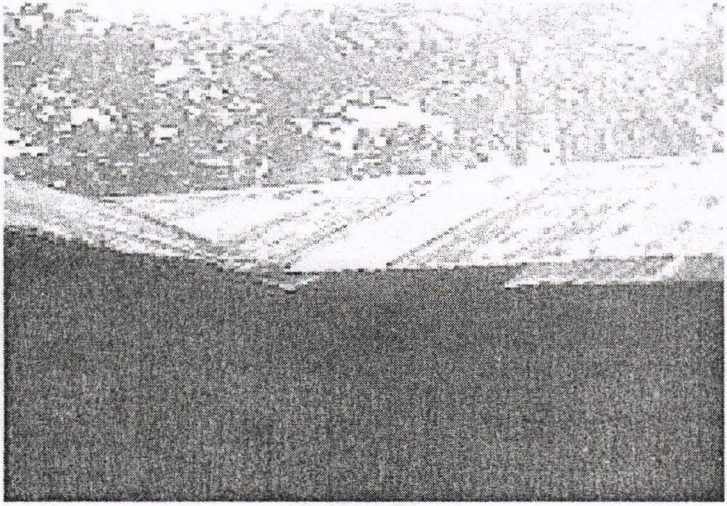

এলপাটান ঘর

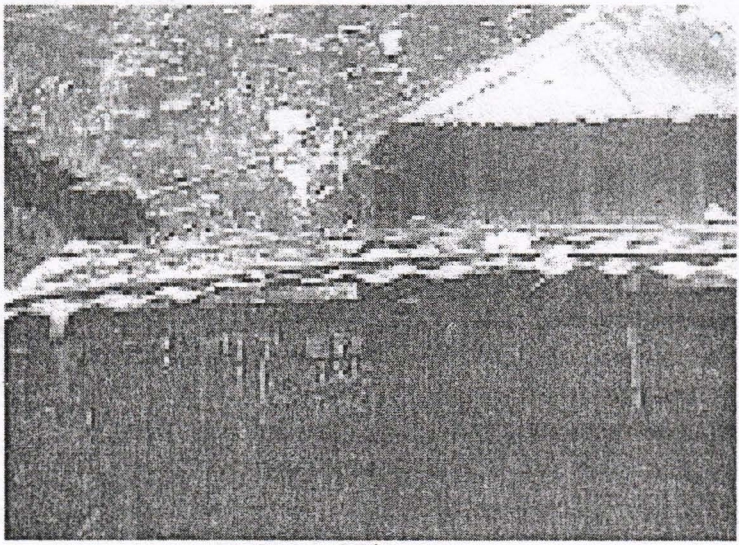

টিন দ্বারা নির্মিত চালাম ঘর


www.pathagar.com

**(খ) চৈয়ারি ঘরঃ** টিনের চারচালা দিয়ে যে ঘর নির্মান করা হয় সেই ঘরই চৈয়ারী ঘর। এসব ঘরের সংখ্যা নীলফামারী জেলায় সবচেয়ে বেশি। এসব চৈয়ারী ঘরের বেড়াগুলো বাঁশের ধারা, কাঠ অথবা টিন দিয়ে তৈরী করা হয়।

**(গ) বাংলা ঘরঃ** দুই চালা দিয়ে যে ঘর নির্মাণ করা হয় সেটাই বাংলা ঘর। এসব ঘরের উপরে টিন এবং কাঠ/বাঁশের উয়া দিয়ে তৈরী করা হয়। এসব ঘরের চাটি/বেড়া-শিণ্ডা/পাটখড়ি অথবা বাঁশের ধারা দেওয়া হয়।

**(ঘ) চালাম ঘরঃ** একচালা দিয়ে যে ঘর নির্মান করা হয় তাই চালাম ঘর। নীলফামারী জেলায় নিম্নবিত্ত পরিবারের মধ্যে এসব চালাম ঘর লক্ষ্য করা যায়।

**৩. খেড়ি ঘর/কুঁড়ে ঘরঃ** নীলফামারী জেলায় নিম্নবিত্ত পরিবারের মধ্যে এসব খেড়ি ঘর দেখা যায়। এসব ঘরের মূল উপাদান

ক. কাশিয়া খ. গমের খড়/ডান্ডা গ. ধানের কাড়িয়া ঘ. বাঁশের কনচি/ঝিক ঙ. পাটখড়ি/শিন্ডা চ. পলিথিন ইত্যাদি দিয়ে এসব ঘর তৈরী করা হয়।

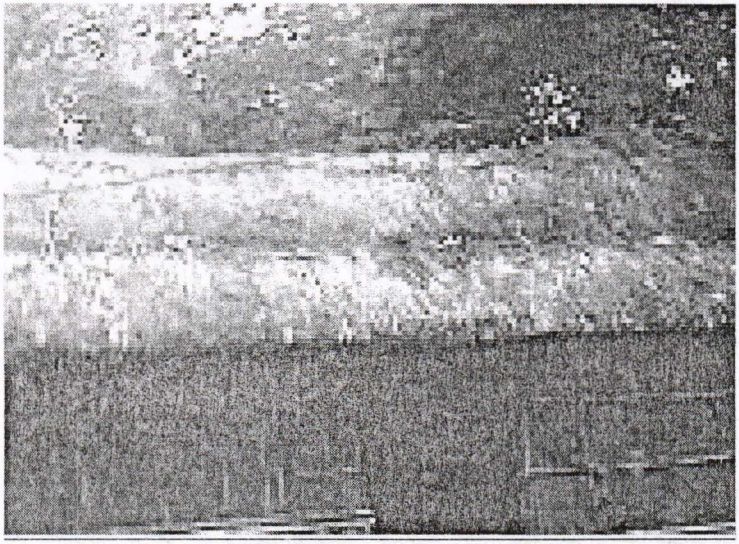

খেড়ি ঘর/ কুড়ে ঘর

**৪. মাটির ঘরঃ** দোলার চিটকা মাটির সমন্বয়ে মাটির ঘর তৈরী করা হয়। নীলফামারী জেলায় বিভিন্ন জায়গায় এসব বাড়ি লক্ষ্য করা যায়, এসব বাড়ির পরিমান খুবই নেহাতি গন্য। এসব বাড়ি ক্রমেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

## বসবাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ঘরের বর্ণনা

**বড় ঘর/শোয়ার ঘর/থাকির ঘরঃ** যে ঘরে বাড়ির মুরুব্বীরা অর্থাৎ পিতা-মাতা থাকেন সে ঘরকেই বড় ঘর/শোয়ার ঘর/থাকির ঘর বলে। আত্নীয়-স্বজন এলে এ ঘরেই

www.pathagar.com

থাকতে দেয়া হয়। নীলফামারী জেলায় জলঢাকা থানার বালাগ্রাম ইউনিয়নে এসব ঘরকে থাকির ঘর নামে আখ্যায়িত করে।

**গোয়াল/গোইল ঘরঃ** যেসব ঘরে গরু, ছাগল, ভেড়া মহিষ/ভহিষ ইত্যাদি রাখা হয় সে ঘরকে গোয়াল ঘর/গোইল ঘর বলে।

**রান্না ঘর/আন্দর ঘরঃ** রান্নাবান্না এবং খাওয়ার জন্য যে ঘর তৈরী করা হয় সেসব ঘরকে রান্না ঘর/আন্দর ঘর বলে।

**খাংকা ঘর/আটাল ঘর/ডারি ঘরঃ** বাড়ির উঠানে বাঁশের চাটাই দিয়ে এসব ঘর নির্মান করা হয়। অবসর সময়ে এসব ঘরে বসে বিশ্রাম গল্পগুজব করা হয়। এসব ঘর ক্রমেই কমতে শুরু করেছে।

**মাচার ঘর/চাংরা পাতা ঘর/গোলা ঘরঃ** এসব ঘর বাঁশ দিয়ে সুন্দর আকৃতির করে তৈরী করা হয়। নীলফামারী জেলার প্রায় প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতে এসব ঘর দেখা যায়। এসব ঘরের নিচের অংশে ইট অথবা বাঁশের ছোট খুঁটি/পই দিয়ে তার উপর বাঁশের চাটাই দিয়ে মাচার ঘর তৈরী করা হয়।এসব ঘরে ধান, চাল, পাট, তামাক ইত্যাদি রাখা হয়।

**খড়ির ঘর/খড়ি থোয়ার ঘর/খড়ির মাচার ঘরঃ** এসব ঘরে রান্নার জন্য পাটখড়ি/শিঙা, ভুটার ডান্টা, বাঁশের শুকনা কঞ্চি, শুকনা বাঁশের মুড়া, পই ইত্যাদি রাখা হয়। খড়ি রাখা হয় বলে এসব ঘরকে খড়ির ঘর নামে অভিহিত করা হয়।

## ঘরের ছাদ

গরম ও শীত থেকে পরিত্রানের জন্য ছাদের ব্যবহার নীলফামারী জেলায় প্রায় প্রতিটি বাড়িতে লক্ষ্য করা যায়। অবস্থা ভেদে এসব ছাদ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এসব ছাদ বিভিন্ন কারুকার্যে তৈরী করা হয়। মাকলা বাঁশ বিভিন্ন ধরনের রং এবং পলিথিন ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন কারুকার্যে এসব ছাদ তৈরী করা হয়।

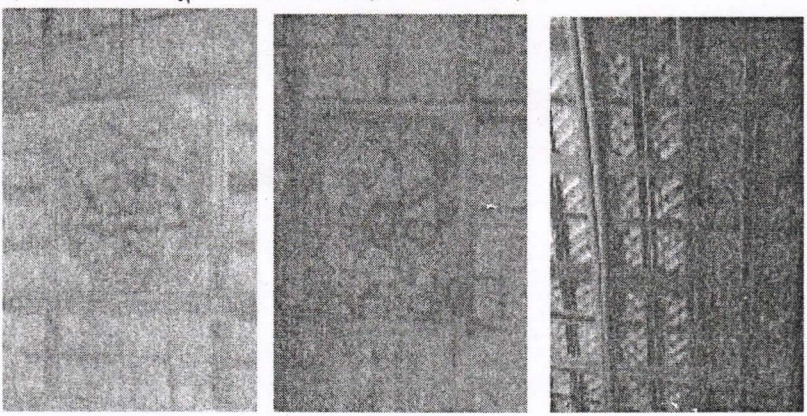

ছাদের নকশা

www.pathagar.com

## তথ্যসহায়ক

১. মোছাঃ নেছাবী (বেওয়া)। বয়সঃ ৯১ বছর। স্বামীঃ (মৃত) মাহের হোসেন। ঠিকানাঃ শালনগ্রাম, বালাগ্রাম, জলঢাকা, নীলফামারী।

২. মোঃ মশিয়ার রহমান।বয়স ৫৩ বছর। ঠিকানাঃ নটাবাড়ি, ডিমলা, নীলফামারী।

৩. মোঃ জাদু-মিয়া। বয়সঃ ৬৫ বছর। ঠিকানাঃ বনগ্রাম, গোলমুন্ডা, জলঢাকা, নীলফামারী।

www.pathagar.com

# লোকসংগীত

নীলফামারী বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক অঞ্চল হওয়ায় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বাঙালি সংস্কৃতি এবং উর্দুভাষী সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে অঞ্চলের সংস্কৃতিতে। আর এই সংস্কৃতির একটি বড় মাধ্যম সংগীত। এ অঞ্চল যেমন আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে সংস্কৃতিলা গর নানা উপাদান তেমনি সমগ্র দেশের প্রভাবশালী সংস্কৃতির দাপটও উপেক্ষিত নয়। বাংানের ধারার প্রায় সবগুলো শাখারই চর্চা হয় প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে। গ্রামাঞ্চল বলে যে ধারণা সেটি এখন প্রযুক্তির নানামুখী ব্যবহারে অনেকটা পরিবর্তিত। তাই সংস্কৃতি চর্চার ধরনে এসেছে নানা মাত্রা। আগে যেখানে গান-গল্প-কবিতা শুনবার একমাত্র মাধ্যম ছিলো গায়ক বা শিল্পীর সশরীরী উপস্থিতি, এখন নানা যান্ত্রিক উপকরণ। তাই একদিকে লোকজ মানস থেকে উঠে আসা সংস্কৃতি অনেকটা কোণঠাসা যান্ত্রিক চর্চার কাছে। তবে এই সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ ভোক্তারা নিজ নিজ পছন্দ মতোই সাজিয়ে নেন। যেমন : যে ভাওয়াইয়া, পালা, জারি, সারি, কীর্তন, লোকনাটক তাদের সাংস্কৃতিক বোধকে জাগিয়ে রাখার উপাদান।

নীলফামারী জেলার ছটি উপজেলার সংস্কৃতি চর্চায় ব্যাপক কোনো পরিবর্তন না থাকলেও সাংস্কৃতিকগোষ্ঠীর উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতি সেসব এলাকায় ভিন্নতা এনেছে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জন্য তেমন তৈরি হয় না মৌসুমি গান-বাজনার মঞ্চ। তবে এনজিও পরিচালিত নানা কার্যক্রমের সহায়ক গান-নাটক চর্চার জন্য বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে সাংস্কৃতিক সংগঠন। এই দলগুলোই মূলত তাদের পেশাগত চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশজ নানা উপাদানকে কখনও অবিকৃতভাবে কখনও নিজেদের মতো বানিয়ে নিয়ে চালিয়েছে পরিবেশনা। গোটা নীলফামারী জেলায় মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান করে লোকসংগীতের কয়েকটি ধারার সন্ধান মিলেছে।

## ১. ভাওয়াইয়া

বাংলা লোকসংগীতের ধারায় শুধু নয় সমগ্র বাংলা গানের ধারায় ভাওয়াইয়া জনপ্রিয় সংগীতধারা। পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার শিলিগুড়ি ছাড়া এর ব্যাপ্তি বাংলাদেশের গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে। রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত এ সংগীতধারা প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি বিষয় বৈচিত্র্যে সুরের বিচিত্রতায় প্রভাব বিস্তার করে আছে। এ ধারার গানে একদিকে যেমন জাগতিক জীবনের নানা পর্ব-উৎসব, দৈনন্দিনের ইতিবৃত্ত ধারণ করে তেমনি মরমি ধারার সুর ও ভাবসম্পদের প্রভাবেও প্রভাবিত হয় ভাওয়াইয়া। তাই ভাওয়াইয়া আর কেবল আঞ্চলিক সংগীত নয়।

নীলফামারী জেলার পুরোটাই বৃহত্তর রংপুর বলে খ্যাত। এ অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গান মূলত সামগ্রিক জীবনযাপনের খুঁটিনাটি ধারণ করলে- কৃষিজীবী মানুষের দৈনন্দিনই প্রধান বিষয়। এখানে নানা পেশার, নানা বয়সের মানুষ, গানের গল্পের পাত্র-পাত্রী ভাওয়াইয়া

www.pathagar.com

নারী বিরহের গান এমন তথ্যকে অস্বীকার করে ভাওয়াইয়া নারী-পুরুষ, ছেলেবুড়ো নির্বিশেষে সব পেশা, সব বয়সের মানুষের গান। এ অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানগুলো :

**ক. নাম না জানা প্রাচীন গীতি কবিদের রচনা**

**খ. নাম জানা গীতিকারদের স্ব-নামে লেখা গান**

মূলত প্রাচীন গানগুলো মানুষের মুখে মুখেই ঘুরেফেরে। আর নতুন গীতিকবিরা সমকাল অথবা প্রাচীন গানের প্রভাবে লিখে চলেন জীবনের গান। এ অঞ্চলের দুজন ভাওয়াইয়া গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী মহেশচন্দ্র রায় ও হরলাল রায়। ভাওয়াইয়ার প্রচলিত গানগুলো বাদ দিলে জনপ্রিয় ভাওয়াইয়াগুলো এই দুই প্রধান গীতিকারের রচনা। এছাড়াও সমকালে কয়েকজন ভাওয়াইয়া গীতিকার যেমন- জলঢাকার বিনয় রায়, সৈয়দপুর বেলাইচন্ডীর বিনয় রাজ বংশী ও আব্বাস আলী; কিশোরগঞ্জের মধুসূদন রায়, সুবল বয়াতি প্রমুখ গীতিকার লিখে চলেছেন ভাওয়াইয়া গান।

**মহেশচন্দ্র রায়ের গান**

১

পানিয়া গোলাম ডাংগাইলে[১] মোক
চ্যাপটা[২] বাতা[৩] দিয়া
অক্ত বেরাইল[৪] পিঠি ফাটি[৫]
দোর দোর করিয়া রে[৬]
দোর দোর করিয়া॥

না করিম আর বাসি কুশি[৭]
ভাত না দেইম আন্দিয়া[৮]
দিন-মনটায়[৯] থাকিম শুতি[১০]
দাগলী[১১] মাথাত দিয়া রে
দাগলী মাথাত দিয়া॥

বাপো নাই মোর মাও নাই
উদিশ[১২] করে কায়
ভাই ভাতিজা গুটিক খানেক[১৩]
তাহও না নিগায় রে[১৪]
তাহও[১৫] না নিগায়॥

কতই সইম[১৬] আর উয়ার[১৭] জ্বালা
গাও যায় জ্বলিয়া
এলায় মরুক পানিয়া গোলাম
যাইম বিদা হয়ারে
যাইম বিদা হয়া[১৮]॥

www.pathagar.com

ফল্লায় বেলে ভারুয়া[১৯] হয়
সদায় সগায় কয়
জটিলা কুটিলা বুড়ি[২০]
কানমন্ত্রণা দেয় রে
কানমন্ত্রণা দেয়॥
মোরে ঘাটাল ঘাটে[২১] সদায়
ফুসফাস করিয়া
না নেদ্যাও[২২] অর বাড়ি ঘরক
মন গেইছে আউলিয়ারে[২৩]
মন গেইছে আউলিয়া॥

না পিন্দিম[২৪] আর পাছাপাইড়া[২৫]
আগুন নাগে দেইম[২৬]
যার সাথে মোর মজিছে মন
তারে মাইয়া[২৭] হইম রে
তারে মাইয়া হইম।
না পিন্দিম আর জিনিস জানাস
নে তুই খশেয়া[২৮]
ফল্লার[২৯] হাত ধরিয়া যাইম
দেশান্তরী হয়ারে
দেশান্তরী হয়া॥

মহেশচন্দ্র রায়ের এ দলটি চর্চা করে চলেছেন বিভিন্ন ধারার গান

*রচনাকাল : ৫ শ্রাবণ ১৩৫৮ সন*

১. ডাংগাইলে-মারলে, ২. চ্যাপ্টা-প্রশস্ত, ৩. বাতা-বাঁশের পাতলা ফালি, ৪. অক্ত বেরাইল-রক্ত বের হলো, ৫. পিঠি ফাটি-পিঠ ফেটে, ৬. দোর দোর করিয়ারে-দর দর করে, ৭. বাসিকুশি- ঘুম থেকে জেগেই সব ধরনের কাজ করা, ৮. আন্দিয়া-রান্না করে, ৯. দিন-মনটায়- সারাদিন, ১০. থাকিম শুতি-শুয়ে থাকবো, ১১. দাগলী- গায়ে দেয়ার মোটা কাঁথা, ১২. উদিশ–খবর, ১৩. গুটিক খানেক-বেশ কয়েকজন, ১৪. না নিগায় রে-নিয়ে যায় না, ১৫. তাহও-তবুও, ১৬. সইম-সহ্য করব, ১৭. উয়ার-ওর ১৮. বিদা হয়া-অভিমান করে চলে যাওয়া, ১৯. ভারুয়া-গোপন প্রেমিক, ২০. জটিলা কুটিলা বুড়ি-কুটনী বুড়ি, ২১. মোরে ঘাটাল ঘাটে-আমার কথা নিয়ে ফুসফাস করে, ২২. না নেদ্যাও-লাথি না মারি, ২৩. আউলিয়ারে-এলোমেলো করা, ২৪. পিন্দিম-পরিধান করবো, ২৫. পাছাপাইড়া-মোটা পাড়ের এক ধরনের শাড়ি, ২৬. আগুন নাগে দেইম-আগুন জ্বালিয়ে দিব, ২৭. তারে মাইয়া হইম রে- তার বৌ হবো রে, ২৮. নে তুই খশেয়া- তুমি খুলে নাও, ২৯. ফল্লার- নাম উচ্চারণ না করে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে বলা।

www.pathagar.com

২

ও পারে কাঁন্দে রে বগি হুকুরি ডুকুরি[১]
এ পারে মুঁইও অভাগুনি[২]
মধ্যখানে খোরাই নদী
অরও গাবার গেইছে উদুরী[৩]
অয়ও[৪] কাঁন্দে হামার[৫] কাঁন্দন শুনি॥
ও কি বিধি রে...

বগির মইছে সোয়ামি দোলাত[৬]
মোর সোয়ামি মইচ্ছে কোলাত্
দোনোজনে হইনো
কাঞ্চা চুলের আড়ি[৭]
হস্তের সাংখা মোর
হইলো রে[৮] চূড়
মৈলান হৈলো[৯] মোর সিতার সেঁন্দুর
পড়ি রইলো মোর
বিয়ার আইতের খারি[১০]
ওকি বিধি রে পড়ি রইলো মোর
বিয়ার আইতের খারি॥

আয় বগি এত্তি আয়
তুইও একেলায় মুঁইও একেলায়
তুইও মুইও থাকিমো[১১] গলা ধরি
কপালোতে নাই রে সুখ
বিধাতা হইছে বিমুখ
গাবুর বয়সে হামরা হইনো ডেঁকুয়া আড়ি
ও কি বিধি রে গাবুর বয়সে হামরা হইনো ডেঁকুয়া আড়ি?[১২]॥

১. হুকুরি ডুকুকি-চিৎকার করে কাঁদা, ২. অভাগুনি-অভাগিনী, ৩. অরও গাবার গেইছে উদুরী- ওরও পার গেছে ভেঙে, ৪. অয়ও-সেও, ৫. হামার- আমাদের, ৬. বগির মইছে সোয়ামি দোলত- লোকালয় থেকে দূরে নিচু আবাদি জমিতে বগির স্বামী মারা গেছে,৭. দোনোজনে হইনো কাঞ্চা চুলের আড়ি- দুইজনই অল্প বয়সে বিধবা হলাম, ৮. হস্তের সাংখা মোর হইলো রে চুর- হাতের সাখা আমার ভেঙে চুরমার হলো, ৯. মৈলান হৈল- মলিন হলো, ১০. বিয়ার আইতের খারি- বিয়ের রাতের শাড়ি, ১১. থাকিমো- থাকবো, ১২. ডেঁকুয়া আড়ি-অল্প বয়সে বিধবা।

www.pathagar.com

৩

**মেয়ে :**
হাড়িয়া কোনে[১] নাইগছে[২] রে দেওয়া
গুড়গুড়িয়া ডাকে
পার করি দে সকাল সুকাল
হাত ধরি কও তোকে
(রে ঘাটিয়াল)[৩] পাও ধরি কও তোকে॥

**ছেলে :**
ভাবনা ক্যানে করেন কইন্না হে
ও কইন্না যদি আসে ঝরি
নুকিয়া[৪] থুইম[৫] মুই তোকে আগোতে
জাবরে[৬] বুকোত ধরি কইন্না হে॥

**মেয়ে :**
গেদরা কথা[৭] কছেন[৮] ক্যানে
মুই যে পরার নারী
তাড়াও করি[৯] দে পার করি
নিয়া পাইসা করি রে ঘাটিয়াল
নিয়া পাইসা করি॥

**ছেলে :**
না চাই তোমার পাইসা করিহে
ও কইন্না না চাই কোনো ধন
ততো করি [১০] দেইম[১১] পার করি মুই
দে তুই আগোত[১২]মন কইন্না হে॥

**মেয়ে :**
মন দিছু মুই রসিয়া বন্ধুক
আর কি দেওয়া যায়
ওই বাদে[১৩] মোক পাড়ার মানষি
কলঙ্কিনী কয়রে ঘাটিয়াল
কলঙ্কিনী কয়॥

**ছেলে :**
সেই কলঙ্কের ডালাকোনা[১৪] মুই
ও কইন্না আংখি[১৫] মেলি চাও
চউখের জল অঞ্চলে মুছি
গোড়োত খারা হও কইন্না হে॥

www.pathagar.com

**মেয়ে :**

দেখি তোমার ঢং খেয়ালি হে[১৬]
ও বন্ধু মনোত[১৭] বেড়ায় হাসি
কলঙ্কিনী গোড়োত আসি[১৮]
বাজাও মোহন বাঁশি বন্ধু হে॥

*রচনাকাল: ২ ভাদ্র ১৩৫৮ সন*

১. হাড়িয়া কোণে-উত্তর-পশ্চিম কোণে, ২. নাইগছে রে দেওয়া-মেঘ করেছে, ৩. ঘটিয়াল-নৌকার মাঝি, ৪. নুকিয়া- লুকিয়ে, ৫. থুইম-রাখবো, ৬ . জাবরে- জড়িয়ে, ৭. গেদরা কথা-অশ্লীল কথা, ৮. কছেন-বলছেন, ৯. তাড়াও করি-তাড়াতাড়ি করে, ১০. তত করি- সত্যি সত্যি, ১১. দেইম- দেবো, ১২. আগোত- আগে, ১৩. ওই বাদে-ওই জন্য, ১৪. কলঙ্কের ডালাকোনা-কলঙ্কের আঁচরটুকু, ১৫. আংখি- আঁখি>চোখ, ১৬. ঢং খেয়ালি হে- রংঢং, ১৭ . মনোত- মনে ১৮. গোড়ত আসি- কাছে এসে।

৪

তরল হাস্যময়ী ক্রীড়ারতা সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুম কোমল গৌরীসম বিবাহিতা গ্রাম্য বালিকা যেদিন শকুন্তলার মতোই নিদারুণ শোক নিয়ে পতিগৃহে যাত্রা করলো সেদিনের সেই করুণ দৃশ্যটুকু অবলম্বনে :

ধীরে বোলাও[১] গাড়িরে গাড়িয়াল
আস্তে বোলাও গাড়ি
আর এক নজর দেখিয়া ন্যাও[২] মুঁই[৩]
দয়াল বাপের বাড়ি (রে গাড়িয়াল)
দয়াল বাপের বাড়ি॥

বাপো[৪] কাঁন্দে অই দেখা যায়
আশ্ পড়শী[৫] নিকাশ[৬] ফেলায়
বাচ্চা বইনোক[৭] নিয়া কোলায়[৮]
মাও কাঁন্দে ডুকুরী[৯] রে গাড়িয়াল
মাও কাঁন্দে ডুকুরী॥

না জানোং[১০] মুই আনন্দ-বাড়ন্[১১]
না জানোং মুই অশ্বন-পশ্বন[১২]
না পারোং মুই কুটিবার তরকারি
ননেনে[১৩] পারিবে গালি

www.pathagar.com

সদায়[১৪] কইবে মোক ভাকুড়াগালি[১৫]
সদায় কইবে মোক্-
জরম আলশিয়ানী॥[১৬]

মুই হনু[১৭] যে দোকাপুড়ী [১৮]
শিয়ানা[১৯] হবার অনেক দেরি
এলায় ক্যানে আইনেন[২০] গাড়ি ধরি
আর কিছুদিন থুইয়া যাও
পুষিবে পালিবে মাও
না নিগান[২১] মোক
ঠ্যাংগোত্[২২] নাগে[২৩] দড়ি॥

রচনাকাল: ২৭ চৈত্র ১৩৬১ সন

১. বোলাও- চালাও, ২. দেখিয়া ন্যাও- দেখে নিই, ৩. মুঁই- আমি, ৪. বাপো-বাবা, ৫, আশ পড়শী-পাড়াপ্রতিবেশী, ৬. নিকাশ- নিশ্বাস, ৭. বইনোক- বোনকে, ৮. কোলায়-কোলে, ৯. কান্দে ডুকুরী- চিৎকার করে কাঁদে, ১০. জানোং- জানি, ১১. আনদন- বাড়ন- রান্না-বান্না, ১২. অশ্বন-পশ্বন-পরিবেশন, ১৩. ননেন- ননদে, ১৪. সদায়- সবসময়, ১৫. ভাকুড়াগালি- গোমড়া মুখী, ১৬. জরম আলশিয়ানী- জন্ম থেকেই অলস, ১৭ হনু- হলাম, ১৮. দোকাপুড়ী- কম বয়সি, ১৯ শিয়ানা- প্রাপ্ত বয়স্ক, ২০. এলায় ক্যানে আইনেন- এখন কেন এলেন, ২১. নিগান- নিয়ে যান, ২২. ঠ্যাংগোত- পায়ে, ২৩. নাগে- লাগিয়ে।

৫

ই ঢাল কাউয়া[১] তুই করিস ক্যানে কা কা কা।
ছিটিয়া দ্যাছোঁ চাইট্টা খুদি[২]
ওকিনা কুঁড়ি খা[৩] (২) ॥

ভুখাও আগোত ধানের বাড়া[৪]
পাছোত এ্যালা খাইস্ মরা[৫]
পঁছ[৬] করি মোর বাপের বাড়ি
খবর দিবার যা (২) ॥

বাপোক[৭] কইস মোর ক্ষমকায়[৮] করি
কইছে তোমার বেটি
মোর বাদে[৯] ন্যায় হাটোত যেন

www.pathagar.com

টিয়া রঙের ঠেটি[১০]
মাওক কইস্ মোর আনিয়া থুবার[১১]
নয়া তালের পাখা
খোপা বান্ধা চ্যাপটা ফিতা
ঘাগরি কাটা[১২] শাখা (২) ॥

যেইটে থাউক[১৩] মোর সোনা ভাইয়া
কবু নাগাইল ধরি[১৪]
কাইল উদিনকা পঠায় যেন[১৫]
মোক নিগিবার[১৬] গাড়ি॥
সোহাগুনি ভাউজোক[১৭] দিবু
খেরকি দিয়া[১৮] দ্যাখা
নিবার কবু নেটি গুঞ্জী[১৯]
অরে গাওরের জোকা[২০] (২) ॥

জ্যাট মাসিয়া[২১] টেপরি কাঠোল[২২]
দুধদি[২৩] খাওয়া আম
টোপরা[২৪] খানেক কলমি নেবু
ঘটঘটিয়া[২৫] জাম।
তয় তরকারি শাক পাতারি
হলদি আদার শুকা[২৬]
আরও কবু তাংকু পঠের[২৭]
সোয়ামি[২৮] খাইবে হুকা॥ (২)

রচনাকাল: ১৫ বৈশাখ ১৩৬৭ সন

১. ঢাল কাউয়া- দাঁড় কাক,২. ছিটিয়া দ্যাহ চাইট্টা খুদি- ছিটিয়ে দিচ্ছি চালের কিছু, ৩. ওকিনা কুড়ি খা- ওইটুকু কুড়িয়ে খাও, ৪. ভুখাও আগত ধানের বাড়া- আগে ধান ভাঙো, ৫. পাছত এ্যালা খাইস- পরে খেয়ে নিও, ৬. পঁহু করি- তাড়াতাড়ি, ৭. বাপোক- বাবাকে, ৮. ক্ষমকায়- মনে করে, ৯. মোর বাদে- আমার জন্য, ১০. ঠেটি- শাড়ি, ১১. আনিয়া থুবায়- এনে রাখে যেন, ১২. ঘাগরি কাটা- নকশা করা, ১৩. যেইঠে থাউক- যেখানে থাকুক, ১৪. কবু নাগাইল ধরি- বলবে দেখা করে, ১৫. উদিনকা পঠায় যেন- পরশু দিন যেন পাঠায়, ১৬ . নিগিবার- নিয়ে যাবার, ১৭. সোহাগুনি ভাউজোক- সোহাগিনী ভাবিকে, ১৮. খেরকি দিয়া- পিছনের দরজা দিয়ে, ১৯. নেটী গুঞ্জি- সুতার

www.pathagar.com

তৈরি নেট নির্মিত ব্লাউজ, ২০. অরে গাওয়ের জোকা- ওরে গায়ের সমান, ২১. জ্যাট মাসিয়া- জ্যৈষ্ঠ মাসের, ২২. টেপরি কাঠোল- ছোট খাট হৃষ্ট পুষ্ট কাঁঠাল, ২৩. দুধদি- দুধ দিয়ে, ২৪. টোপলা- পোটলা, ২৫. ঘট ঘটিয়া জাম- এক ধরনের জামফল বিশেষ, ২৬. হলদি আদার শুকা- হলুদ আদার শুকানো সুঁট, ২৭. আরও কবু তাংকু পঠের- আরও তামাক পাঠাতে বলবে, ২৮. সোয়ামি- স্বামী।

**হরলাল রায়ের গান**

১

ওরে রাগ করেন না সোনার কন্যা
মনোত না হন গোসা (ও কন্যা)
ওরে দুই-চাইরখান মাস সবুর করেন
ফিরিয়া হইবে দেখা হে
ওমোর সোনার কন্যা হে ওমোর গুণের কন্যা হে ॥

ওরে একলা ঘরোত উঠং বসং
পরান যায় ফাটিয়া (ও কন্যা) (২)
ওরে কি দিয়া বোঝাইমু তোমায়
এই না মনের ব্যথা হে ॥

ওরে বন পোড়া যায় সগায় দেখে
আকাশে উড়ায় ধোয়া (ও কন্যা) (২)
ওরে মনের আগুন মনোত জ্বলে
কেউনা পায় তার দেখা হে ॥

ওরে মাঘ মাসিয়া দ্যাওয়ায় বষ্ষে
থাকিয়া থাকিয়া (ও কন্যা)
ওরে ঝড়ির দিনোত্ মন কাঁন্দে মোর
বিছানাত্ সুতিয়া হে ॥

২

ওরে ঘরের পাছোত মোর হরিয়ারে তাঁতি
শাড়িখ্যান বানেয়া দে (২) ॥

ও বুইড়ার বুড়ি গেইছে তানার বৈতানে
বুইড়ায় বসিয়ায় ভাবে রে
কোন্ কোন্ রঙে বানাবু রে শাড়িখান
বয়ান কয়া দে ॥

শাড়ির কান্ধায় দিছে লাল চটকা পাড়ি
মইধ্যে বালুর চড় রে
আঁচেলায় দিছে লাল কালো হলদিয়া রং
দেখিতে চমৎকার ॥

সেই শাড়ি পিন্দিয়া গেইলো বুড়ি
ঐনা পোড়ার হাটে রে

www.pathagar.com

যতো হাটুআলা আঞ্চল ধরিয়া কয়
শাড়িখান বানাইলো কে ॥
ওরে ভাসুর হইলো মোর সাত সওদাগর
শ্বশুর হইলো মোর দেওয়ানি রে,
তাহারি কারণে বানাইচু রে শাড়িখান
আঞ্চল ছাড়িয়া দে ॥

৩

ওরে অবোধ কালে রে সোয়ামি
কারিয়া রে আনছেন বিয়া (২)
ওরে দেইশনা দেইশনা রে সোয়ামি
ও তোমার পইতানেতে জাগা রে ॥

দুধের দাঁতের বিয়াও করিয়া
যৌবন কালে না চান ফিরিয়া (২)
আরে ও ও মোর সোয়ামি রে ধন
নারীর যৌবন মোর বৃথাই গেলো কাঁন্দিয়া ॥

বাক্স বোঝাই টাকা পয়সা
ও দোষোর বিয়াও করেন দেখিয়া (২)
আরে ও ও মোর সোয়ামি রে ধন
মুঁই থাকিম তোর পৈতানের বালিশ হয়া ॥

প্রাণের বন্ধু ছাড়িয়া গেল
ও হাতের বাঁশি পইড়া রইল রে (২)
আরে ও ও মোর সোয়ামির ধন
মুঁই কাঁন্দিম দেখিয়া দেখিয়া ॥

৪

আজি কিবা কথা কইনেন
ও মোর দ্যাওরা ধরিয়া চালের বাতা
আজি সেই দিন থাকিয়া মন মোর ঝোরে রে
ও মোর দ্যাওরা আজি ঘরে না যায়া থাকা ॥

এই যে গরম ভাতে নুনের ছিটা
ও মোর দ্যাওরা অংগ জ্বইলা যায়
আজি অভাগিনী কাঁন্দিয়া মরে রে
ও মোর দ্যাওরা কাঁয়বা বুঝিবে মনের ব্যথা (২) ॥

এই যে পানি খাবার চানু
ও মোর দ্যাওরা আনিয়া দিলেন দুধ
আজি এই মন করিয়া কায় করিবে দয়া রে
ও মোর দ্যাওরা আজি বুঝিয়া মনের ব্যথা (২)॥
ও তোর দাদায় গেইছে অমপুর শহরে
ও মোর দ্যাওরা মোক গেইছে থয়া

www.pathagar.com

ওরে আইস দ্যাওরা বইসো কাছে রে
ও মোর দ্যাওরা হায় রে কি খাম কি খয়া ॥

৫

আরে ও মাই মোর নয়নের বাঁকা
তোরে বাদে মাই মোর
মন হইলো পাগেলা (২)॥

আজি যেমন মাই তোর মুখে রে আও
আজি তোরে বাদে মাই মুই
ছাড়িনু বাপো রে মাও (২)॥

আজি তোর যেমন মাই ঢালুয়া খোপা
আজি ঐ মতন মোর টেরিয়া সিতা (২) ॥

আজি ঘুককুত মারা মাই ধানের ভুকি
আজি মুচকি মারা মাই তোর
মুখের হাসি (২) ॥

ভাওয়াইয়া গানের জনপ্রিয়তা উত্তরবঙ্গ ছাড়িয়ে বিশ্বময়। তবে এই বিশ্বময়তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ধারার গানের মূলধারা থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়েছে। তাই সমকালীন ভাওয়াইয়া গানের ভাষা আর কেবল রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় সীমাবদ্ধ নেই। প্রমাণ বাংলার কাছাকাছি ভাষায় ভাওয়াইয়ার সুরেও এসেছে নানামুখী পরিবর্তন। কিন্তু গানের বিষয়বস্তুতে সমকালের গল্প প্রাধান্যে কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। যেমন : রচয়িতা ও সুরকার–

গান গাইছেন গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী সুবল বয়াতি, পুঁটিমারী, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

www.pathagar.com

## শ্রী সুবল বয়াতির গান

১.
গোল আলু দেখিয়া, মূলা কাঁন্দে বসিয়া,
বাইগোন কয় জীবন বুঝি যাবে রে (২) ॥

আলু কয় মূলা ভাই মানুষের তো বিচার নাই
আলু কয় মূলা ভাই
আলু কয় মূলা ভাই, মানুষের তো বিচার নাই
আলু, বাইগোনে, মূলার ঘেট বানাইয়া খায়।
গোল আলু দেখিয়া, মূলা কাঁন্দে বসিয়া
বাইগোন কয় জীবন বুঝি যাবে রে... ॥

মুসুর কয়, খেসারি ভাই, আরতো বাঁচার উপায় নাই,
মুসুর কয়, খেসারি ভাই
কপি কয় কদু ভাই জীবনে তো মূল্য নাই
সবাই মিলে বুদ্ধি করি আল্লাকে ডাকাই
গোল আলু দেখিয়া, মূলা কাঁন্দে বসিয়া,
বাইগোন কয় জীবন বুঝি যাবে রে...॥

ও রে, ছিমা হাসে জাঙ্গিতে, পিঁয়াজ কাঁন্দে মাটিতে
ছিমা হাসে জাঙ্গিতে
ছিমা হাসে জাঙ্গিতে, পিঁয়াজ কাঁন্দে মাটিতে
মরিচ কয় সবার জীবন যাবে রে
মরিচ কয় সবার জীবন যাবে রে
গোল আলু দেখিয়া, মূলা কাঁন্দে বসিয়া,
বাইগোন কয় জীবন বুঝি যাবে রে...॥

সব তরকারি বুদ্ধি করি, চলো রান্না ঘরোত মিটিং করি,
ও রে, সব তরকারি বুদ্ধি করি
সব তরকারি বুদ্ধি করি, চলো রান্না ঘরোত মিটিং করি,
লবণ কয় আমি ছাড়া কারোয় গতি নাই
গোল আলু দেখিয়া, মূলা কাঁন্দে বসিয়া,

www.pathagar.com

বাইগোন কয় জীবন বুঝি যায় রে
মূলা কয় সবার জীবন যাবে রে
কপি কয় জীবন বুঝি যাবে রে
ছিমা কয় সবার জীবন যাবে রে
মরিচ কয় জীবন বুঝি যাবে রে ॥

২

অভাবে ভাই স্বভাব নষ্ট রে
এ অভাবে ভাই স্বভাব নষ্ট রে
কুল নষ্ট ভোজনে
বন্ধু নষ্ট টাকা পাইসাত, নারী নষ্ট চলনে
বন্ধু নষ্ট টাকা পাইসাত, নারী নষ্ট চলনে
অভাবে ভাই স্বভাব নষ্ট রে এ-হে-হে-হে
অভাবে ভাই স্বভাব নষ্ট রে...॥

পিড়িত নষ্ট তিতা কথাত, তাঁতি নষ্ট লোভে
ঘন চিপাত লেবু তিতা, জীবন নষ্ট জেদে
ভাই রে, ঘন চিপাত লেবু তিতা, জীবন নষ্ট জেদে
গুয়া খেয়া মুখনা হয় নাল
ও ভাই রে, গুয়া খেয়া মুখনা হয় নাল
ঐ না চুন বিনে রে
অভাবে ভাই স্বভাব নষ্ট রে এ-হে-হে-হে
এ অভাবে ভাই স্বভাব নষ্ট রে...॥

আরে বেশি সাধুই গাজন নষ্ট, মন নষ্ট হয় ধনে
বেশি সাধুই গাজন নষ্ট, মন নষ্ট হয় ধনে
বায়ান বিনে গায়ান নষ্ট, ফসল নষ্ট বানে
ভাই রে, বায়ান বিনে গায়ান নষ্ট, ফসল নষ্ট বানে,
কাওনের ভাতোত সাগাই বেজার
ও ভাই রে, কাওনের ভাতোত সাগাই বেজার
সবাই সেটা জানে রে
অভাবে ভাই স্বভাব নষ্ট রে এ-হে-হে-হে॥
কুল নষ্ট ভোজনে
বন্ধু নষ্ট টাকা পাইসাত, নারী নষ্ট চলনে
বন্ধু নষ্ট টাকা পাইসাত, নারী নষ্ট চলনে।
অভাবে ভাই স্বভাব নষ্ট রে
অভাবে ভাই স্বভাব নষ্ট রে॥

www.pathagar.com

## বিনয় কুমার রাজবংশীর গান

১

ও রে তুই দেওরা মোর সোনার চাঁন
তুই ছাড়া মোল কায় শুনাইবে
অমপুরিয়া ভাওয়াইয়া গান ॥

ও রে পতিধন সোনা মোর ছাড়িয়া গেইছে
মারিয়া পিরিতির বান
ও রে স্বপনে দেখিয়া উঠ মুই কাঁন্দিয়া
কাপে মোর কলিজা খান॥

ও রে তোরনা বাদে আঞ্চলে বাঁন্ধি মুই
থুচু গুয়া-পান
ও রে তাকে খায়া
শুনাও রে দেওড়া মোরে
অমপুরিয়া ভাওয়াইয়া গান॥

২

ও রে আজ জাতীয় শোক/বিজয় দিবস
বাঙালি জাতির ভাই
ও রে বুক ফাটে কলিজা ছিড়ে
জাতির জনক নাই
হায় বুক ফাটে কলিজা ছিড়ে বঙ্গবন্ধু নাই ॥
ও রে এদেশের দুঃখী মানুষের মুখে ফোটাবে মধুর হাসি
ও রে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান
সকলে মিলেমিশে গড়ামো এই দ্যাশ
সোনার বাংলা ভাই।।
সকলে মিলে মিশি গড়ামো এই দ্যাশ
তুলনা যার নাই॥

ও রে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট নরপশুদের হাতে
ও রে জীবন দিলো বঙ্গবন্ধু আর সপরিবারে
ও রে কোলের শিশু শেখ রাসেল
পাইনি যে রেহাই॥

নিজের লেখা গান গাইছেন
বিনয় কুমার রাজবংশী
বেলাইচণ্ডি, সৈয়দপুর, নীলফামারী

## আব্বাস আলীর গান
### জন্ম নিয়ন্ত্রণের গান

১.

ওগো ভাই ভগ্নিগণ ভেবে দেখছো কি কখন
১নং সমস্যা দেশের গণবিস্ফোরণ

www.pathagar.com

তাই করছি নিবেদন ভাই ভগ্নিগণ
ঘরে ঘরে করতে হবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ॥

দিনে দিনে বাড়ছে মানুষ জমিত বাড়ছে না
এমন করে বাড়লে মানুষ উপায় রবে না
মানুষ বৃদ্ধির কারণ পরিবেশ হইতেছে দূষণ
রোগ বালাই ও খুন খারাপি হইতেছে তেমন
ও তাই করছি নিবেদন
ঘরে ঘরে করতে হবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ॥

যদি না করি সংসার ছোট
২০ কটি পার হইলে কে দিবে কৈফিয়ত
ও ভাই থাকতে রে জীবন যেন হয়না রে মরণ (২)
এসো মিলেমিশে রোধ করি আজ গণবিস্ফোরণ॥

২.
ভাই রে কারে আগে কও দুখের কথা
ভাঙ্গি কও তোমাকে
পাগলি একটা বউ করিয়া
মোর গুজড়ান শ্যাষে

ও মুই দিন মনটায় কামাই করি
সাঞ্জের সময় আইসো বাড়ি
কি খিলাইবে ধর পরেয়া
আন্দি খিলাও অখে

ভাইরে দশ দশটা বছর ধরি
বুক ধাকুরি যাওছো করি।
তাও কানে মোর সংসার না ভাসে।
ধারায় ধারায় আনো চাউল
তয় তরকারি নানান সাইল
পত্তি হাটে গোস্ত মাছ
থইলায় না ছারে পাচ
তাও ক্যানে না আটে।

ভাই রে বিচার করি তোমরাই কন
অক ধরি কি হয় গুজরান
আর কতদিন থাকিম ধৈয্য ধরি
মোর কি এটা লোহার শরীল
আইতে দিনে মোরে খাটন
অয় যদি মোর কাহোঁয় নোহায়
আলছে কিসের বাদে।

www.pathagar.com

ভাওয়াইয়া গানের জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে আঞ্চলিক শহরগুলো ছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বাজারজাত ভাওয়াইয়া গান শুনে যদিও এর একমুখী কথা সুরের আধিক্য মেলে তাই বলে বাংলাদেশের জনজীবন এতে অনুপস্থিত নয়। বিশেষ করে তরুণ ভাওয়াইয়া শিল্পীরা চটুল রস প্রধান গানগুলোকে বাজারের জন্য প্রস্তুত করেন ব্যবসায়িক কারণে। এটি সুখকর না হলেও সত্যি যে এর ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে চলমান জীবনদর্শন প্রকাশে সক্ষম ভাওয়াইয়া গানের ঐতিহ্য।

নীলফামারী জেলায় ভাওয়াইয়া পালাগান ও মেয়েলি গীতগুলো সুর মাধুর্যে জনপ্রিয়তার পাশাপাশি গবেষকের নানা তথ্যেরও মাধ্যম। তাই গানগুলো নিয়ে গবেষণায় যোগ হচ্ছে অন্যমাত্রা। এই গান অনূদিত হচ্ছে এ অঞ্চলে নীলফামারী জেলা তথা বাংলাদেশের একটি প্রান্তিক প্রত্যন্ত অঞ্চল ডোমারে। ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে শত শত গান। সৈয়দপুর মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক (অবঃ) দিজেন্দ্রনাথ বর্মণ অনুবাদ করেছেন মহেশচন্দ্র রায়ের একশত জনপ্রিয় গান : তার ১টি নমুনা :

ধীরে বোলাও গাড়ি
Slow drive the cart, O carter
Steady drive the cart.
Have me a sight once more
My kind father's lodge.
Lo, father weeps there
Neighbors cast sighs
Mother howls full-throated
Kitty niece on lap.

Naught I know cooking arranging
**Know not serving decorating**

Dressing vegetables not I
Law-sister scolding all along
Branding me sulky witch
Calling me a clumsy fool.

Me still a two-piece tiny
Long way agrowing
why bring ye cart so early
Leave me here a little longer.

Mum'll nurse me up
*Drag me not any longer*
Tying a rope at my leg.

www.pathagar.com

ধীরে বোলাও[১] গাড়িরে গাড়িয়াল
আস্তে বোলাও গাড়ি
আর এক নজর দেখিয়া ন্যাও[২] মুঁই[৩]
দয়াল বাপের বাড়ি (রে গাড়িয়াল)
দয়াল বাপের বাড়ি ॥

বাপো[৪] কাঁন্দে অই দেখা যায়
আশ্ পড়শী[৫] নিকাশ[৬] ফেলায়
বাচ্চা বইনোক[৭] নিয়া কোলায়[৮]
মাও কাঁন্দে ডুকুরী[৯] রে গাড়িয়াল
মাও কাঁন্দে ডুকুরী ॥

না জানোং[১০] মুঁই আনন্দ-বাড়ন্[১১]
না জানোং মুঁই অশ্বন-পশ্বন[১২]
না পারোং মুই কুটিবার তরকারি
ননেনে[১৩] পারিবে গালি
সদায়[১৪] কইবে মোক ভাকুড়াগালি[১৫]
সদায় কইবে মোক্-
জরম আলশিয়ানী ॥[১৬]

মুঁই হনু[১৭] যে দোকাপুড়ী [১৮]
শিয়ানা[১৯] হবার অনেক দেরি
এলায় ক্যানে আইনেন[২০] গাড়ি ধরি
আর কিছুদিন থুইয়া যাও
পুষিবে পালিবে মাও
না নিগান[২১] মোক
ঠ্যাংগোত্[২২] নাগে[২৩] দড়ি ॥

রচনাকাল : ২৭ চৈত্র ১৩৬১ সন

## ২. পালাগান

বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের পালাগান জনপ্রিয় শাখা। পালাগানে জনপ্রিয়তা আঞ্চলিকভাবে সবচেয়ে বেশি। পালাগানগুলো নানা বিষয়ের। নীলফামারী জেলার সব অঞ্চলের পালা গানের চর্চা অব্যাহত। এ পালা কখনো ইতিহাস, পুরাণ কখনও বা সমকালীন ঘটনা। তবে বর্তমান সময়ে এনজিও পরিচালিত জীবনমুখী নানা কর্মসূচির বাস্তবায়নে পালা গানগুলোর চর্চা অব্যাহত তাই রচিত হচ্ছে নানা সমকালীন বিষয়ে পালাগান। যেমন : কিশোরগঞ্জের পুটিমারিতে রয়েছে কয়েকটি পালাগানের দল। তাদের পরিবেশিত পালাগানগুলোর মধ্যে অন্যতম

www.pathagar.com

সংগীত শিক্ষাগুরু হৃদয় খান, পুটিমারি, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী

সৈয়দপুর বোতলাগাড়ির বীণাপাণি নাট্যগোষ্ঠী, জলঢাকা, ডোমার, ডিমলায় একাধিক পালাগানের দল। নীলফামারীতে মহেশ রায়ের গ্রামেও বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে বেশ কটি দল। তারা বৃক্ষরোপণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ে পালাগান চর্চা করে থাকে। সৈয়দপুরের তরণী কান্ত রায়ের কণ্ঠে এখনও প্রাঞ্জল গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস পালার ভিন্ন উপস্থাপন। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস পালার অংশবিশেষ :

**গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস**

**বন্দনা**

কি দিয়ে পুজিব মায়ের রাঙা চরণ দুখানি॥
চরণ দুখানি মায়ের পদ দুখানি ॥ (গরান)

কে জানে মা তব লিলে জলেতে ভাসিয়েছিলে
মা (২) গো অজ্ঞানকে জ্ঞান দিবে মা,
তুমি মায়া মোহিনী ॥ (গরান)
ডাইনে বাহে মা,
আছে লক্ষ্মী কার্তিক গণেশ পতীমা (২) গো,
সিংহের পৃষ্ঠে আছেন মা গো গণেশ জননী ॥ (গরান)

লক্ষীরূপে বৈকুণ্ঠ ধামে, বামে ছিলে নারায়ণী
মা (২) গো, মানব হয়ে পুজিব মা তোর রাঙাচরণ দুখানি
মা তোর অভয় চরণ দুখানি। (গরান)

www.pathagar.com

পালা গানের সংগ্রাহক ও শিল্পী তরণী কান্ত রায় সৈয়দপুর, নীলফামারী।

**আসরবন্দি গীত**

ও কি ও বান্ধব রে আজি হতে হইলাম ছাড়াছাড়ি॥
তোমার বাড়ি আমার বাড়িও মোর বান্ধব রে
ও বান্ধব মধ্যে বেতের আড়া,
আজি কি নাম তোর মাতা পিতা,
কি নাম তোমারে রে কি নাম তোমারে হে
আজি পরে কি আপন হয় মোর বান্ধব রে ॥ (গরান)

গোপীচন্দ্রের 'সন্ন্যাস' পালার গানের আসর, সৈয়দপুর, নীলফামারী

www.pathagar.com

আমের পাতা মস (২) তৈতলের পাতা সরু বেইচে
বেইচে করেন পিরিত যাহার কমর সরু,
আজি পরে কি আপন হয় মোর বান্ধব রে ॥

**ময়নামতী গীতাভিনয়**

**গীত**

আমার দিন তো বইয়ে গেলো রে ভাই,
ভবনদী কেমনে হবো পার
ও রাজা রানি পেংটা করে লাট মন্দির ঘরে,
তাক জানিলে ডাহিনী ময়না অন্তর ধিয়ানে
ধবল বস্ত্র নিয়ে বুড়ি ময়না পরিধান করিয়া,
গুয়া খোওয়া বিষি নিলে কমরেগুননজিয়া (ঐ) ॥

এক না পানের খিলি নিলে ময়না মুখেতে করিয়া
হেম তালের নাটি নিলে হস্তেতে করিয়া,
খুন (২) করি যাচ্ছে বুড়ি ময়না রাজধানিক নাগিয়া,
কতেক দূর হইতে ময়না কতেক দূর গেলো,
রাজধানীতে যাইয়া ময়না উপণিত হইলো,
যতো ছিলো দর করিয়া লোক উঠিয়া দাঁড়াইল,
করজোর হইয়া ময়নাক প্রণাম জানাইলো ॥ ঐ

**কথা...**

ও গো জননী তব রাঙা চরণে প্রণাম,
এক জোরা পদকা রাজা গলের মধ্যে দিয়া
মায়ের রাঙা চরণে পরিল ঢলিয়া ॥

**ময়না**

ও রে গোপীনাথ জিয় (২) আরি পুত্র বাপধন
ধর্ম্মে দেউক তোক বর,
যতো মন সাগড়ের বালু, এতো আরির বর,
চন্দ্র সূর্য্যে হইল ময়নার দুইকানের কন্ডল,
আপনীইন্দ্র রাজা ডুলাচ্ছে চহর,
বড় (২) জমে দিচ্ছে মাক গালিচা পারিয়া,
জমের বেটা মেখনাদ আছে ছয়টা ধরিয়া,
উজির নাজির বসিলো রাজার বিলাতের চৌনাধারি,
বাইশ না গ্রামের হিসাব নিচ্ছেবিসিং ভান্ডারী
মন তুই হরি বলো রে ॥

**গীত**

মন তুই হরি বল রে হরি (২) বল মন বদন ভইরে।

www.pathagar.com

রূপার খাটে বুড়ি ময়না থুইলে দুকিনা পাও,
সোনার খাটে বুড়ি ময়না গড়েয়া দিছে গাও॥

## ৩. মেয়েলি গীত

মেয়েলি গীত রংপুর অঞ্চলের প্রাচীনতম শক্তিশালী লোকসংগীতের ধারা এর রচয়িতা সুরকার নারী-পুরুষ উভয়ই। বিষয়ের বিচিত্রতার মতো সুরে ততোটা বৈচিত্র্য না থাকলে মেয়েলি গীতের চর্চা নারী-পুরুষ উভয়েই করে থাকে। এগুলো মুখে মুখে প্রচলিত। মেয়েলি গীত দু'ধরনের।

ক. আনুষ্ঠানিক
খ. অনানুষ্ঠানিক

আনুষ্ঠানিক গীতগুলো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে গাওয়া হলেও বস্তুত যে কোনো সময়ে শিল্পীরা এসব গেয়ে থাকেন। তবে সবচেয়ে বেশি বিয়ের অনুষ্ঠানে এ গীতগুলো গাওয়া হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানের গীতগুলোও পর্যায়ক্রম রয়েছে। নিম্নে হাজার হাজার গীতের মধ্য থেকে কয়েকটি করে গীত সংযোজিত হলো :

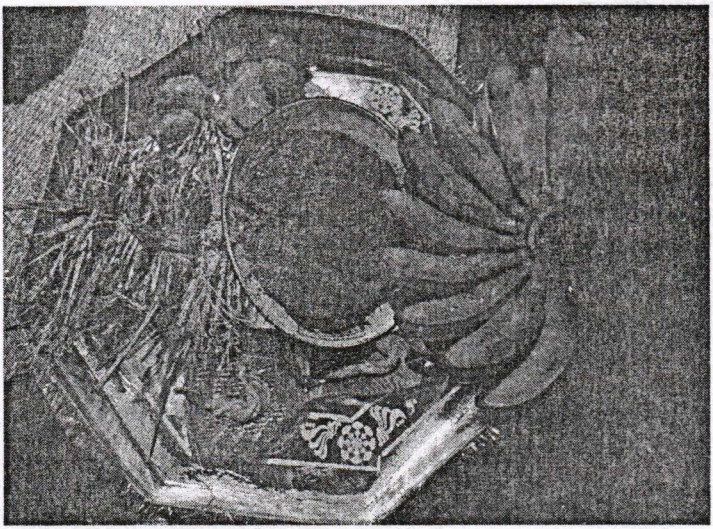

বিয়ের অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান তেওয়ারের ডালা, কয়া, গোলাহাট, সৈয়দপুর।

১.
শিল্পী : উম্মেহানী বেগম
স্থান : কুন্দল

ই এলায় দেখুঁনু কুলারে, ঐ ডোমের বাড়িতে
এলা ক্যানে আলুরে কুলা তুই

www.pathagar.com

বেফুলা তেওয়ারে না রে।

ই এলায় দেখুঁনু পাতরে ঐ কলার গাছোতে
এলা ক্যানে আলুরে পাত্ তুই
বেফুলা তেওয়ারে না রে।
ই এলায় দেখুঁনু কলারে, ঐ কলার গাছোতে
এলা ক্যানে আলুরে কলা তুই
বেফুলা তেওয়ারে না রে।
ই এলায় দেখুঁনু ডুবারে, ঐ আইলের মাথে রে
এলা ক্যানে আলুরে ডুবা তুই
বেফুলা তেওয়ারে না রে।
ই এলায় দেখুঁনু ডিয়াইর রে, ঐ কুমারের বাড়িতে
এলা ক্যানে আলুরে ডিয়াইর তুই
বেফুলা তেওয়ারে না রে।
ই এলায় দেখুঁনু পানরে, ঐ পানাইয়ার দোকানে
এলা ক্যানে আলুরে পান তুই
বেফুলা তেওয়ারে না রে।

[এলায়- এখন; দেখুঁনু- দেখলাম; এলা- এখন; আলুরে- এলে; বেফুলা- অপরিণত; তেওয়ারে- বিয়ের আগে গানবাজনার পুরো অনুষ্ঠানটিকে এক কথায় তেওয়ার বলা হয়; পাতারে- পাতা; ডুবারে- দুর্বাঘাস; আইলের- আলের; মাথেতে- মাথায়; ডিয়াইর- পিদিম; পানাইয়া- পান বিক্রেতা; গুয়া- সুপারি]

২. শিল্পী- শামসুম বেগম
স্থান- কুন্দল

বিয়ের সময় গাঁয়ের মহিলারা গীত গাইছেন, কয়া, গোলাহাট, সৈয়দপুর

www.pathagar.com

কী দেখিস দুল[illegible], পাত্ জোড়ার ভিতি,
এ পাত্ কাটি[illegible]তোর ভাউজ বড়োই ধাগিরি।
কী দেখিস [illegible] তুই, কলা জোড়ার ভিতি,
এ কলা ক[illegible], তোর বইন বড়োই ধাগিরি।
কী দেখিস দুলা তুই, কুলা কোনার ভিতি,
এ কুলা কিনিছে, তোর ভাই বড় ধাগেরা।
কী দেখিস দুলা তুই, ডিয়াইড় জোড়ার ভিতি,
এ ডিয়াইর কিনিছে, তোর বওনাই বাড়োই ধাগেরা।

[দুলা- বর/কনে; ভিতি- দিকে; ভাউজ- ভাবী; ধাগিরি- ছিনাল অর্থে; ধাগেরা- লুইচ্ছা অর্থে ; বওনাই- দুলাভাই; ভিয়াইর- পিদিম]

৩.

শিল্পী- জোবেদা খাতুন
স্থান- কুন্দল

মারোয়ালের চতুর দিয়া, দৈওল বুলবুল করেল্লো
ও শ্বশুর বাবা।
শ্বশুর দ্যাশে গেছিলেন কি কি দানোঁ পাইচেন লেৱা।
ও শ্বশুর বাবা।
হাঁড়ি পাছি, খোড়া পাছি, আরো পাছি ঝাড়ুল্লো
ও শ্বশুর বাবা,
সামিলোত্ বসিয়া পাছি আপন শাশুড়ি দানোল্লো।
ও শ্বশুর বাবা।
ছাওয়া পুরপুরি দ্যাখি দ্যাশে ছাড়ি আছিল্লো
ও শ্বশুর বাবা।
মারোয়ালের চতুর্দিকে...ও শ্বশুর বাবা,
থালি পাছি, বদুনি পাছি, আরো পাছি মান্জুনীল্লো
ও শ্বশুর বাবা।

সামিলোত্ বসিয়া পাছি, চাছী শাশুড়ি দানোল্লো।
ও শ্বশুর বাবা।
ছাওয়া পুরপুরি দেখি দ্যাশে থুইয়া আছিল্লো।
ও শ্বশুর বাবা।

[দৈওল- দোয়েল; মারোয়ালের- তেওয়ারে বসার পিড়ির চারপাশ; দানোঁ- দান; খোড়া- বাটি; পাছি- পেয়েছি; সামিলোত্- মজলিশে; ছাওয়া পুরপুরি- ঘন ঘন যার বাচ্চা হয়; বদুনী- বদনা; মান্জুনী- যে মাজে; চাছী- চাচি; থুইয়া- রেখে]

৪.

শিল্পী- উম্মেহানী বেগম
স্থান- কুন্দল

ঘুরো ঘুরো ঘুরো হে দুলা ঐ আগিনার মাজে
আরে ফিরো ফিরে হে দুলা ঐ আগিনার মাজে।

www.pathagar.com

দশ হাতি ধুতি খান মোর বাচ্ছার ঘিরানী খান
আরে ঘুরো ঘুরো ঘুরো হে দুলা ঐ আগিনার মাজে
ফিরো ফিরো ফিরো হে দুলা ঐ আগিনার মাজে।

শ নাগুক পঞ্চাশ নাগুক বাবা হামার দিবে রে
আরে ঘুরো ঘুরো হে চাইলোন ঐ আগিনার মাজে
ফিরো ফিরো ফিরো হে দুলা ঐ আগিনার মাজে।
হাজার নাগুক পঞ্চাশ নাগুক ভাইয়া হামার দিবে রে
আরে ঘুরো ঘুরো ঘুরো হে দুলা ঐ আগিনার মাজে
ফিরো ফিরো হে দুলা ঐ আগিনার মাজে।

আগিনার- উঠানে; নাগুক- লাগুক; মাজে- মাঝে; হামার- আমাদের; বাচ্ছার- বাচ্চার; দিবে রে- দেবে; থিরানী- প্যাঁচানো]

৫.

শিল্পী- শামসুম বেগম

স্থান- কুন্দল

খাটোখুটো হ্যামেচ্চায়ও
মোর হ্যামেচ্চার লম্বা লম্বা পাত্
কে হ্যামেচ্চায়ও।
গাবরুর বওনাই সাজিয়া বেড়াইল্ লে
কুকুর বরণ গাও, কি হ্যামেচ্চায়ও।
ধরো কুকুরোক্ বাঁন্দো ঢোকায় মাজে
কি হ্যামেচ্চায়ও।

খাটোখুটো...কি হ্যামেচ্চায়ও।
ঐ বিলাই বরণ গাও কি হ্যামেচ্চায়ও
ধরো বিলাইক বাঁন্দো পইয়ের মাঝে
কি হ্যামেচ্চায়ও।
চাবাউক টোংড়া দেখুক সর্বলোক কি হ্যামেচ্চায়ও।

[হ্যামেচ্চায়ও- হেলেঞ্চার গাছ; গাবরুর- বরের; বওনাই- বোন জামাই; বরণ- বর্ণ; বাঁন্দো- বাঁধে; ঢোকার- খুঁটির; চাবাউক- চিবানো; টোংড়া- হাড়; বিলাই- বিড়াল]

৬.

শিল্পী- উম্মেহীন বেগম

স্থান- কুন্দল

বড়ো ঘর হাতে বেড়াইলো, সোনার ঝুল মোর,
বড়ো ঘর করে ঝলোমলো।

www.pathagar.com

ন্যালেয়া ন্যালোয়া হাটে সোনার ঝুল মোর
মায়ের পেরানে কতোর ধরে।
তরইলর ঝিকিমিকি বন্দুকের সাঁও
ঘর হাতে বেড়াইলো দুলা পূর্ণিমার চান।
ন্যালেয়া ন্যালেয়া হাটে সোনার ঝুল মোর
বড়ো ঘর করে ঝলোমলো।

দুলাক্ বাইর করো রে, দুলাক্ বাইর করো রে
শাড়ির আনছোলে দুলাক্ বাইর করো রে।
আইজ ক্যানে দুলার মাথা, শাড়ি আনছোল ঢুলে রে
আস্তে করিয়া দুলাক্ বাহি রো করো
ধীরে ধীরে করিয়া দুলাক বাহি রো করো।

বিয়ের সময় গাঁয়ের মহিলারা গীত গাইতে গাইতে ঘর থেকে
কনেকে বের করে আনছেন কয়া, গোলাহাট, সৈয়দপুর

[হাতে- হাতে; বেড়াইল- বেড় হলো; ন্যালেয়া- দুর্বলভাবে; পেরানে- প্রাণে; কতোয়- কতো; বাফেরা- বাবার; সাঁও- শব্দ; দুলাক্- দুলাকে; অন্‌ছলে- আঁচলে; বাইরে- বাহির; ঢুলেরে- দোলেরে]

৭.

শিল্পী- শামসুম বেগম

স্থান- কুন্দল

কইনা দেখিবার গেছিলেন দেওরা ক্যাংকা
কইনার মুখো হাউসে রো দেওরা, অঙ্গে রো দেওরা।

www.pathagar.com

কইনা রো না মুখখান ভাবি পান খাওয়া বাট্টা।
হাউসের ভাবি, অঙ্গেরও ভাবি।

হয় না-না হয় পান খাওয়া বাট্টা পান খাওয়া যাইবে
হাউসের দেওরা, অঙ্গেরও দেওরা।

কইনা দেখিবার গেছিলেন দেওরা ক্যাংকা কইনার মাথা
হাউসে রো দেওরা, অঙ্গেরও দেওরা।
কইনা রো না মাথা ভাবি গবর ফ্যালা ডেলী
হাউসেরও ভাবি, অঙ্গেরও ভাবি।

হয় না না হয় গবর ফ্যালা ডেলী গবর ফ্যালা যাইবে
অঙ্গেরও দেওরা, হাউসেরও দেওরা।

কইনা রে না কানো ভাবি ধান ঝাড়া কুলা
হাউসে রো ভাবি, অঙ্গেরও ভাবি।
হয় না না হয় ধান ঝাড়া কুলা, ধান ঝাড়া যাইবে
হাউসে রো দেওরা, অঙ্গেরও দেওরা।
এভাবে, নাক- বন্দুকের নলা, হাত কতরাই
কষা হাতা, পিঁঠি- কাপড় ধোওয়া পিঁড়া,
টিকা- তাম্বু মারা উড়ুন এবং ঠ্যাং- নম্পো
থোয়া ঠগা।
(প্রতিটি অঙ্গ নিয়ে ৬ লাইনের এক একটি প্যারা ভাবি ও দেবরের জবানিতে গাওয়া হয়।)

[কইনা- কনে; বাট্টা- বাটা; ক্যাংকা- কেমন; দেওর- দেবর; হাউসেরো- সখের/আদরের; ডেলী- ডালি; অঙ্গোরো- রঙের; কানলা- কানগুলো; তরকাই- তরকারি; পিঠি- পিঠ; টিকা- পাছা; তাম্বু- তামাক; উড়ুন- চিড়া, হলুদ ইত্যাদি বাটার জন্য হামান দিস্তার মতো কাট নির্মিত হাত চালিত ঢেকি বিশেষ; ঠ্যাং- পা; নম্পো- কুপি; থোয়া- রাখা; ঠগা- কাঠ নির্মিত কুপি রাখার দণ্ড]

৮.
শিল্পী-
উম্মেহানী বেগম

ইঁ আড়ার বাঁশ কাটিয়া রে বৈদা,
ইঁ আড়া কললু ধুয়া রে বৈদা।
ইঁ মুই কিনা জানোঁ রে বৈদা।
ইঁ সতিন বসাবু রে বৈদা
ইঁ একবা সিতের সেন্দুরা রে বৈদা
দুইঁ দুইবা সিতাত কললু বৈদা।

ইঁ আড়ার বাঁশ...সতিন বসাবু রে বৈদা।

www.pathagar.com

ইঁ একবা পিন্দো শাড়িয়ারে বৈদা।
ইঁ দুইবা পিন্দো করুবু রে বৈদা।

এভাবে বউয়ের নিত্যব্যবহারী সমস্ত জিনিসের বর্ণনা দেওয়া হবে স্থানীয় মতো। সুরের কোনো পরিবর্তন নেই।

[আড়ার- বাঁশের ঝোপ; বৈদা- বন্ধু; বললু- করলে; ধুয়া- নিশ্চিহ্ন; বসাবু রে- বসাবে; একবা- এক; সিতের- সিঁথির]

৯.

শিল্পী- জোবেদা খাতুন
স্থান- কুন্দল

সোনার খড়ম পায়ে, ওই দিয়া রে, মুই হলদি নিবার গেনু
ওরে ছি হলদি তোক্, কিসোক নাগিয়া উনু।
এক চাপা হলদি, ঐ বাদে রে মুঁই মাওক বন্দুক থুনু
ঐ ছি রে হলদি তোক, কিসোক নাইগা উনু।
ঐ মাথায় পাগুড়ি বন্দক থুইয়া রে
মুঁই মাওক উদ্ধার কননু।

(এভাবে একচাপা হলদির জন্য চাচি, মামি, খালা প্রভৃতি মাতৃস্থানীয়দের বন্ধক রেখে আবার নিজের ঘড়ি আংটি, সাইকেল ইত্যাদির বিনিময়ে তাদের উদ্ধার করে বর।)

[নিবার- নেয়ার জন্য; গেনু- গেলাম; কিসোক- কিসের জন্য; নাগিয়া- লাগিয়া/জন্য; উনু- রোপন করলাম; বাদে রে- জন্যে; নাইনা- লাগিয়া; থুইয়া রে-রেখে; কননু- করলাম]

১০.

শিল্পী- উম্মেহানী বেগম

স্থান- কুন্দল

কাছা কাছা হলদি, ও মা মোর দীগোল (২) মাইজো
কাতে না বানিমো রে ও মা বাচ্ছা হলদি।
কইনার মায়ের আছে রে, ও মা মোর চৌয়ামৌয়া উডুনটা
গাবুরার বাপের আছে রে, ও মা মোর সোরা হলদি।
তাতে না বানিমো রে ও মোর বাচ্ছা বাচ্ছা হলদি।

কাছা কাছা হলদি, ও মা মোর দীগোল (২) মাইজো
কাতে না বানিমো রে, ও মা থুবুরার হলদি।
কইনার চাচির আছে রে, ও মা চৌয়ামৌয়া উডুনটা
গাবুরার চাচার আছে রে, ও মা সোরামোরা গাইনাটা
তাতে না বানিমো রে ও মোর থুবুবার হলদি।

www.pathagar.com

ডাকে আনো তো, জলনীয়া মাওকে
দিয়া যাউক বোল সোনার মুখে হলদি রে।
ফুটি উঠুক সোনার মুখত শ্রী রে।
ডাকে আনো তো সোনার বাবাখে
দিয়া যাউক বোল সোনার হাতে হলদিরে
ফুটি উঠুক সোনার হাতের শ্রী রে।
ডাকে আনো বালার বইনোখে...।
এভাবে, বর/কনের সম্পর্ক বড়োদের একে একে ডেকে হাতে, মুখে হলুদ লাগানোর কথা বলা হবে।

ডাকে- ডেকে, আনো তো- নিয়ে এসো, জলনীয়া- জননী, যাউক বোল- যাক এসে, বাবাখে- বাবাকে।

কাছা-কাঁচা, দিগোল- দীঘল, মাইজো- টুকরো, কাতেনা- কিসে, বানিমো- থেতলানো/বাটবো, চৌয়ামৌয়া- উড়ুনটা, সোরামোরা-, তাতোনা- সেটাতে।

১১.

শিল্পী- শামসুম বেগম

স্থান- কুন্দল

মুখ ধুইয়া গেলো ময়না বাবার আগে রে
ঐ বাবার ছিলো তুলিয়া নৈইলো কোলে রে
এমন সুন্দর ময়না বেটি, যাইবে পরার বাড়ি রে
ঐ বাপের মন মোর আপেনে ঝুরে রে
ঐ হাত ধুইয়া ময়না গেলো মায়ের আগে রে
ঐ মায়ে ছিন্ তুলিয়া নেইল্ কোলে রে
এমন সুন্দর ময়না বেটি যাইবে পরার বাড়ি
ঐ মায়ের মন মোর আপেনে ঝুরে রে।

(এভাবে, ভাই-বোন, চাচা-চাচি, মামা-মামি ইত্যাদি নিকটাত্মীয়দের কাছে যাবে কইনা (কনে)।)

[নেইল- নিলো; আপেনে- এমনিতেই; আগে রে- সম্মুখে]

১২.

বালা কই পরে তোর মায়ের চৌখের পানি রে
বালা আনিয়া দেউক বোল ধানী আকালীর পানির
বালা পড়িয়া যাউক বোল মায়ের চৌখের পানির

পরবর্তী অন্তরাসমূহের সুর স্থায়ীর মতোই। কথা প্রথম লাইনের 'মায়ের শব্দটির জায়গায় হবে। বাবা, চাচা, নানা, নানি প্রভৃতি।

গুরুজন সম্পর্কের আত্মীয়ের কথা।

www.pathagar.com

১৩.
শিল্পী- উম্মেহানী

ঘাটায় ঘাটায় রে আলিপোন ফোঁটা
গাবরুর বাপটা রে ন্যাবেরা চাটা
চাটিয়া উঠাইলে রে আলিপোন ফোঁটা।

ঘাটায় ঘাটায় রে আলিপোন ফোঁটা
গাবুরুর চাচাটা রে ন্যাবেরা চাটা।
চাটিয়া উঠাইলে রে আলিপোন ফোটা।
এভাবে, মামাকে সম্বোধন বারে উপরের প্যারার
মতো একই সুরে গাওয়া হয় পরবর্তী অন্তরা।

[ঘাটায়- রাস্তায়; আলিপোন ফোঁটা- আলপোনা;
গাবুরু- বর; চাটিয়া- চেটে; ন্যাবেরা- ময়লা অর্থে]

ফুরল ডুবাতে পুকুরে যাচ্ছেন গাইয়ের দল কয়া, গোলাহাট, সৈয়দপুর

১৪.
শিল্পী- মোছা আঞ্জুআরা
স্থান- কুন্দন

ও কি বাবাল্লো, ও কি দূরো দ্যাশে
বাবা না খানও ব্যাছেয়া।
কি বাবাল্লো, গেইতে আরো আইসতো
বাবা ওইদ গাওত নাগিবে।


www.pathagar.com

ও কি বেটিল্লো, ঘাটায় আরে ঘাটায়
ও কি শায়মেনা টাঙ্গিমো।
ও কি ভাইয়াল্লো...ব্যাছেয়া।
ও কি ভাইয়াল্লো গেইতে আরো আইসতে
ভাইয়া ভোগ বড় নাগিবে।
ও কি বইনেল্লো ঘাটায় আরো ঘাটায়
হোস্টিলো বসামো।
ও কি বওনাইল্লো...ব্যাছেয়া।
ও কি বওনাইল্লো গেইতে আরো আইসতে
বওনাই বড়োই পিয়াইস নাগিবে।
ও কি শালিল্লো, ঘাটায় ঘাটায়
ইন্দিরা বসামো।

[বাবাল্লো- বাবাগো; ব্যাছেয়া- বিক্রি করা এখানে/ বিয়ে দেয়া অর্থে; গেইতে- যেতে; ওইদ- রোদ; শায়মেনা- শামিয়ানা; হোস্টিলো- হোটেল; ইন্দিরা- বড়ো কুয়া]

শিল্পী- শামসুম বেগম

কইনার মায়ের সান বান্দা ডিগি
ঐ সেও ডিগিত্ বোয়াইল মাছের হাঁড়ি
ঐ সেও ডিগিত্ জাল ফেলাইতে পারি।
কইনার চাচার সান বান্দা ডিগি
ঐ সেও ডিগিত সউল মাছের হাঁড়ি
ঐ সেও ডিগিত পলাই ছাবাইতে পারি।
কইনার চাচার সান বান্দা ডিগি
ঐ সেও দিগিত গোতা মাছের হাঁড়ি
ঐ সেও দিগিত কাদো ঘেন্টিতে পারি।

[ডিগি- দিঘি, সউল- শোলমাছ; পলাই- বাঁশ নির্মিত মাছ ধরার ঝাঁপি; কাদো- কাদা; ঘেন্টিতে- হাত দিয়ে কাদায় মাছ ধরা(?)]

শিল্পী- আঞ্জুআরা
স্থান- কুন্দল

আমের পাতা হড়োমড়ো সারুভাই
তেইতোলের পাতা যে সরু
আস্তে করি চালান ডিঙ্গা সারুভাই
মায়ের কারুণা হে শুনি।
কি শুনিব মায়ের কারুণা কইন্যা
আপনার দ্যাশে হে চলো

www.pathagar.com

তোমার মায়ের চায়া ওহে কইন্যা
আমার মাও যে ভালো।
তোমার মাওক মাও ডাক দিলে সারুভাই
খরগোশে করিবে রে আও।
[তেইতোলের- তেঁতুলের; কারুনা- বিলাপ; আও- কথা]
শিল্পী- শফিকুল ইসলাম

কাছা হলদি ডগরে মগ, নাল সরিসার তেলরে
চীপ বয়া পইলো্ নারীর ঘাম
হায় বুক বয়া পইলো নারীর ঘাম।

কইনার মাওটাক দেখিয়া রে আইলাম
নাইড় কাটা দাইয়ানী রে
পিঠ বয়া পইলো নারীর ঘাম
বুক বয়া পইলো নারীর ঘাম।
কাচা হলদি...নারীর ঘাম
কইনার বাপটাকে দেখিয়া রে আইলাম
জোতা সিলাই করা মুছি রে
জোতা বয়া পইলো... ঘাম।
(এভাবে কইনার চাচা-চাচি, ভাই-বোনকে বিভিন্ন নিম্ন শ্রেণির পেশাজীবীর মাঝে দেখে দেখে সুর বাঁধে।)
[নাইড়- নাড়ি; দাইয়ানী- দাই; চীপ বয়া- চোয়াল বয়া; নাল- লাল; জোতা- জুতা]
শিল্পী- গেট্টু
স্থান- কিশোরগঞ্জ

সরু সরু বাইগোন মা মুঁই তালোতে ভাজুনুঁ রে
সরু সরু বাইগোন মা মুঁই ঘিয়োতে ভাজুনুঁ রে
ভ্যাকরাকোকরা বাইগোন মা মুঁই কোছাতে ভুরুনুঁ রে
আরে দৌড় দিয়া যাইতে মা মুঁই হ্যারের ফ্যালনু রে
আরে একশো টাকার সেন্দুরা মা মুঁই সিতাতে ভরিনু রে।
দৌড় দিয়া যাইতে মা মুঁই মুছিয়া ফ্যালানুঁ রে
আরে লক্ষ টাকার ফুল মা মুঁই নাখোত পড়িনুঁ রে
দৌড় দিয়া যাইতে মা মুঁই হ্যারেয়া ফ্যালানুঁ রে।
একশ টাকার হারোয়া মুঁই গলেতে পড়িনুঁ রে।
দৌড় দিয়া যাইতে মা মুঁই ছিড়িয়া ফ্যালানুঁ রে।
[বাইগোন- বেগুন; ভ্যাকরাকোকোরা- আঁকাবাঁকা (?); কোছাতে- কোলের কাছে শাড়ির আঁচলে তৈরি গুপ্ত ব্যাগ; হলফোলা- লকলকা অর্থে; হ্যারেয়া- হারিয়ে; নাখোত- নাকে]

www.pathagar.com

শিল্পী- গেট্টু
স্থান- কিশোরগঞ্জ
হাত্তি আইলো দিম দিম করিয়া
পালকি কতো দূরে রে
অসের অসিয়া দামাল
আস্তে করিয়া নামান পালকি
বাবার খুলি জোন ভাঙ্গেনা রে
অসের খুলি যোন ভাঙ্গেনা রে।
জড়িমানা হইবে রে।
(এভাবে ভাইয়ের খুলি দিয়ে গেলে জড়িমানা হবে। পরবর্তী সুর স্থায়ীয় মতোই।)
[হাত্তি- হাতি; দিমদিম- হাতির পায়ের চলার শব্দ; অসের অসিয়া- রসের রসিয়া; খুলি- বাড়ির প্রাচীরের বাইরের প্রাঙ্গণ]
শিল্পী- গেট্টু
স্থান- কিশোরগঞ্জ

মা মুঁই হাউয়া তমিজের মাইয়া আরো হওঁ
মা মুঁই মাথার বিষে মইরা আরো যাওঁ
মা মুঁই একটোপ ত্যাল পাইলে মাথাতি আরো দেও
মা মোঁক শিবুর বাড়িটা দ্যাখে আরো দ্যান
মা মুঁই এক টোপ ত্যাল পাইলে খুঁজি আরে নেওঁ।

মা মুঁই পাগেলা তমিজের মাইঁয়া আরো হওঁ।
মা মুঁই প্যাটের ভোকে মরিয়া রে যাওঁ
মা মুঁই একগাস ভাত পাইলে খুঁজি আরো খাঁও
মা মোক দেবুর বাড়িটা দ্যেখেয়া রে দ্যাওঁ।
[মইরা- মরে; টোপ- ফোটা; ভোকে- ক্ষুধায়]
শিল্পী : গেট্টু
স্থান : কিশোরগঞ্জ

মোরা কাঁন্দে মুরি রে কাঁন্দে
মোর মোরাবা কাঁন্দে রে শুইয়া
ঐ দ্যাশের কিষাণ বিদেশে গেইলে রে
মোর খাংকা হইবে রে ধুয়া।

মোর কাঁন্দে...শুইয়া।
ঐ দ্যাশের মাস্টার বেদেশে গেইলে রে

www.pathagar.com

মোর স্কুল হইবে রে খালি।
মোর স্কুল হইবে রে ধুয়া।

মোরা কাঁন্দে... শুইয়া
ঐ দ্যাশের মোলবি বেদেশে গেইলে
মোর জুম্মা হইবে রে খালি
মোর মোক্তব হইবে রে ধুয়া।
[মোরা- ; খাংকা- খানকাঘর; ধুয়া- শূন্য]
শিল্পী : শফিকুল ইসলাম
স্থান : সোনাপুকুর

খাটো খুটো কলার গাছও স্বামীধন
সারা আগিনায় ছেয়া রে
দূরের ভাউজ মোক্ নিগিবার আইচ্ছে
স্বামীধন একবার হুকুম দেও রে।

আরে তুই সুন্দুরী চলিয়া গেইলে কালে
কায় আন্দিবে ভাতও রে
সাতো দিনকার ভাতো ওরে স্বামীধন
এখে দিন আন্দিম রে।

খাটো খাটো...ছেয়া রে।
আরে দূরের ভাই মোক নিগিবার আইচ্ছে
স্বামীধন একবার হুকুম দেও রে
আরে তুই সুন্দুরী চলিয়া গেইলে
কায় করিবে বিছিনা রে।
খাটো খুটো... ছেয়া রে।
ঐ দুবের চাচি মোক নিগিবার আইচ্ছে স্বামীধন
একবার হুকুম দেও রে।
আরে তুই সুন্দরী চলিয়া গেইলে কালে
কায় আওতাইবে মুরগি রে।
আরে সাতে দিনকার মুরগি ওরে স্বামীধন
এখে দিন আওতাইমোঁরে।

(এভাবে, বউয়ের এক একজন আত্মীয়স্বজন আসবে নিতে কিন্তু বর সংসারে নানা কাজের কথা যেমন আগিনা সান্টা, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি অযুহাত দেখাবে।)

[করিমোঁ রে- করবো; আওতাইবে- ঢুকিয়ে রাখবে; সাত্যে- সাত; সান্টা- ঝাড়ু দেওয়া]
শিল্পী : জোবেদা খাতুন
স্থান- কুন্দনা

www.pathagar.com

পুকুরের পানিতে ফুরল ডুবাতে ডুবাতে গীত গাইছেন শিল্পীরা কয়া, গোলাহাট, সৈয়দপুর

চাকোলো চুকোলো পক্ষলো পানি
কাগায় না খায় এ ডিগির পানি,
দাদা হামার এ গাঁয়ের সদ্দার
তারে হুকুমে তেলো ডিগির পানি।

চাকোলো চুকোলো পক্ষলো পানি
কাগায় না খায় এ ডিগির পানি,
বাবা হামার এ গাঁয়ের সদ্দার,
তারে হুকুমে তোলো ডিগির পানি।

চাকোলো চুকোলো পক্ষলো পানি
কাগায় না খায় এ ডিগির পানি,
ভাইয়া হামার এ গাঁয়ের সদ্দার,
তারে হুকুমে তোলো ডিগির পানি।
[চাকোলো/চুকোলো- ছলকে ছলকে যে পানি পড়ে; পক্ষলো- পুকুর; কাগায়- কাকে; ডিগির- দিঘির; হামার- আমাদের; সদ্দার- সর্দার]
শিল্পী : শামসুম বেগম

সই অরন জঙ্গলে রে এ ফুলও ফুটিলো
ওই বিনা বাতাসে এ গন্ধ ছুটিলো

www.pathagar.com

কইনা গাবরুর ব্যাপটারে এ কড়ির কাঙ্খোনা
সোনার ফুরল থাইকতে রে মাটির ফুরল বেসাইলো।
ঐ অরন জঙ্গলে রে এ ফুলে ফুটিলো
ওই বিনা বাতাসের এ গন্ধ ছুটিলো
গাবরুর/কইনার মাওটার এ কড়ির কাঙ্খোনা
উপার ফুরল থাইকেতে রে মাটির ফুরল বেসাইলো।
[কড়ির- টাকার; কাঙ্খোনা- কৃপণ; উপার- রূপার]
শিল্পী : জোবেদা খাতুন

ঐ ফুরল যায় রে ফুরল যায় আজার খুলি দিয়া
আজার বেইছছাটা রে বসিয়া আছে
ধোকোরা আওড়াল দিয়া।

ঐ ফুরল যায় রে ফুবল যায় হোদার খুলি দিয়া
হোদার বেইছ্ছাইটা বসিয়া আছে
ধোকোরা সিপল দিয়া।
[বেইছ্ছাটা- বউটা; ধোকোরা- ছেঁড়া চট; আওডাল- আড়াল; ধোকোরা সিপল- চট্ নির্মিত ছিপি]
শিল্পী : জোবেদা খাতুন

আরে ফুল বেড়েন্দা বাঁশি।
কানাইয়া বাজায় বাঁশি।
আরে যে ঘাটে ডুবামো রে ফুরল
সেই ঘাটের কাছারি।
আরে গাবরুর ভাইটা সাজিয়া রে বেড়াইল
ভাঙ্গিব কাছারি।

আরে ফুল...বাঁশি।
আরে যে বাপটা সাজিয়া রে বেড়াইল
ভাঙ্গিবে কাছারি।
(এভাবে, গাবরুর মামা, চাচা একে একে কাছারি ভাঙবে।)

www.pathagar.com

ফুরল ডুবিয়ে গীত গাইতে গাইতে ঘরে ফিরছেন শিল্পীরা কয়া, গোলাহাট, সৈয়দপুর

নীল অরন্ত বসন্ত জ্বলে
ভোমরা পইলো মোর ডালে রে, ময়না কাঁন্দে।
তেইতো ময়না করুণা করে দয়ার আবক্ষার আগে রে
ময়না কাঁন্দে।
থালি দিয়াছিন গাদি গাদি, মানজুরি নাই সে সঙ্গে রে
ময়না কাঁন্দে।
নীল অরন্ত বসন্ত জ্বলে
ভোমরা পইলো মোর ডালে রে, ময়না কাঁন্দে।
তেইতো ময়না করুণা করে দয়ার ভাইয়ার আগে রে ময়না কাঁন্দে।

কইমুরা মায়ের আয়না থানি বায়না রে, হাত ঝুমঝুম করে
কইনার মায়ের দারোগার সাথে ভাবে রে, হাত ঝুম ঝুম করে,
তারে হাতের ন্যাদেরা ন্যাদ রে বেটি রে, হাত ঝুম ঝুম করে,
সেও বেটিকে রিফকুল পালেয়া নিগাইল রে হাত ঝুমঝুম করে।

এভাবে পরবর্তী অন্তরাগুলোতে একই সুরে (মনর) চাচি, মামি, ভাবির সাথে দারোগা, মেম্বার প্রভৃতি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কের কথা বলা হবে।

আরে যায় সোনারু লুচ্চা সড়ক দিয়া
সোনা রূপা মোর কে?
আরে ডাক দিব মান বাবার খোলতার মাঝে
সোনা রূপা মোর কে?
আরে বাছিয়া নেমো চল্লিশ জোড়া ঘুগুরা
সোনা রূপা মোর কে?

www.pathagar.com

আরে পড়িয়া দিমু বইনার মায়ের পায়ে
সোনা রূপা মোর কে?
আরে হাঁটিয়া যাইতে বাজবে তালে তালে
সোনা রূপা মোর কে?
আরে যায় সোনারু লুচ্চা সড়ক দিয়া
সোনা রূপা মোর কে?

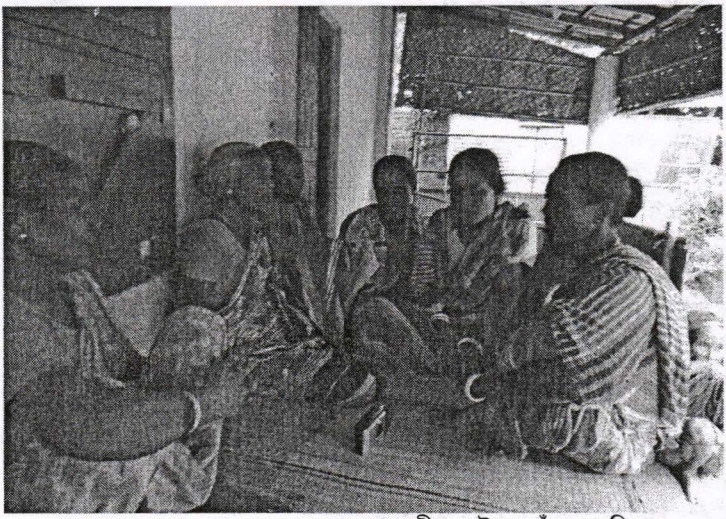

কাজের অবসরে ঘরের দুয়ারে বসে গান গীত গাইছেন গাঁয়ের মহিলারা
পুঁটিমারি, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

দোলা মাটির বতুয়া রে মোর বতুয়া
হলফল করে পানিকা ঢোলে।
কইনার মাওটা হারেয়া গেল সন্ধ্যা
হুরের মাঝে পানিকা ঢোলে।
হ্যাচাক নিয়া খুঁজিয়া বেড়াই
পাওয়া নিকিন যাবে, পানিকা ঢোলে।
খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল
দারোগা বাবুর কোলে পানিকা ঢোলে।
দারোগা বাবুর কোলে বইসা
গালে চুমা মারে, পানিকা ঢোলে।
হাতি না বান্দে মাহুত রে আরে ও মাহুত
মধুর লোভে ঘাটে রে।
গাও ঢুলায় মোর সোনার মাহুত রে
পাও ঢুলায় মোর সোনার মাহুত রে।

www.pathagar.com

কেনে না কাঁন্দেন কইনা হে,
আরে ও কইনা ধুলায় গইরো দিয়া রে।
গাও ঢুলায় মোর সোনার মাহুত রে
পাও ঢুলায় মোর সোনার মাহুত রে।
হামরা না কাঁন্দি সাধু হে,
আরে ও সাধু চাপ দাড়ি দেখিয়া রে।
গাও ঢুলায় মোর সোনার মাহুত রে
পাও ঢুলায় মোর সোনার মাহুত রে।
চুপো না চুপো কইনা হে,
আরে ও কইনা যাব নাপিতের বাড়ি রে।
গাও ঢুলায় মোর সোনার মাহুত রে
পাও ঢুলায় মোর সোনার মাহুত রে।
আতি না পোহাইলে কইনা হে,
আরে ও কইনা হমো নতুন চেংরা রে।
গাও ঢুলায় মোর সোনার মাহুত রে
পাও ঢুলায় মোর সোনার মাহুত রে।
ডালিমের গাছে ডালিম ধরে,
ডালিমের গাছ মোর হেইলা পড়ে
ওকি হায় হায় শেফালি নাইওর যাইতাম।
শ্বশুর আবক্ষা নিগিবার আচ্চে,
কালা দেখি ছাড়ি গেইছে।
ওকি হায় হায় শেফালি নাইওর যাইতাম।
ডালিমের গাছে ডালিম ধরে,
ডালিমের গাছ মোর হেইলা পড়ে
শাশুড়ি আম্মা নিগিবার আচ্চে,
ফোকলা দেখি ছাড়ি গেইছে।
ওকি হায় হায় শেফালি নাইওর যাইতাম।
বড় দেখিবার আসছে, দেখিয়া ধরি গেইছে।
ওকি হায় হায় শেফালি নাইওর যাইতাম।
ডালিমের গাছে ডালিম ধরে,
ডালিমের গাছ মোর হেইলা পড়ে
ওকি হায় হায় শেফালি নাইওর যাইতাম।

বেলা ওঠে ছিলকো দিয়া, নাচে বালি মোর ধমকো দিয়া
মায়ের মতন সে শাশুড়ি পাইলে দূরের মায়া মোর পাশরি যাইবে।
বাপের মতন শ্বশুর সে পাইলে দূরের মায়া মোর পাশরি যাইবে
বেলা ওঠে ছিলকো দিয়া, নাচে বালি মোর ধমকো দিয়া
ভাইয়ের মতন দেওর সে পাইলে দূরের মায়া মোর পাশরি যাইবে

www.pathagar.com

বোনের মতন ননদ সে পাইলে দূরের মায়া মোর পাশরি যাইবে।
বেলা ওঠে ছিলকো দিয়া, নাচে বালি মোর ধমকো দিয়া।

তোমার কে গো আছে দরদি কায় বানিবে দলদি
আমার ভাউজি আছে দরদি, তায় বানিবে হলদি।
তোমার কে গো আছে দরদি কায় বানিবে দলদি
আমার বোন আছে দরদি, তায় বানিবে হলদি।
তোমার কে গো আছে দরদি কায় বানিবে দলদি
আমার মামি আছে দরদি, তায় বানিবে হলদি।
তোমার কে গো আছে দরদি কায় বানিবে দলদি
আমার দাদি আছে দরদি, তায় বানিবে হলদি।
তোমার কে গো আছে দরদি কায় বানিবে দলদি
আমার নানি আছে দরদি, তায় বানিবে হলদি।
তোমার কে গো আছে দরদি কায় বানিবে দলদি
আমার চাচি আছে দরদি, তায় বানিবে হলদি।
লাউ ঝুমঝুম করেছে, জাঙ্গি ভাঙ্গি পড়েছে
এতো বয়সের কন্যা তুই আছিলু কার ঘরতে।
তোর বাপের শরম নাই, বিয়া দিবার পায় নাই
টাকা দিবার হাতাসে, ধুমরি করছে ঘরতে।
লাউ ঝুমঝুম করেছে, জাঙ্গি ভাঙ্গি পড়েছে
এতো বয়সের ধুমরি রে তুই আছিলু কার ঘরতে।
তোমার ভাইজের মুখে শরম নাই,
ভাইয়ের আগে কয় নাই।
দান দিবার হাতাসে, ধুমরি করছে ঘরতে।

তক্তার উপর চড়িয়া আরস কাঁন্দে জারে জারে রে
কেবা আমায় হলুদ মাকাবে রে।
এমন সময় বেরেয়া আইল মোর টারির দুই জন বোন রে
আমরা তোমার হলুদ মাকাবো রে।
তক্তার উপর চড়িয়া বালি কাঁন্দে জারে জারে রে
কেবা আমায় হলুদ মাকাবে রে।
এমন সময় বেরেয়া আইল মোর টারির দুই জন ভাউজ রে
আমরা তোমার হলুদ মাকাবো রে।

কাইনচায় উনু ছাচি পানের গাছ
বাবা তোমার জামাতা বড় উত্তম না রে।
বেটি যাইবার কালে একটা কথা কও না রে
বাবা বুঝা হয়া অবুঝ কথা বল না রে।
বাবা ঘাটায় আছে চল্লিশ পাগড়ি ধুতি না রে।

www.pathagar.com

বাবা কেমনে বলিব তোমার কথা না রে
বাবা লোকে বলিবে শহুরি কন্যা না রে।

ক্যানো দুলা তোমার পন্থোতে
বাবড়ি উড়ায় দুলার বাতাসে।
তোমার দেশে কি বওনাই নাই
তাকে সাথে নিয়া কেনে আইসেন নাই।
আছে বওনাই তার মাথা নাই।
তোমার দেশে কি ব্যাল নাই
মাথা বানেয়া কেনে আইসেন নাই।
ক্যানো দুলা তোমার পন্থোতে
বাবড়ি উড়ায় দুলার বাতাসে।
তোমার দেশে কি ভাই নাই
তাকে সাথে নিয়া কেনে আইসেন নাই।
আছে ভাই তার হাত নাই
তোমার দেশে কি লাঠি নাই
হাত বানেয়া কেনে আইসেন নাই।

মাতা আচড়ে নবীনা, সিতা ফাটায় জরিনা
শশুর দেশে হারোয়া পরা হলো না।
এমন মনে কয়চে রে, এমন চিতে কয়চে রে
হারোয়া খোলোং মারোং ঘটকির গলায় রে।
মাতা আচড়ে নবীনা, সিতা ফাটায় জরিনা
শশুর দেশে শাড়িয়া পরা হলো না।
এমন মনে কয়চে রে, এমন চিতে কয়চে রে
শাড়িয়া খোলোং মারোং ঘটকির কমরে রে।
মাতা আচড়ে শাকিলা, সিতা ফাটায় সুমাইয়া
শশুর দেশে ঘড়ি পরা হলো না।
এমন মনে কয়চে রে, এমন চিতে কয়চে রে
ঘড়ি খোলোং মারোং ঘটকির মুকোতে।

আরে হুককুস করিয়া নাগিল চালের বাতা
খুককুস করিয়া উঠিল দেওরের কথা।
খুককুস করিয়া ভাসুর ঘরোত কাশে
ঘাটার ভিতি চায়া দেখোং
দেওর এলাং না আইসে।
আরে আসুক আসুক দেওর
আসুক দেওর দেখাম তাক মজা,
তায় না আসিলে সংসারে

www.pathagar.com

হইবে যে, বোঝা।
আরে হুককুস করিয়া উঠিল টাটির বাতা
খুককুস করিয়া উঠিল দেওরের কথা।
খুককুস করিয়া ভাসুর ঘরোত কাশে
দেওরা বোলে এলা মোক ভালোয় না বাসে।

গাছ কাটে ময়না, গাছে ঝরে রে পানি
তুই বেলে ময়না তসিরের বেটি।
খুলি সানটায় ময়না, কাঁন্দে হরিস মনে
কই দিচে ময়না তোক খুলি সানটা দাসী।
গাছ কাটে ময়না, গাছে ঝরে রে পানি
তুই বেলে ময়না তসিরের বেটি।
আগিনা সানটায় ময়না, কাঁন্দে হরিস মনে
কই দিচে ময়না তোক আগিনা সানটা দাসী।
গাছ কাটে ময়না, গাছে ঝরে রে পানি
তুই বেলে ময়না তসিরের বেটি।
বিছনা ঝাড়ে ময়না, কাঁন্দে হরিস মনে
কই দিচে ময়না তোক বিছনা ঝাড়া দাসী।
গাছ কাটে ময়না, গাছে ঝরে রে পানি
তুই বেলে ময়না তসিরের বেটি।
কাপড় কাছে ময়না, কাঁন্দে রে হরিস মনে
কই দিচে ময়না তোক কাপড় কাছা দাসী।

## ৪. কীর্তন

কীর্তন বাংলা সংগীতের চর্চায় একদিকে আধ্যাত্ম ভাবচেতনা অনুশীলনের বাহক, অন্য দিকে শুদ্ধ সংগীত চর্চারও প্রধান মাধ্যম। সাধন-ভজনে এই সংগীতের ধারা উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে হিন্দু প্রধান এলাকাগুলোতে চর্চিত গানের ধারা। বৈষ্ণব পদাবলির বিভিন্ন পর্যায়ের গান জনপ্রিয় সংগীত ধারার অন্যতম। মধ্যযুগের গীতি কবিদের রচনা ছাড়াও এ অঞ্চলের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন থেকে কিছু খণ্ড শিল্পীরা সংক্ষিপ্ত আকারে নিয়েছেন গায়েনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের নৌকাবিলাস খণ্ডের কিছু পদ এরকম :

**নৌকা বিলাস**
**নৌকা বিলাস পদাবলি কীর্তন**

মদন মদন মহন শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম
মধুমঙ্গল আদি বলরামকে, সঙ্গে নিয়ে ধেনু

www.pathagar.com

চড়াইতে হঠাৎ তার পূর্ব মানের কথা মনে হলো–
তখন তিনি কি করিতেছেন-

**তাল দাস পাহিড়া**

প = সখাগনঃ সঙ্গ, ছাড়ি যদু নন্দ নহে
চল তহি নাগর রাজ॥

আ = ভাবীতে ভাবীতে, যায়রে নাগর সখাগণ
সঙ্গ ছাড়ি আজ ভাবীতে ভাবীতে যায় রে নাগর ॥

পূজামণ্ডপে বসে কীর্তন গাইছেন ভক্তরা সৈয়দপুর।

**তাল গর খেমটা**

প= ভাবিনির মনরথে চললো বিপিন পথে,
সাধিতে মন রথ কাজ-ন॥

আ= সাধিবে বলে যায় রে নাগর-
তার মনরথ কাজ, সধিবে বলে-যায় রে নাগর॥

ক= আজ নাগর ভাবিনি মন রথে চলছেন
কিন্তু এই মনরথ খানা কি ॥

**ঠুংরি তাল**

আ= চারি চাকা রয়েছে ভাবিনী মনরথে
চারি চাকা রয়েছে॥

www.pathagar.com

কথা= এই মন রূপ রথে চারিটি চাকা রয়েছে, কি কি? ধর্ম্ম অর্থ কর্ম মক্ষ - এই চতুর বর্গের চাকা বক্ষের নিচে রয়েছে শুধু চাকা হলে তো রথ চলিতে পারে না। রথ চালানোর জন্য দুটি অশ্বেরও প্রয়োজন।

আ= দুটি অশ্ব রয়েছে ভাবিনীর মনরথে
দুটি অশ্ব রয়েছে, রাগ আর অনুরাগ, দুটি অশ্ব রয়েছে॥

ক= অশ্ব চালাতে হলে আবার লাগামের প্রয়োজন।

আ= অশ্ব বাঁধা রয়েছে, অশ্বক্তি
লাগামে অশ্ব, বাঁধা রয়েছে।

ক= এখন রথ চালাইবার জন্য সারথির
প্রয়োজন। সারথি ছাড়া তো রথ চলতে পারে না।
আ= পবন রূপ সারথি ভাবিনী মনরথে পবনরূপ সারথী।
শ্বাসপ্রশ্বাসে গতাগত তাইতে চলে দেনু রথ। (দেহ)

ক= এখন রথ চালাইবার প্রয়োজন এবং
রথের শিব পৰে একখানা ধজা চাই।

আ= আছে নামের ধজা ধজা উড়ায়ে যায় রে
পবন হিমলে ধজা, উড়ারে যায় রে।

## ৫. খ্যাপা গান

এ ধারার গান পালাগানেরই ভিন্নরূপ বলে মনে করেন অনেক সংগীতজ্ঞ। তবে নীলফামারী জেলার বিভিন্ন সংগীত শিল্পীর পছন্দের তালিকায় রয়েছে খ্যাপা গান। প্রচলিত কবিগানের আদলে পালা গানের মতো বিষয়ভিত্তিক এ গানে শিল্পীর তাৎক্ষণিক বাচনভঙ্গি উপস্থিত দর্শকশ্রোতাকে মাতিয়ে রাখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পৌরাণিক, লৌকিক, সমকালীন নানা বিষয়ে রচিত এই সংগীত ধারা মঞ্চগীতির এক সফল সংগীত ধারা একটি ক্ষ্যাপা গানের নমুনা :

**ফকিরের গান**

আলা আলা বলো রে সবাই
বন্দনা করি মাগো দাও কদম তলের ছায়া।

ছায়া নাই ছুরত নাই ধনীরও মায়া নাই
নাই ধনীর রঙ্গো বাপো ভাই।
প্রথমে আউজুবিঠল্লাহ পাক নামে সুবহান আলা
পাক নামে হুজুরও সালাম।

www.pathagar.com

আলা আলা বলো রে সবাই
লা ইলাহা কলেমা পড়ি জিকিরও ছাড়িল
থরো থরো করি পুড়ি কাঁপিতে লাগিলো।

আলারও নামো সিতে যে করিবে হেলা
জবানও বন্ধ হইবে মউতের বেলা।

আলা আলা বল সবে নবি কর সার
নবিরও কলেমা পড়ি হয়ে যাব পার।

হায় মুসলমান ঠিক রাখ ঈমান
দ্বীন ইসলাম যেন ডুবে না।
নামাজ পড় রোজা রাখ শরিয়ত রাখ চিন
হযরত বিনে কেহ নাই উম্মতের জামিন।

আরে পাগল দেল মুখে সেও রে আলার নাম
এই নাম দরিয়ার কালের সাক্ষী
এই নাম দোজখের নামের কালি
উম্মত বলি পানি পানি বাঁচাও আমা রে।

**নিমাই সন্ন্যাসীর গান**

নিমাই যাস না রে তুই সন্ন্যাস হইয়া
দুধের শিশু দুধ খায় না রে
নিমাই আমার বাঁচবে না রে
দুধের শিশু দুধ খায় না রে।
হুদুমের ঘর সাত ভাই
কারও চুয়াত পানি নাই।
এক ঝুকি কলা
পানি দে রে আলা।

## ৬. জারিগান

জারিগানের বিকাশ ঘটেছে ইসলামি গানের ধারা হিসেবে। জারিগান বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে হাসান হোসেনের কাহিনি নিয়ে রচিত হলেও উত্তর অঞ্চলের জারি গানগুলো জীবনমুখী নানা বিষয়ে রচিত। জারি শব্দের অর্থ ক্রন্দন এই তথ্যকে পাশ কাটিয়ে ফসলের জারি, বিভিন্ন রোগ বালাই বিষয়ের জারি গান এ অঞ্চলে জনপ্রিয়। চলমান জীবনের নানা সংকট থেকে উত্তরণের জ্ঞানদানের কৌশল বিষয়ে জারি গানের সুর কাঠামোকে অবলম্বন করে এ অঞ্চলের গীতিকার সুরকার জারিগান পরিবেশন করছেন চমৎকারভাবে। এখানে কয়েকটি গানের নমুনা দেওয়া হলো। যেমন :

www.pathagar.com

**গ্রাম আদালতের জারি গান**
কথা ও সুর : বিনয় কুমার রাজবংশী
শুনেন শুনেন ভাই-বোনেরা
শোনেন সবাই দিয়া মন
গ্রাম আদালতের কথা
করে যাই বর্ণন॥

২ টাকা ফৌজদারি মামলা
৪ টাকার দেওয়ানি
আর কোনো লাগেনা টাকা
নিবেন সবাই জানি॥

ওরে সত্য-মিথ্যা প্রমাণ হবে
পাবি রে ক্ষতি পূরণ॥ গ্রাম...

বাদি ও বিবাদি পক্ষের ৪ জন প্রতিনিধি
২ পরিজন পরিষদের মেম্বার
২ জন জ্ঞানী-গুণী।

ওরে বিচার পতি চেয়ারম্যান সাহেব
বিচার করবেন সমাধান॥ গ্রাম...

*গ্রাম আদালতের ভাইরে আছে এখতিয়ার
ক্ষতিপূরণ ১ থেকে ভাই মাত্র ২৫ হাজার
এর চেয়ে ভাই বেশি হলে
উচ্চতে কর গমন॥ গ্রাম...
*প্রতিটি গ্রামে আছে সিবিও সদস্য
তাদের কাছে গেলে পাবেন সঠিক পরামর্শ
নইলে না বুঝে অভিযোগ দিলে
মামলা করাই অকারণ॥ গ্রাম...

*গ্রাম আদালত এই প্রকল্প হবে বাস্তবায়ন
উপকৃত হবে মোদের দেশের জনগণ
মোরা শান্তিতে বসবাস করবো
বইবে দেশে সুশাসন॥ গ্রাম...
বাংলাদেশের সরকারের ভাই রে গ্রাম আদালত
কাজ করছে ই.এস.ডি.ও সংস্থার মারফত
ওরে সহযোগী সংস্থা ভাই রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন॥ গ্রাম...

www.pathagar.com

এসব কথা বলতে গেলে লাগে অনেক সময়
আরো কিছু জানতে চাইলে আসবেন আমার বাসায়
আমি একজন আদালতের সিবিও সদস্য
আমার কাছে এলে পাবেন সঠিক পরামর্শ।
আমি ই.এস.ডি.ও এর পক্ষ হইতে
জানাইতেছি আমন্ত্রণ॥ গ্রাম...

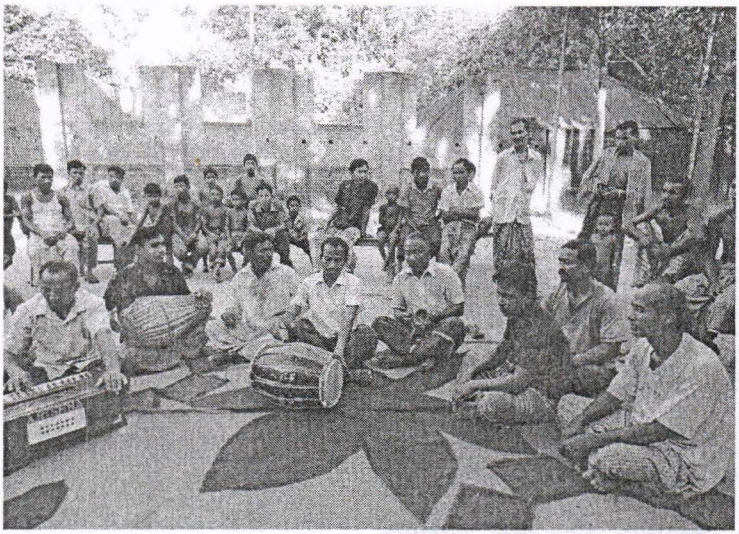

বীণাপাণি নাট্যগোষ্ঠির শিল্পীরা গ্রামআদালত, জন্ম নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর পালাগান গাইছেন। সোনাখুলি, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

**মা-নবজাতক ও শিশুর স্বাস্থ্যের জারি গান**
কথা ও সুর : বিনয় কুমার রাজবংশী

(বন্দনা)

১. প্রথমে বর্ণনা করি সৃষ্টি জগৎ পতি,
যার মহিমায় এই দুনিয়ায় এলো মানবজাতি।
সৃষ্টির সেরা মানুষ মোরা আদমের সন্তান,
মুসলমানদের জানাই সালাম, হিন্দুদের প্রণাম।
মাতা গুরু, পিতা গুরু, শিক্ষাদাতা গুরু,
সবার চরণ বন্দি মোরা, জারি করব শুরু।
নীলফামারী জেলা মোদের, সৈয়দপুর থানা,
গ্রামের নামটি লক্ষ্মণপুর চৌমুহনী ঠিকানা॥

www.pathagar.com

২. শোনেন ভাই বন্ধুগণ, করে যাই বর্ণন
গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্যের কথা, নবজাত
শিশুর স্বাস্থ্যের কথা স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল,
জানিয়া করিলে ভুল (২)
রোগে শোকে নষ্ট হবে সোনার দেহটা॥ ঐ

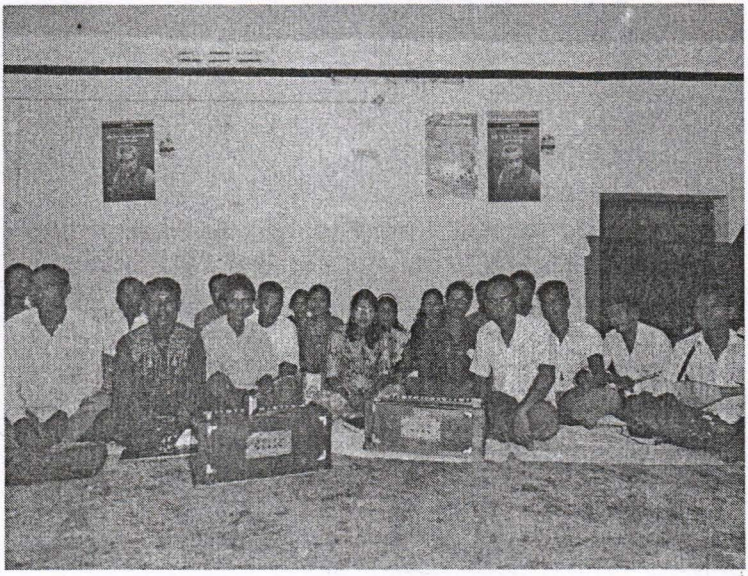

কিশোরগঞ্জের পালা গানের দল

৩. অল্প বয়সে গর্ভধারণ, গর্ভবতীর অকাল মরণ,
এই মরণের মূল কারণ, হয় বাল্য বিয়া (ভাই রে)
বাল্য বিয়া আইনে মানা, এমন ভুল আর কেউ করো না (২)
ধরা পড়লে হবে ভাই রে, জেল-জরিমানা॥ ঐ

৪. গর্ভবতী হতে সবল, সন্তানও হবে প্রবল,
পরিপুষ্ট হইয়া সন্তন, জন্ম নিবে ভাই (হায় রে)
করিলে মায়ের যতন, মিলিবে অমূল্য ধন (২)
এসো ভাই করি এই মায়ের সেবা॥ ঐ

৫. ৪৫ দিনের বেশি, বন্ধ হবে মাসিক ঋতু,
পরীক্ষা করাবেন মাকে, স্বাস্থ্য কর্মী এনে (ঘরে)
হলে মা গর্ভবতী, সুষমও খাবার বেশি (২)
খাওয়াবেন আয়োডিন আর আয়রন ভিটা॥ ঐ

www.pathagar.com

৬. সবুজ রঙের শাকসবজী, নানা ফল বারোমাসি,
খাওয়াবেন বেশি বেশি গর্ভাবস্থায় (মাকে)
দিনেব ২টা টি.টি টিকা, হবে না রোগ ধনুষ্টংকা (২)
প্রসবের পর হবে না কোনো সমস্যা॥ ঐ

৭. গর্ভের ৪ মাস পর, কমপক্ষে ৩ বার,
চেকআপ করিয়া নিবেন, মা শিশুর খবর (ভাই রে)
মায়ের কতো রক্তচাপ, শিশুর কেমন দেহের ভাব (২)
জানিয়া মা ও শিশুর নিবেন ব্যবস্থা॥ ঐ

৮. দিনের বেলা কমপক্ষে ২ ঘণ্টা বিরাম নিবে,
হাসিখুশি বেড়াবে মা, সদা সর্বদা (মায়ে)
কাজে কামে উঠা বসা, হেলা দোলায় সাবধানতা (২)
ভারী কাজ করতে মায়ের একেবারেই বাধা॥ ঐ

৯. মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ, ৫টি বিপদ চিহ্ন,
আক্রমণ করতে পারে, গর্ভ অবস্থায় (মাকে)
এমন একটি বিপদ হলে, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে (২)
মাকে করাতে হবে সঠিক চিকিৎসা॥ ঐ

১০. ১নং বিপদ চিহ্ন, করে দেহ জরাজীর্ণ,
প্রসবের আগে পরে, ঝড়ে রক্তস্রাব (মায়ের)
পড়েনা গর্ভফুল, কত মা করিয়া ভুর (২)
অকালে হারায়, মা সুন্দর জীবনটা॥ ঐ

১১. ২নং মাথাব্যথা, দুচোখে ঝাপসা দেখা,
প্রসবের কালে মায়ের, দুনিয়া আন্ধার (মায়ের)
শরীরে লাগে পানি, মাকে নিয়ে টানাটানি (২)
হয়ে যায় মায়ের দেহ রক্ত শূন্যতা॥ ঐ

১২. ৩নং তীব্র জ্বর, জ্বরে দেহ হয় কাতর
প্রসবের পরে ঝরে, দুর্গন্ধ স্রাব (মায়ের)
জ্বরে দেহ জরাজীর্ণ, মায়ের জীবন হয় বিপন্ন (২)
দেয় না মায়ে অন্য হয় দিশেহারা॥ ঐ

১৩. শরীরে হয় খিঁচুনি, করে দেহ হানাহানি,
৪নং বিপদ চিহ্ন, শোনেন মা জননী (ওরে)
হাত পা করে বাঁকা বেড়ে যায় জটিলতা (২)
প্রসব কালে মায়ের হয় করুণ দশা॥ ঐ

১৪. ৫নং কঠিন বিপদ, হলে বিলম্ব প্রসব,
১২ ঘণ্টার বেশি, হয় প্রসব ব্যথা (মায়ের)
মাথা ছাড়া অঙ্গ আসে, প্রসব হয় না অবশেষে (২)
প্রথমে হয় রে বাহির হাত অথবা পা ॥ ঐ

১৫. ৫টির ১টি বিপদ চিহ্ন, যদি করে অবতীর্ণ,
দেরি নয় তাড়াতাড়ি, নিবেন হাসপাতালে (মাকে)

www.pathagar.com

কর না অবহেলা, গর্ভবতী মায়ের বেলা (২)
থাকতে সময় হয় না যেন মায়ের সর্বনাশা॥ ঐ

১৬. শোন বলি ভাই সকলে, সন্তান প্রসব হলে,
ঘরে আনিবেন একজন, দক্ষধাত্রী মাতা, (১জন স্বাস্থ্য সেবিকা)
জীবাণু মুক্ত করি, কাটবে শিশুর নাঁড়ি (২)
কাটার সময় যেনো ভাই রে বাতাস ঢুকে না॥ ঐ

১৭. স্বাস্থ্যকর্মী এসে বাড়ি, দিবেন শিশু ওজন করি,
আড়াই কেজির কম হলে, ৭ দিন পর গোসল (দিবেন)
হলে শিশু আড়াই কেজি, ৩ দিন পর গোসল দিবি (২)
১ মাস পরে শিশুর কামাবেন মাথা॥ ঐ

১৮. নাঁড়ি কাটার সাথে সাথে, শাল দুধ খাওয়াতে হবে,
মায়ের বুকের শাল দুধেই ১নং টিকা (ভাই রে)
৬ মাস একাধারে, বুকের দুধ খাওয়াতে হবে (২)
৬ মাসের পরে দিবেন বাড়তি কিছু খানা॥ ঐ

১৯. শিশুর বয়স দেড় মাস হলে, অনেক মায়ের ঋতু খোলে,
এ সময়ে গর্ভ হলে, বিপদের লক্ষণ (মায়ের)
তাইতো বলি মায়ের কাছে, থাকেন সবাই সাবধানেতে (২)
এ সময়ে করতে হবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ॥ ঐ

২০. জন্ম থেকে ২৮ দিন তক, নবজাতকের ৫টি বিপদ,
আসতে পারে যখন তখন, রাখ সাবধানে (শিশু)
বিপদ লক্ষণ দেখলে পরে, সেবিকাকে আনবে ঘরে (২)
চিকিৎসা করিয়া শিশুর বাঁচাবেন জীবন॥ ঐ

২১. (যেমন) বুকের দুধ-না টানতে পারে, জ্বরে দেহ যায় রে পুঁড়ে,
ঠান্ডা লাগিয়া শিশুর শ্বাসকষ্ট হয় (ভাই রে)
শিশুর দেহ নিস্তেজ করে, খিঁচুনি হয় বারে বারে (২)
অবশেষে ধুঁকে ধুঁকে যায় শিশুর জীবন॥ ঐ

২২. (আবার) শিশুদের ডায়েরিয়া হলে, পাতলা পায়খানা করে,
তৈরি করে স্যালাইন, শিশুকে খাওয়ান (ভাই রে)
বাড়ির পাশের সেবিকাকে, জলদি করে খবর দিবে (২)
চিকিৎসা করিয়া শিশুর জীবনটা বাঁচান॥ ঐ

২৩. বাংলাদেশে ৭টি রোগে শত শত শিশু ভুগে,
কেহ মরে, কেহ বাঁচে, কেহ নেংরা নুলা (হয় রে)
জণ্ডিস, হাম-যক্ষা, ডিপথেরিয়া, পোলিও, হুপিং ধনুষ্টংকা (২)
১ বছর ৭টি রোগের দিন শিশুর টিকা ॥ ঐ

২৪. এই পর্যন্ত ক্ষ্যান্ত করি, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের জারি,
ভুল ত্রুটি হলে ভাই রে, করেন মার্জনা (সবাই)
বিনয় বলে সুস্থ থাক, স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখ (২)
সকলের করি মোরা সুস্বাস্থ্য কামনা॥ ঐ

www.pathagar.com

## ৭. গজল

ইসলামি ঐতিহ্য ও দর্শন চর্চায় গজল সমকালে বিলুপ্তির পথে মনে করা হলেও এখন এর প্রভাব নীলফামারী অঞ্চলে বিরাজমান। গজল মূলত রমজান মাসে চর্চা হলেও এখনও গানের আসরে যন্ত্রযোগে কিছু গজল পরিবেশিত হয়। যেমন :

রমজান মাসে শিশু-কিশোররা দলবেঁধে বাড়ি বাড়ি গজল গেয়ে বেড়াচ্ছে। বাঙালিপুর, সৈয়দপুর।

১

আহারে রহিমা বিবি
হস্তে কেনো ভিক্ষার ঝুলি
কহ কথা বয়ানো করি॥

ভিক্ষার ঝুলি হস্তে লইয়া
যায় রহিমা গ্রামে চইলা
ভিক্ষা দ্যাও গো মাও জননী॥
আমার স্বামীর গায়ের গন্ধে
গ্রামের লোকজন সরে থাকে
ভিক্ষা দাও গো নগরবাসী॥
আমার স্বামী অনাহারে
আছেন স্বামীধন বৃক্ষের তলে
ভিক্ষা দাও গো মাও জননী॥

নামাজেরও সময় হইলে
যায় রহিমা বৃক্ষের তলে
বিছিয়া দ্যায় রহিমার শাড়ি অঞ্চল॥

www.pathagar.com

আহারে বটবৃক্ষ
তোর তলে মোর স্বামী ছিলো
স্বামী আমার কোথায় গেলো॥

আল্লার ঐনা হুকুম হইলো
বটবৃক্ষের জবান খুললো
তোর স্বামীরে খাইছে বনের বাঘো॥

আহারে বনের বাঘা
তোর মুখে কেন রক্তের জবা
কোন্ সাহসে খাইলি মোর স্বামীরে॥

স্বামীরে কেনো আগে খাইলি
আমারে কেনো ছেড়ে দিলি
খাও খাও মোরে খাও॥

২
এক নবি বাস করিতেন বোগদাতে
একক সন্তান দিলেন আল্লাহ তাহারে ॥

পালিয়া পুশিয়া লালন করিলো
গোসল করাইতে নদীত নিয়ে গেলো॥

আদরও করিয়া নদীত নাম্বাইলো
অচিম্বিতে কুম্ভীর এসে নিয়ে গেলো॥
নিল নিল নিল বুঝি নিল রে
কলিজাটা নিলো বুঝি ছিড়িয়ে॥

কেঁন্দো না কেঁন্দো না মাওজান কেঁন্দো না
পানির কুম্ভীর আমায় নিয়ে খাবে না॥

চিননি চিননি কুম্ভীর চিননি
আমার নামটি আব্দুল কাদের জিলানী॥
মাফ করো মাফ করো আব্দুল কাদের জিলানী
ভুল কইরা ধইরা ফেলছি তোমারে॥

৩
মদিনার বুলবুল নবি রাসুল আল্লাহ
পাঠাইলেন খুশি হয়ে নিজে মাবুদ আল্লা॥

উহুদাত বাণী শুনে খেপিলো তায়েফগণ
তায়েফের ময়দানে গাহিতেছে বুলবুল
নবিকে পাথর মেরে জাহেরে করিল খুন॥

www.pathagar.com

মারে পাথর নাকে মুখে না মানিয়া আল্লাহ
কে বেশি মারিতে পারে করিয়া যে পাল্লা
সহিতে না পেরে নবি বলেনও ইল্লাল্লাহ্ ॥

ফেরেশতারা ডেকে বলে ওহে নবি সারোয়ার
হুকুমো পাইলে দেবো তায়েফে চাপাহার
কতো শক্তি রাখে তারা দেখাবো মজা এবার॥

তবু নবি কেঁদে বলে বলো না ইল্লাল্লাহ্
ওদেরকে মারিলে ভবে কে ডাকিবে আল্লাহ
সহিতে না পেরে নবি বলেনও ইল্লাল্লাহ্ ॥

৪

মাটির বাড়ি মাটির ঘর
মাটির হইবে বিছানা
আসবি একা যাবি একা
সঙ্গে কেউ তোর যাবেনা॥

কিন্তু যেদিন ডাক পড়িবে
কবর মাঝে শুইতে
জোগার কিছু করছো নি বন্ধু
তার মাঝে বিছাইতে॥
লক্ষ কোটি মুদ্রা ব্যয়ে
গড়ছো বালাখানা
হিরা মানিক মুক্তা দিয়ে
পালঙ্কেরও শায়মানা॥

এমন জায়গায় যাইতে হবে
সেই জায়গার নাই ঠিকানা
এমন জায়গায় শুইতে হবে
যেই জায়গার নাই বিছানা॥
এমন ঘরে থাকতে হবে
সেই ঘরে নাই সাথী
এমন ঘরে থাকতে হবে
সেই ঘরে নাই বাতি॥

দাদা গেইছে বাবা গেইছে
কেউ তো ফিরে আসবে না
সাধের ছেলে চলিয়া যাইবে
আরতো আবক্ষা ডাকবে না

www.pathagar.com

প্রাণের বিবি চলিয়া যাইবে
আরতো ঘরে ফিরবে না॥

৫
ইয়াকুব নবি বাস করিতেন কেনানে
সবার চাইতে ভালো বাসতেন ইউসুফকে ॥
একদিন রাত্রে খোয়াবে দেখলেন ইউসুফ
চন্দ্র সূর্য সেজদা করেন তাহাকে ॥

ইয়াকুব নবি মানা করলেন ইউসুফকে
খোয়াবের কথা বলিও না কাহাকে ॥
ছোট ছেলে ইউসুফ না বুঝিয়া শুনিয়া
খোয়াবের কথা ভাইদের দিলেন বলিয়া ॥

ইউসুফের দশও ভাইয়ো দেওয়ানা
ইউসুফকে মারিতে হইলেন রওয়ানা ॥
ইউসুফের দশও ভাইয়ো মিলিয়া
ইউসুফকে কূপেতে দিলেন ফেলিয়া ॥

কুয়ায় পড়ে কাঁন্দে ইউসুফ হায় রে হায়
মরণকালে না দেখিলাম কপোমায়॥
কোথায় আছো প্রাণের আবক্ষাজান বসিয়া
তোমার ছেলেক দেখা দাওগো আসিয়া ॥

কোথায় আছো প্রাণের মাওজান বসিয়া
তোমার ছেলেক দেখা দাওগো আসিয়া ॥

## ৮. গোয়ালির গান

গোয়ালে বসে গরুর মাহাত্ম্য বর্ণনা এই গানের ধারার প্রধান লক্ষ্য হলেও- গৃহী নারীর নানা দায়িত্ব-কর্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এই গানের লক্ষ্য। যেমন :

আ...আরে
গোয়ালের ভাঙা দিয়া যেবা গবরও ফেলায়
তার ঘরের গোয়ালটি ধুয়া হয়ে যায়।
গোয়াল ঘরেতে যেবা গুয়ার পিক ফেলে
তার ঘরের গরু গুলন রক্ত শূন্য করে।
গোয়াল ঘরেতে যেবা মাথার চুল ঝাড়ে
তার ঘরের গরু গুলান উকুন আটাই ধরে ॥

www.pathagar.com

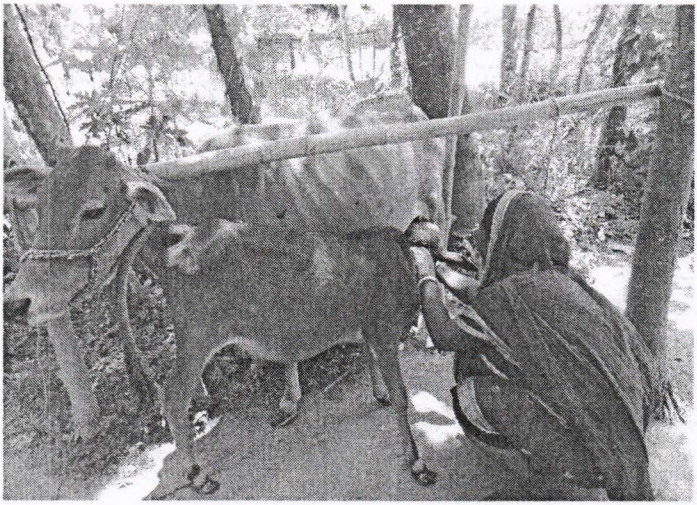

গাভীর দুধ দোয়াচ্ছেন গৃহকর্ত্রী বোতলাগাড়ি, সৈয়দপুর।

আ...আরে
সকালে উঠি মাগো গবর ছাই ফেলো
হাত পরিষ্কার কর মাগো থাক চিরতি।
লক্ষ্মী বলে মাগো ওখানে আছি।
গোয়াল ঘরকে যেবা ঘৃণা নিন্দা করে
তার ঘরের গরু গুলন পাল্টে পাল্টে মরে।
এগুলো কথা শোন মাগো শোন মন দিয়া
অবশ্য গরু বাছুর বৃদ্ধি হবে তার।
শনিবার মঙ্গলবার যেবা হলদি বিলায়
তার ঘরের লক্ষ্মী মাগো ছাড়িয়া পালায়।
মামা ভাগিনা গরু যেবা বিক্রি করে খায়
তার ঘরের গোয়ালটি ধুয়া হয়ে যায়।
গরু বাছুর যত্ন যেবা মাগো করে
তার ঘরের গোয়ালটি উঁচু হয়ে যায়।
সঙ্খিনী নারী মাগো যার গৃহে যায়
হাবংশ নিবংশ তার স্বামী নিন্দা হয়।
চিন্তিনী নারী মাগো যার গৃহে যায়
ধনজন প্রতিদান তার গৃহে হয়।
সকাল বেলায় উঠো মাগো স্বামী সেবা করো
তার ঘরের লক্ষ্মী মাগো ধরিব জানো।

www.pathagar.com

## ৯.ভক্তিমূলক গান

শ্রী ভূবনকৃষ্ণ দাসের গান
পুঁটিমারী ॥
ক্ষ্যাপা গান অথবা
বাউল সংগীত

### প্রার্থনা

নিজ গুণে করো দয়া ওহে দয়াময়, নিজ গুণে করো দয়া
তুমি দয়া না করিলে প্রভু, কি হবে উপায়। ঐ
তুমি স্রষ্টা, তুমি সৃষ্টি, তুমি করো তুফান বৃষ্টি,
করো এবার কৃপাদৃষ্টি প্রভু, তুমি হও সহায়। ঐ

তব শ্রী পাদ লইলাম শরণ, করো তুমি পাষণ্ড দলন
দেও হে তব রাঙ্গাচরণ প্রভু, তুমি হও সহায় ॥ ঐ

কলুষিত কলিকালে, কতো পাপী উদ্ধারিলে
এ হরিনাম প্রচারিলে, প্রভু ভক্তগণে গায় ॥

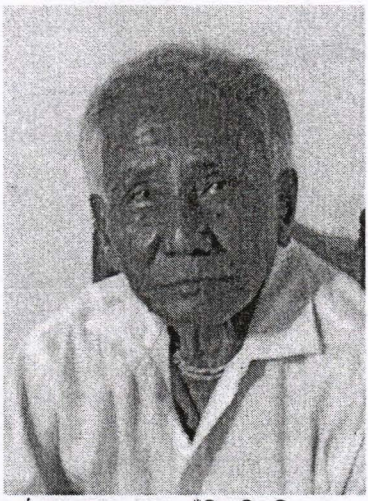

গীতিকার ও সংগঠক ভূবনকৃষ্ণ রায় পুঁটিমারি, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

### ভক্তের কামনা

১
হরিহে দীননাথ, মনে আমার এই বাসনা

www.pathagar.com

ফেলেয়া দিলে অগম দরিয়ায়,
তুলিয়ে নেও আমায় প্রেমের নৌকায় হরি রে॥

করো কিনা করো হে পার,
শ্রীচরণ করেছি মার হরি হে॥
কতো জনায় করেছ পার,
মোর অধমটার কি এতোই ভার হরি হে॥

২

তুমি আমার বিপদ হরো হরি হে– তুমি আমার বিপদ হরো। ২
ভজিয়ে তোমার পদ ব্রহ্মা পান ব্রহ্মাপদ;
(তুমি) বিপদের পদদ্বয়, আমার নিরাপদ করো হরি হে
তুমি আমার বিপদ হরো ॥
অন্তরে মোর এক বেদন, তব পদে করি নিবেদন
(তুমি) নিজ গুণে কৃপা করে, (আমায়) নিবেদন কর
হরি হে তুমি আমার বিপদ হরো॥

ঐ পদ ভেবে সদানন্দ, অন্তরে তার সদানন্দ,
আমি জয় করি সদা নিরানন্দ, যদি কৃপা করো হরি হে ॥ ঐ

৩

আমি বন্দি হইলাম মায়ারি জালে, হরি হে
বন্দি হইলাম মায়ারি জালে।
নারীর মায়ায় মত্ত হইয়ে, সাধন ভজন হইলনা রে
(হরি) তব চরণ হয় না স্মরণ, (আমি) রহিলাম ভুলে হরি হে
বন্দি হইলাম মায়ারি জালে॥
ঐ জালের সুতা টানলে বাড়ে,
মায়াসুতা কভু না ছিড়ে।
যেমন কাঁঠালের আঠা টানিলে বাড়ে,
মায়া ঐ রকমে হরি হে– বন্দি হইলাম মায়ার জালে ॥

এছাড়াও নীলফামারীর বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পীরা শ্রোতাদের জন্য নানা মঞ্চে নাম না জানা অনেক গীতিকারের গান পরিবেশন করে থাকেন। এরকম কিছু গানের নমুনা :

১

সোনা গঞ্জের সোনা বন্ধু রে, আরে ও বন্ধু অন্তরের অন্তর
প্রেম করিয়া কোথায় রইলি, নিলি না খবর বন্ধু রে।

www.pathagar.com

তুমি বন্ধু গাছের শিকর, আমি গাছের ডাল
তোমার আমার ভালোবাসা থাকবে চিরকাল বন্ধু রে।

তোমারই কারণে বন্ধু ছাড়লাম বাড়ি ঘর
প্রেম করিয়া কোথায় রইলি, নিলি না খবর বন্ধু রে।

অন্তর ছিড়িয়া যদি দেখাইতে পারতাম
তুমি তখন দিবে বন্ধু ভালোবাসার দাম রে।

হায় রে জানি না কি দোষে বন্ধু করলা আমায় পর
প্রেম করিয়া কোথায় রইলি, নিলি না খবর বন্ধু রে।

মাগুড়া, কিশোরগঞ্জের উদীয়মান শিল্পী মুন্নাতারা মিনি বাঁশি বাজাচ্ছেন বাবা মোসাদ্দেক হোসেন

২

এবার আমন কাটিয়া করনুং বিয়া
টিভি, সাইকেল, ক্যাসেট নিয়া
বউ কোনা নিছোং গোরা বুলবুলা।
ও মুই টাকা নিছোং হাজার কুড়ি
টাকা নিছোং বিয়াতে গনিয়া।
ঘটক শালার বুদ্ধি ধরি,
এই যে নিয়া গেলো মোক পাত্রীর বাড়ি
পাত্রী দেখাইল মোক উচা টেরা লাল গোরা
পাত্রী দেখিয়া মোর মনটা মানে না।

www.pathagar.com

ঘটকের চালাকি দেখি বিয়াও খান করনুং ফট করি
বাড়ি আনিয়া দেখোং বউ মোক দিছে বদল করিয়া।

৩

রংপুর হামার বাড়ি বন্ধু রে
আরে ও বন্ধু আইসেন হামার বাড়ি
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আইলে পরে
আইসেন হামার বাড়ি বন্ধু রে।
জ্যৈষ্ঠ মাসের মিষ্টি আম রে
ও বন্ধু কাঁঠাল সারি সারি
পাকা আমের রস চিপিয়া
দিমু থালা ভরি বন্ধু রে।
একবার যদি আইসেন বন্ধু রে
আরে ও বন্ধু এই গরিবের বাড়ি
ভইসা ধানের ভাত খাওয়ামু
হিরা ধানের মুড়ি বন্ধু রে।

৪

প্রাণ কালিয়া রে,
কেনো রে কালা বাজান বাঁশি এই দুপুর সনে।
যখন কালা তোমরা বাজান বাঁশি
তখন কালা আমি আঙিনা সামটি
হাতের বারুন খসিয়া পইলো মোর ঐ বাঁশির সুরে।

থালি মানজো চুয়ার পাড়ে,
নাকের নোলক খসিয়া পইলো ঐ বাঁশির সুরে।
প্রাণ কালিয়া রে,
কেনো রে কালা বাজান বাঁশি এই দুপুর সনে।
গরু বান্দির যাং রে কালা, গামছা মাথায় দিয়া
পাশের বাড়িত চায়া দেখোং ভুলকি মারিয়া
হাত দিয়া মুই ইশিরা করোং, দেখিয়া দেখিস না।
প্রাণ কালিয়া রে,
কেনো রে কালা বাজান বাঁশি এই দুপুর সনে।

নীলফামারী জেলার বিভিন্ন উপজেলা ভৌগোলিক অবস্থান দেশের প্রান্তকে ছুঁয়ে থাকলেও সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ নীলফামারীর সদরে বাস করে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ। কখনো কর্মপ্রবাহে কখনো বা বসবাসের নিরাপদ নির্ভরতাকে উপলক্ষ্য করে। বিশেষ করে সৈয়দপুর অঞ্চল- এখানে বাঙালি মুসলমান, হিন্দু ছাড়াও রয়েছে

www.pathagar.com

বিহারি, মারোয়রি, রবিদাস-হরিদাস গোত্রের মানুষ। এঁরা প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকেই প্রধান করে উৎসব-পালা-পার্বণ পালনে অভ্যস্থ। সেকারণে তাদের নিজস্ব ভাষায় রয়েছে তাদের সংগীত। যেমন হরিদাস গোত্রের সংস্কৃতিসেবীরা ভোজপুরি ভাষায় গানের শ্রোতা ও নির্মাতা। রবিদাস অর্থাৎ মুচি সম্প্রদায় মূলত হিন্দু ধর্মাচার পালন করলেও হিন্দি ভাষায় গান রচনা কিংবা শুনে থাকে। তবে একেবারে রয়া পরিবেশে গানগুলোর ভাষা ও সুর তাদের নিজস্ব আচার ঐতিহ্যকে ঘিরে। দুই প্রধান ধর্মের মানুষ এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের গানের ধারক ও বাহক। ভাওয়াইয়া, মেয়েলি গীত, গজল, কীর্তন, পালাগানগুলো বেশিরভাগ জীবনমুখী। জাতীয়তাবোধকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর দেশের গান। যেগুলোর বাণী ও সুর প্রমিত বাংলা রচিত গানের বাণী ও সুরের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকবে না। দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ-সংকট-আধ্যাত্মিকতাসহ মনস্তাত্ত্বিক-জ্ঞানমূলক নানা উপাদানে সৃষ্ট গান অভিনব। বিশেষ করে ভাওয়াইয়ার ঢংয়ে কিংবা কীর্তনপালা আঙ্গিকের গানগুলো গল্পপ্রধান বলে বিশেষ জনপ্রিয়। আঞ্চলিক ভাষার দুর্বোধ্যতা কাটিয়ে এ গানগুলো দেশের সীমা ডিঙিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সমাদৃত। বিশেষ করে সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনকে এ গানগুলো ধারাবাহিকতা দিয়েছে অভিনব কৌশলে। তাই এ অঞ্চলের ইতিহাস তৈরিতে ভাওয়াইয়া, মেয়েলিগীত কিংবা পালাগানের বিকল্প নেই। সময়ের সাথে-সাথে জীবনের নানামুখী পরিবর্তনকে সহজ সাবলীলভাবে সুর বেঁধেছেন কবিরা। রূপকথার গল্পের ছলে যেন জীবনের অনুচ্চারিত, লুকানো অনুভূতিকে বেঁধেছেন কবিতা-গানে। তাই গানগুলো এই অঞ্চলের মানুষের বিনোদনের সাথী নয় প্রতিদিনের কর্মপ্রবাহে নানা শিক্ষণীয় পালনীয় তথ্য-তত্ত্বও এসব গানে খুঁজে পাবে শ্রোতা। বিশেষ করে শ্রমজীবী নানা পেশার মানুষের দৈনন্দিনকে ঘিরে তৈরি গানগুলো তাদের কর্মসংগী। সাধনকৃত কণ্ঠ কিংবা সাধনালব্ধ সুরের অপেক্ষা করতে হয় না। তাই শিল্পীর তালিকাও দীর্ঘ। হেড়ে গলায়, সুরেলা গলায় তফাত করা কঠিন। গানের বাণীর প্রয়োজনীয়তা কখনো কখনো শ্রোতার মনের সুরের আবেদনকে উপেক্ষা করতে পারে অনায়াসে। 'গানের দেশ সুরের দেশ বাংলাদেশ'-এই বাণীটি নীলফামারীর জনজীবনের অনেকাংশে সত্য। এ অঞ্চলে শহুরে যান্ত্রিকতা নিকটবর্তী হলেও তৈরি হচ্ছে গান ঘটমান পরিস্থিতিকে ঘিরেই। তাই শংকা নয়—উত্তরাঞ্চলের নীলফামারী জেলার লোকসংগীতভূবন তার বর্ণ-পোশাক বদলালেও বদলাবেনা চিরাচরিত গান শোনার অভ্যাস—এমন প্রত্যাশায় কোনো সংশয় নেই বললেই চলে।

**তথ্যসহায়ক**

১. মহেশচন্দ্র রায়, ভাওয়াইয়া গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী, নীলফামারী
২. সুবল বয়াতি, গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী, পুঁটিমারী, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
৩. বিনয় কুমার রাজবংশী, গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী, বেলাইচন্ডি, সৈয়দপুর, নীলফামারী
৪. আব্বাস আলী সরকার, ভাওয়াইয়া গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী, সৈয়দপুর, নীলফামারী
৫. হৃদয় খান, সংগীত শিক্ষাগুরু, পুঁটিমারী, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
৬. তরণী কান্ত রায়, পালাগানের সংগ্রাহক ও শিল্পী, সৈয়দপুর, নীলফামারী

www.pathagar.com

৭. গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস পালা, সৈয়দপুর, নীলফামারী
৮. তেওয়ারের ডালা কয়া, গোলাহাট, সৈয়দপুর
৯. বীণাপাণি নাট্যগোষ্ঠী, সোনাখুলি, , সৈয়দপুর, নীলফামারী
১০. ভুবনকৃষ্ণ রায়, গীতিকার ও সংগঠক, পুঁটিমারী, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
১১. বিপাশা আক্তার, পিতাঃ মহুবার রহমান, উপজেলা : জলঢাকা।
১২. মুন্নাতারা মিনি, শিল্পী, মাগুড়া, কিশোরগঞ্জ
১৩. খায়রুন নাহার খুশি, পিতা : খলিলুর রহমান, গ্রাম : আমরুল বাড়ি, উপজেলা : জলঢাকা।
১৪. রিপন ইসলাম, পিতা : মোঃ ইছাহাক আলী, উপজেলা : জলঢাকা।
১৫. মাকসুদা আক্তার দিবা, উপজেলা : জলঢাকা।
১৬. রবিনা আক্তার, পিতা : মকছুদার রহমান, গ্রাম : উত্তর চেরেঙ্গা, উপজেলাঃ জলঢাকা।
১৭. রুবেল হোসেন আজাদ, উপজেলা : জলঢাকা।
১৮. হৃদয় মনি, উপজেলা : সদর।
১৯. শাহনাজ পারভীন, উপজেলা : জলঢাকা।
২০ মোছাঃ সিমু আক্তার, গ্রাম : নতিব চাপড়া, উপজেলা : সদর

www.pathagar.com

# লোকবাদ্যযন্ত্র

নীলফামারী অঞ্চল সংস্কৃতির ধারায় এক স্বতন্ত্র অঞ্চল। এ অঞ্চলে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আসর প্রায়ই হয়ে থাকে। আসরগুলোর মধ্যে লোকসংগীত এবং লোকনাট্যের সংখ্যাই সর্বাধিক। এসব আসরে সংগীতের তালে ও সুরে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেগুলোর পর্যায়ক্রমিক বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হলো :

## ১. ঢোল

নীলফামারী অঞ্চলে লোকবাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঢোলের ব্যবহার সর্বাধিক। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত গ্রামগুলোতে পূজাপার্বণের সময় এ যন্ত্রের ব্যবহার অনিবার্য। অন্যসব লোকঅনুষ্ঠানেও অনুষঙ্গ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢোল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঢোল বাদকদেরকে ঢুলি বলা হয়। এ অঞ্চলে ঢুলিদের কদর বেশি।

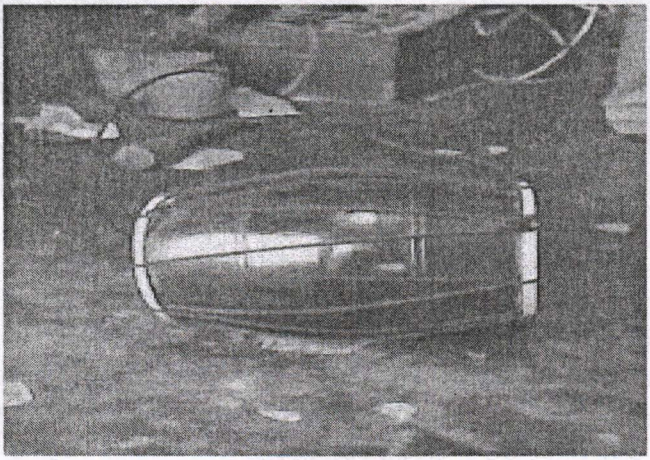

ঢোল, ডিমলা অঞ্চল

## ২. খোল

খোল অনেকটা ঢোলের মতোই বাদ্যযন্ত্র। তবে এর একমুখ অপর মুখ অপেক্ষা চিকন বা সংবৃত হয়ে থাকে। অন্য মুখ ঢোল আকৃতির হয়ে থকে। নীলফামারী অঞ্চলের লোক অনুষ্ঠানগুলোতে খোলের ব্যবহার যথেষ্ট। এ যন্ত্রের আওয়াজ ঢোলের মতো না হয়ে অনেকটা তবলার মতো হয়ে থাকে। খোলের ব্যবহার দু'রকমের হয়ে থাকে। গলার মধ্যে ঝুলিয়ে নিয়ে এবং দুই বাহুর মাঝখানে বসিয়ে খোল বাজানো হয়।



www.pathagar.com

## ৩. ঢাক

নীলফামারী অঞ্চলে বহু প্রাচীনকাল থেকে ঢাকের ব্যবহার চলে আসছে। উল্লেখ্য যে, নীলফামারীর ডোমার অঞ্চলে তথাকথিত ডোম সৈন্যরা যুদ্ধে উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঢাক ব্যবহার করতো। বর্তমানে সনাতন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসবে ঢাকের প্রচলন ব্যাপক লক্ষ করা যায়।

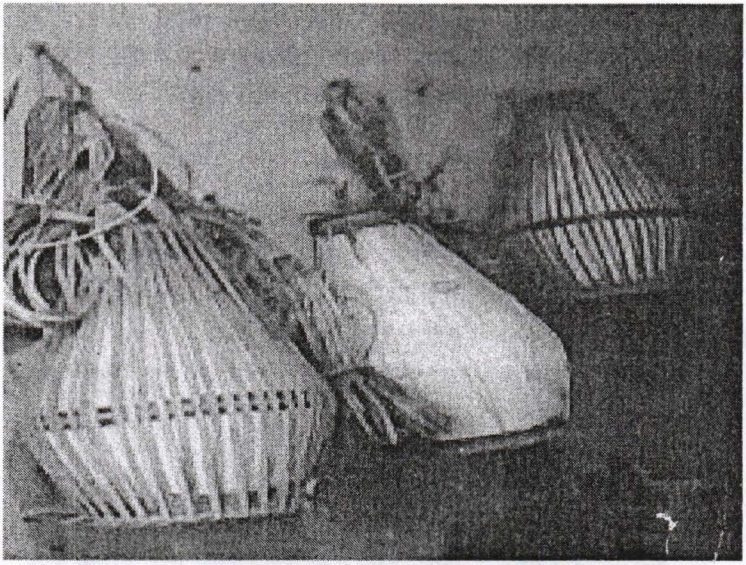

খোল, ডিমলা অঞ্চল

## ৪. একতারা

একতারা মূলত নারকেলের মালা বা লাউয়ের (বসের) অভ্যন্তরে সংযুক্ত একক তারের যন্ত্র। এ যন্ত্র মূলত বাউলেরা ব্যবহার করে থাকলেও এ অঞ্চলের ভিক্ষুকদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের পেশাগত কাজে ব্যবহার করে থাকে। এছাড়াও লোকসংগীতের অনেক অনুষ্ঠানেও একতারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

## ৫. দোতারা

দোতারায় দুটি তারের কথা উল্লেখ থাকলেও মূলত এটি তিন তারের বাদ্যযন্ত্র। জনপ্রিয়তার দিক থেকে দোতারা কোনো অংশে কম নয়। নীলফামারীর গ্রাম অঞ্চলের যেকোনো লোকজ অনুষ্ঠানে দোতারার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ অঞ্চলের ছাতিম নামক একপ্রকার গাছের কাঠ দিয়ে উন্নতমানের দোতারা তৈরি হয়। তাই এ অঞ্চলের ভালোমানের দোতারাগুলোকে ছাইতনের দোতারা নামে অভিহিত করা হয়।

www.pathagar.com

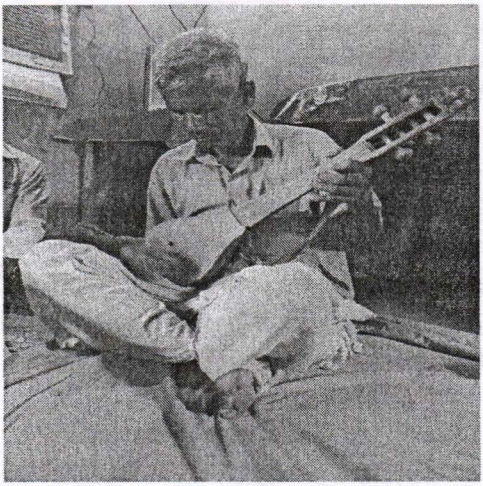

দোতারায় গান তুলছে ননীকান্ত রায়, বোড়াগাড়ী, ডোমার, নীলফামারী

## ৬. সারিন্দা

এ অঞ্চলে সারিন্দার ব্যবহার প্রায় বিলুপ্তির পথে। তবে জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জের প্রত্যন্ত কিছু এলাকায় সারিন্দার ব্যবহার এখনো লক্ষ করা যায়। দোতারার মতো সারিন্দারও তিনটি তার বিদ্যমান। তারের উপরে চামড়া ও কাঠের ছাউনি থাকে যা অনেকটা কান খাড়া ঘোড়ার মতো দেখতে মনে হয়।

## ৭. বাঁশি

বাংলার জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বাঁশি অন্যতম। বাঁশি বাজানোর জন্য বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তি এককের অনুরাগ থেকে বাঁশি বাজানো হয়ে থাকে।

বাঁশিতে সুর তুলছে জয়নাল আবেদীন, বিজলী ডাঙ্গা, জলঢাকা, নীলফামারী

www.pathagar.com

নীলফামারী অঞ্চলের সব সম্প্রদায়ের ছোট-বড় অনেকেই বাঁশি বাজিয়ে থাকে। গঠনগত দিক থেকে এ অঞ্চলের বাঁশির অনেক প্রকারও লক্ষ করা যায়। যেমন : আড়বাঁশি, মোহনবাঁশি, বাঁকাবাঁশি ইত্যাদি।

## ৮. খঞ্জরি

খঞ্জরি মূলত হাতের তালুতে ব্যবহৃত তালবাদ্য। এ অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গান, জারিগান ও অন্যান্য লোকসংগীতের আসরে এ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত চার-পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসের একটি কাঠের চাকতি বিশেষ। এর এক দিকে চামড়ার ছাউনি অন্যদিক খোলা। এর গায়ে সমান দূরত্বে চারটি ছিদ্রে লোহার শিকের সাহায্যে টিনের ছোটো ছোটো পাত জড়ানো থাকে। বাজানোর সময় এগুলো ঝুনঝুন শব্দ করে সংগীতের সুরকে মুখরিত করে থাকে।

## ৯. ডুগডুগি

কাঠের খোলের দুপাশে চামড়ার ছাউনি বিশিষ্ট একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম ডুগডুগি। এর মাঝের সরু অংশে তিন-চার ইঞ্চি লম্বা একটি সুতা বাঁধা থাকে। সুতার মাথায় একটি শক্ত গুটি বাঁধা থাকে। হাতের সাহায্যে যন্ত্রটি এদিক ওদিক দোলানোর সময় গুটিটি উভয় পাশের চামড়ায় আঘাত করে ডুগডুগি ধ্বনি তোলে। এ অঞ্চলের সাপুড়িয়া সম্প্রদায় এবং ফেরিওয়ালারা তাদের পেশাগত কাজে এ যন্ত্রটি ব্যবহার করে থাকে।

## ১০. শঙ্খ

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে শঙ্খের ব্যবহার হয়ে আসছে। হিন্দুদের মধ্যে শঙ্খধ্বনি শুভবার্তা বাহক বলে যেকোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও বিয়ে উপলক্ষ্যে তারা শঙ্খ বাজিয়ে থাকে। শঙ্খ সামুদ্রিক শামুকের খোলস দিয়ে তৈরি হলেও সব শঙ্খ বাদ্য উপযোগী হয় না। বড় আকারের কিছু বাছাইকৃত শঙ্খই বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

# লোকউৎসব

আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতির বিকাশের ধারায় নীলফামারীর লোকউৎসবের গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। এই অঞ্চলে প্রচলিত লোকউৎসবগুলো সর্বজনীন, ধর্মীয় এবং সামাজিক এই তিন ধারায় প্রবহমান। এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো :

## ১. নববর্ষ

নববর্ষ বাঙালির প্রাণের উৎসব। পুরানো বছরের সব দুঃখ-কষ্ট ও গ্লানি মুছে ফেলে নীলফামারীর প্রায় প্রতিটি উপজেলায় নববর্ষ পালিত হয়। নববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় মেলা বসে। এই মেলায় সার্কাস, যাত্রাগান এবং বিখ্যাত লোক শিল্পীদের গাওয়া গানে মুগ্ধ হয় নীলফামারীর মানুষ। মেলা উপলক্ষ্যে হাট বসে। সেখানে অনেক প্রকার বাঙালির কারুকার্যে তৈরি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি বিক্রি হয়। বিশেষ করে নববর্ষ উপলক্ষ্যে পান্তা ভাত, ইলিশ মাছ এবং বাঙালির খাবারের দোকান বেশি দেখা যায়। তাছাড়া নববর্ষের মেলায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে কেনা বেচা হয়। নীলফামারী জেলার জলঢাকা অঞ্চলে প্রতিবছর ধুমধামের সাথে বৈশাখি মেলা উদযাপিত হয়। এ মেলায় নিত্যপ্রয়োজীয় দ্রব্যাদিসহ বিভিন্ন রকমের মাটির তৈরি খেলনা, পুতুল এবং বাঁশের তৈরি বাঁশি ছাড়াও হরেক রকমের মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। এ মেলা খুবই জাঁকজমক ভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

বৈশাখি মেলা : মাটির তৈরি বিভিন্ন খেলনা, জলঢাকা, নীলফামারী

www.pathagar.com

## ২. নবান্ন

নীলফামারীর প্রায় প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকঅনুষ্ঠান হলো নবান্ন। নতুন ধান কাটার উৎসব দিয়েই নবান্ন উৎসব শুরু হয়। নতুন ফসল ঘরে এলে নবান্নের আয়োজন হয়। অগ্রহায়ণ মাসে কৃষকের ঘরে নতুন ফসল আমন ধান আসে। নবান্নের দিন দুধ, গুড়, নারিকেলযোগে নতুন চালের মিষ্টান্ন তৈরি করে প্রতিবেশির মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। গরিব মিসকিনদের মাঝে এসব পরিবেশন করা হয়।

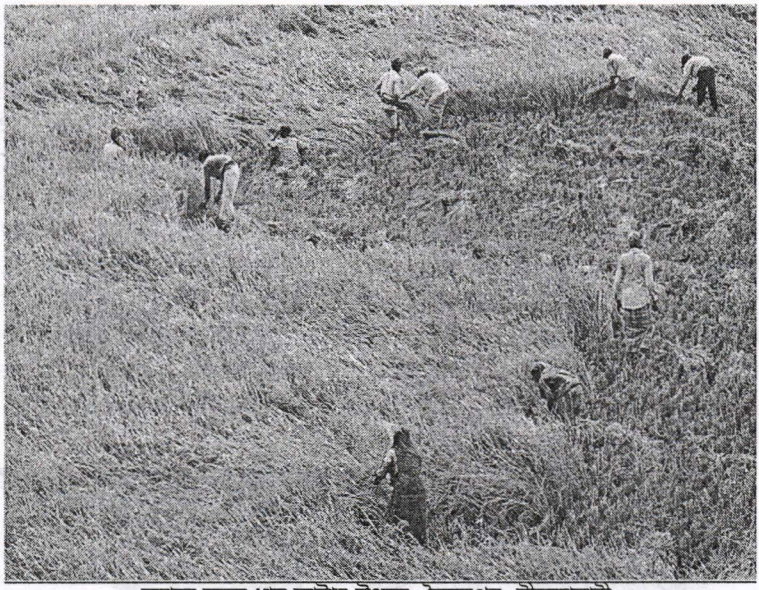

নবান্নে নতুন ধান কাটার উৎসব, সৈয়দপুর, নীলফামারী

**ক. পৌষ মেলা :** প্রতি বছর পৌষ মাসে এ মেলা শুরু হয়। নীলফামারীর সৈয়দপুর অঞ্চলে এই মেলার প্রচলন বেশি দেখা যায়। নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে একটি অন্যতম উৎসব হলো পৌষপার্বণ। এ উৎসব গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন রকমের পিঠা তৈরি করে দলবদ্ধভাবে তা খাওয়া ও পরিবেশন করাই এ উৎসবের মূল আকর্ষণ।

**খ. ভুরকা ভাত বা চড়ুইভাতি :** নীলফামারী জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে ভুরকা ভাত বা চড়ুইভাতি খাওয়ার প্রচলন আছে। গৃহস্থের ধান কাটা, মারা শেষ হলে গ্রামের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এই ভুরকা ভাত এর আয়োজন করে। গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে নতুন চাল এবং টাকা তুলে বাড়ির উঠোনে তারা নিজেরাই রান্নাবান্না করে। প্রচুর আনন্দ উল্লাসের মধ্যে গোল হয়ে বসে সবাই ভুরকা ভাত বা চড়ুইভাতি খায়।

www.pathagar.com

ভুরকা ভাত উৎসব, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী

## অন্যান্য উৎসব

### ১. ঈদুল ফিতর

ঈদুল ফিতর মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব এবং আনন্দের উৎসব। রমজান মাসের চাঁদের প্রথম দিন থেকে এক মাস রোজা রাখার পর পবিত্র ঈদুল ফিতর পালন করা হয়। এই দিনে সামর্থ্যবান মুসলমানরা তাদের ফিতরা গরিব মিসকিনের মাঝে বিতরণ করে এবং অনেক খাবারের আয়োজন করে। এই উৎসবে আত্মীয়স্বজনদের দাওয়াত খাওয়ানোর রীতি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

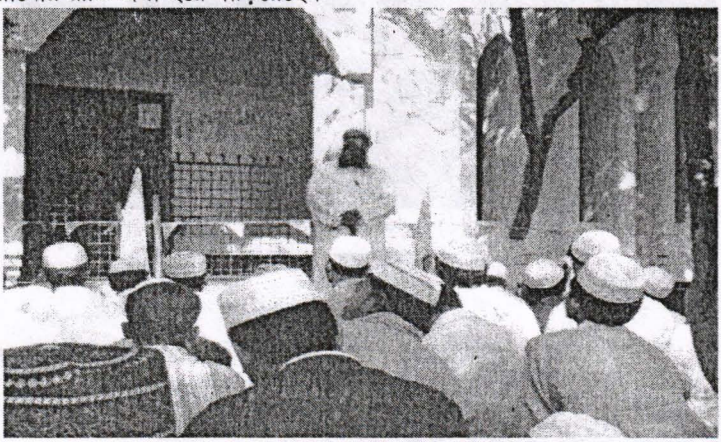

ঈদুল ফিতর : খুতবারত ইমাম, ডোমার, নীলফামারী

www.pathagar.com

## ২. ঈদুল আযহা

মুসলমানদের আরেকটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো পবিত্র ঈদুল আযহা। জিলহজ মাসের ১০ তারিখে ঈদুল আযহা উৎসব পালিত হয়। নীলফামারী জেলার প্রতিটি মুসলমান এ উৎসব পালন করে। প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলমানরা ধর্মীয় নির্দেশনানুযায়ী ত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের প্রিয় জন্তুকে কোরবানি করে।

## ৩. ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর জন্মদিন উপলক্ষে প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখটি ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী হিসেবে নীলফামারীর সব মসজিদে এই উৎসবটি পালন করা হয়। ঈদ অর্থ খুশি মিলাদুন্নবী অর্থ মহানবীর জন্মে খুশি। এ উৎসব উপলক্ষ্যে মসজিদগুলোতে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

## ৪. ওরস

ডোমার রেলস্টেশন থেকে প্রায় দুমাইল দূরে সোনারায় গ্রামে শাহ কলন্দর নামক জনৈক পিরের মাজার রয়েছে। প্রতি বছর ২৭ বৈশাখ এই পিরের মাজারে ওরস পালিত হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ভক্তরা ওরস শরিফে যোগদান করে থাকেন।

মহররম উপলক্ষ্যে উৎসব যাত্রা, সৈয়দপুর, নীলফামারী

মহররম উপলক্ষে উৎসব যাত্রা, সৈয়দপুর, নীলফামারী

## ৫. শবেবরাত

শবেবরাত অর্থ হলো ভাগ্য রজনীর রাত। নীলফামারীর প্রতিটি উপজেলায় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে শবেবরাত পালন করা হয়। এ রজনীতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মসজিদে গিয়ে ইবাদত বন্দেগির মধ্য দিয়ে রাত্রি যাপন করেন। মুসলমান মহিলারা বাড়িতে পর্দা টানিয়ে জিকির আজগরের মাধ্যমে রাত্রি যাপন করেন।

www.pathagar.com

### ৬. মহররম

কারবালার বিষাদময় কাহিনির স্মৃতি অবলম্বনে প্রতিবছর নীলফামারী জেলার বিভিন্ন স্থানে ১০ মহররম পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে তাজিয়া মিছিল ও লাঠিখেলার আয়োজন করা হয়। এ উৎসব বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। তবে এ উপলক্ষ্যে সবচেয়ে বড় উৎসব পালিত হয়ে থাকে সৈয়দপুরে।

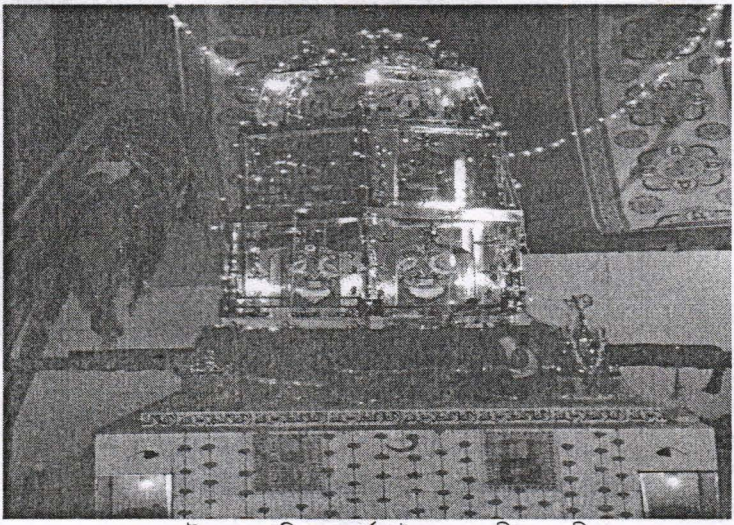

মহররম উৎসবে তাজিয়া প্রদর্শন, সৈয়দপুর, নীলফামারী

### ৭. দুর্গাপুজা

হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। নীলফামারী জেলার প্রতিটি উপজেলায় হিন্দুরা এ উৎসব খুবই জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করে। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে জলঢাকা উপজেলায় তিনদিনব্যাপী মেলা বসে। মেলা উপলক্ষ্যে এখানে যাত্রা গানের আয়োজন করা হয়।

### ৮. ভাদুর দরগা মাজার উৎসব

প্রতি বছর শীতের সময় ভাদুর দরগা মাজার উৎসব হয়। এ উৎসব উপলক্ষ্যে মাজারে শিরনী দেওয়া থেকে শুরু করে টাকাপয়সা, ধান, চাল ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং তিনদিনব্যাপী তাফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

### ৯. গায়ে হলুদ

নীলফামারী জেলার প্রতিটি সমাজ গ্রাম ও শহরের ধনী গরিব উঁচুনিচু শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল পরিবারে গায়েহলুদ একটি অপরিহার্য উৎসব। পানচিনির ভিতর দিয়ে প্রস্তাব পাকাপাকি হলে বিবাহের সাতদিন অথবা তিনদিন আগে থেকে হলুদ মাখানো শুরু হয়। বরকনের স্ব স্ব গৃহে এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। কাঁঠালের পিঁড়ার উপর অথবা পাটিতে বসিয়ে এয়ো আত্মীয়রা হলুদ মাখায়।

www.pathagar.com

গায়ে হলুদ, সৈয়দপুর, নীলফামারী

প্রথমে পাঁচজন এয়ো মুখে মাখিয়ে দেয়। পরে গায়ে মাখানো হয়। সামনে কিছু চাল, পয়সা, পান সুপারি রেখে পাটি পাততে হয়। গায়েহলুদে কনেকে লাল পাড়ের নতুন শাড়ি পরতে হয়। একে "হলুদ মাখা" শাড়ি বলে। হলুদ বাটা ও হলুদ মাখার সময় কন্যার চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে নারীরা গীত গায় ও নাচে।

## ১০. বউভাত

নীলফামারীর প্রতিটি উপজেলায় সব বিয়েতে বরের বাড়িতে বউভাত এর প্রচলন আছে। খাওয়া-দাওয়ার উৎসব এটি। সাধরণত বিয়ের পরের দিন বউভাত অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুরা ঐদিন নববধূকে প্রথম রান্না ঘরে নেয় এবং তার হাতের স্পর্শযুক্ত রান্না খাইয়ে তাকে বরের সমাজভুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

# লোকমেলা

## ক. চৈত্র সংক্রান্তির মেলা

চৈত্রমাসকে বিদায় দেওয়ার জন্য চৈত্রমাসের শেষ দিবসে নীলফামারী জেলার ডোমার অঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তির মেলা বসে। মেলা উপলক্ষ্যে এখানে যাত্রা গান, সার্কাস, পুতুল খেলা ইত্যাদির আয়োজনও হয়ে থাকে। দূর দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ এ মেলায় অংশ নিয়ে মেলাকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

## খ. টটুয়ার বান্নিমেলা

নীলফামারী জেলার বড়ভিটার মেলাবার মৌজায় স্থানীয় বুলাই (নদীটি স্থানীয় ভাবে বুলাই নামে পরিচিত) নদীর তীরে "অষ্টমী স্নান" উপলক্ষ্যে চৈত্র মাসে টটুয়ার বান্নির মেলা বসে। এ মেলায় অনেক লোকের সমাগম হয়। এ মেলা উপলক্ষ্যে সার্কাস, যাত্রা, পুতুল নাচ ইত্যাদি দেখানো হয়।

## গ. ঘুড়ির মেলা

নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় ঘুড়ির মেলা বসে। এ মেলা উপলক্ষ্যে ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতা করা হয়। এ প্রতিযোগিতায় যার ঘুড়ি বেশি দূর আকাশে উড়তে পারে সে বিজয়ী হয়। বিজয়ীদের মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া হয়।

## ঘ. সঙ্গলসী বা দারোয়ানীর মেলা

সঙ্গলসী গ্রামে কাজী সহতাই নামক জনৈক ব্যক্তি একটি মেলা বসাতেন। উক্ত সঙ্গলসীর মেলার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটার ফলে সৈয়দ পাগলা পীর তাঁর খানকা শরীফকে কেন্দ্র করে একটি মেলা বসানোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। পীর সাহেবের ইচ্ছায় দারোয়ানীতে মেলা বসানোর পর থেকে সঙ্গলসীর মেলা আস্তে, আস্তে তার পূর্বের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে এবং দারোয়ানীর মেলা আস্তে আস্তে জমে উঠতে শুরু করে।

## ঙ. বড়ভিটার মেলা

বড়ভিটা নামক স্থানে মহররম উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। এটি 'ডাকার মেলা' নামে পরিচিত।

## চ. হালখাতা

নতুন বছর এলে শুরু হয় দোকানদারদের নতুন চিন্তাভাবনা। তারা পূর্বের দিনের সব বাকি বকেয়া তোলার জন্য হালখাতার আয়োজন করে। নীলফামারীর প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে ছোট বড় সব দোকানদার হালখাতার আয়োজন করে থাকে। ব্যবসায়ীরা হালখাতা উপলক্ষ্যে লোকজনকে মিষ্টি ও ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে।

www.pathagar.com

### ছ. কচুকাটার মেলা

কচুকাটা নামক স্থানে একটি মেলা বসে। জায়গার নামানুসারে এই মেলাটি 'কচুকাটার মেলা' নামে পরিচিত।

### জ. বারুনীমেলা

নীলফামারী জেলার নীল সাগরে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার সময় বারুনী স্নান উপলক্ষ্যে এখানে মেলা বসে।

### ঝ. হাজীর মেলা

নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার চাওরা ডাঙ্গী গ্রামে প্রতি বছর বৈশাখ মাসে হাজীর মেলা বসে। এখানে একজন লোক বাস করে তার নাম দুলাল হাজী। তার কোনো সন্তান নেই। এখানে তিনি একটি এতিমখানা চালু করেছেন। এই এতিম খানায় শুধু এতিম মেয়েদেরকে লালন পালন করে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে থাকেন।

www.pathagar.com

# লোকাচার

## ১. জিদ্দাফতেয়া

নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলায় চারাডাঙ্গী গ্রামে জিদ্দাফতেয়া প্রচলন আছে। কোনো ব্যক্তির সন্তান না থাকলে মৃত্যুর পূর্বেই লোকদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ানো হয় এটি হলো জিদ্দাফতেয়া।

## ২. আকিকা

নীলফামারী জেলার একটি প্রাচীন উৎসব হলো আকিকা। সাধারণত শিশুর পিতা এক মাস অথবা তিন মাসের মাথায় ছাগল ভেড়া (ছেলের জন্য এক জোড়া মেয়ের জন্য একটি) জবাই করে আকিকা দিয়ে থাকে। সাধারণত শিশুর পিতা মাতা কোরবানির গোশত গ্রহণ করে না। মূলত আকিকা হলো সন্তানের নাম রাখার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক ধরনের খানাপিনার উৎসব।

## ৩. খাতনা

খাতনা উৎসবটি বর্তমানে নীলফামারী জেলার মধ্যে আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। অনেক আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের দাওয়াত করা হয়। এ উৎসবে মুসলমান পুরুষ সন্তানের মুসলমানি করার আয়োজনকেই খাতনা উৎসব বলা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

# লোকখাদ্য

'মাছে ভাতে বাঙালি'। এ প্রবচন নীলফামারী অঞ্চলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে প্রধান খাদ্য মাছ, ভাত, ডাল হলেও এ অঞ্চলের লোকখাদ্যে বৈচিত্র্য আছে। যেমন : পান্তাভাত, বউক্ষুদা, খিচুড়ি, চালভাজা বা ভুজনা, গমরুটি, গমভাজি, ছাতু, খই, মুড়ি-মুড়কি, চিড়া, ক্ষীর বিভিন্ন পিঠা ইত্যাদি এসবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলো :

**ক. পান্তাভাত :** পান্তাভাত সকালের খাবার। পূর্ববর্তী রাতে রান্না করা ভাতে পানি মিশ্রণ করে মাটির হাঁড়িতে রেখে দিলে সকালবেলা তার নাম হয় পান্তাভাত। শুকনো পোড়ামরিচের ভর্তা, লবণ এবং পেঁয়াজ দিয়ে এ পান্তাভাত খাওয়া হয়। নীলফামারীর কৃষক সমাজের খুব প্রিয় খাবার এই পান্তা ভাত।

**খ. বউখুদা :** চালের কুড়া বা ভাঙ্গানো ক্ষুদ্র অংশ যেগুলো ভাত তৈরির উপযুক্ত নয় প্রধানত সেগুলো দিয়েই বউখুদা তৈরি করা হয়। চালের কুড়ার সাথে লবণ, তেল এবং হলুদ মিশিয়ে অনেকটা ভাতের মতো করে বউখুদা রান্না করা হয়। বউখুদা অনেকটা শিশুদের মুখরোচক খাবার। নীলফামারীর গ্রামাঞ্চলের শিশুদের মধ্যে এ খাদ্য খুব প্রিয়।

**গ. খিচুড়ি :** খিচুড়ি অনেকটা ভাতের বিকল্প খাদ্য। চালের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের সব্জির মিশ্রণ ঘটিয়ে অনেকটা নরম ভাতের মতো করে খিচুড়ি তৈরি করা হয়। খিচুড়ি খেতে অতিরিক্ত কোনো সহায়ক তরকারির প্রয়োজন হয় না। কোথাও কোথাও খিচুড়ির মধ্যে গরু-ছাগলের মাংসের মিশ্রণ করা হয়। নীলফামারীর প্রত্যেকটি গ্রামেই খিচুড়ি খাবারের প্রচলন আছে।

**ঘ. চালভাজা বা ভুজনা :** চালের সাথে সামান্য লবণ মিশিয়ে খোলা বা কড়াইয়ের মধ্যে কড়কড়া করে ভেজে নিলেই চালভাজা বা ভুজনা হয়ে যায়। নীলফামারী অঞ্চলের খেতে খামারে খেটে খাওয়া শ্রমিকেরা দিনের মধ্যভাগে বিশ্রামের সময় চালভাজা বা ভুজনা খেয়ে থাকে। পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ চালভাজার সহায়ক খাবার।

**ঙ. গমরুটি :** নীলফামারী অঞ্চলের দিন-মজুর শ্রেণির অধিকাংশ মানুষ ভাতের বিকল্প গমের আটার তৈরি রুটি খেয়ে থাকে। আটার মধ্যে পানি নিয়ে মেখে নরম করে তৈরি করা হয় কাওয়া। কাওয়া পরিমাণমতো গুটি গুটি করে নিয়ে পিঁড়া ও বেলনার সাহায্যে রুটি বানানো হয়। অতঃপর খোলায় ভেজে তাকে খাবার উপযুক্ত করা হয়।

**চ. ছাতু :** গমকে ভুজনার মতো করে ভেজে নিয়ে ঢেঁকির মধ্যে পাড় দিয়ে ছাতু বানানো হয়। এটি খুব সহজলভ্য খাবার। নীলফামারী অঞ্চলের এক সময়ের হতদরিদ্র মানুষেরা বিচি কলা বা আটিয়া কলা দিয়ে এ খাবার খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। কোনো কোনো অঞ্চলে এখাবারের প্রচলন এখনো আছে।

www.pathagar.com

**ছ. খই** : উনুনের উপরে কড়াই বা মাটির খোলার মধ্যে তপ্ত বালুতে ধান ফেলে দিয়ে বাঁশের তৈরি খোঁচার সাহায্যে নাড়াচাড়া করলেই ধানের পেট চিড়ে খই বেড়িয়ে আসে। গুড় মিশ্রিত খই এর দলা অনেকটা সুস্বাদু খাবার। সকালের নাস্তা হিসাবে এ খাবারের প্রচলন নীলফামারীর গ্রামগুলোতে লক্ষ্য করা যায়।

**জ. মুড়িমুড়কি** : মুড়ি তৈরির প্রক্রিয়া অনেকটা খই এর মতো। তবে এর সৃষ্টি সরাসরি ধান থেকে নয়, চাল থেকে। মুড়ির মোয়া বা মলা শিশুদের খুব প্রিয় খাবার। গুড় মিশানো ঝরঝরা খই এবং মুড়ি এক সঙ্গে মিশ্রণ করলে তার নাম হয় মুড়িমুড়কি। নীলফামারীর প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে এই মুড়িমুড়কি এক সময় জলপান নামে পরিচিত ছিলো। এ অঞ্চলের যেকোনো গ্রাম্যভোজন বা জিয়াফত অনুষ্ঠানে সাবুর ক্ষীরের সাথে মুড়িমুড়কি খাওয়ার প্রচলন আছে।

**ঝ. চিড়া** : লোকখাদ্যের মধ্যে চিড়া অনেকটাই সহজলভ্য খাদ্য। ক্ষুধা নিবারণের ক্ষেত্রে চিড়া অনেকটা ভাতের কাজ করে থাকে। ধানকে বিশেষ ব্যবস্থায় পানিতে ভিজিয়ে নরম করে অতঃপর তা খোলায় ভেজে কিছুটা তপ্ত করে নেওয়া হয়। তপ্ত নরম ধান ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে চিড়া তৈরি করা হয়। নীলফামারীর প্রত্যেক অঞ্চলেই চিড়া খাওয়ার প্রচলন আছে।

**ঞ. ক্ষীর** : ক্ষীর মিষ্টান্ন জাতের খাবার। নীলফামারীর গ্রামাঞ্চলে শীত মৌসুমে ক্ষীর খাওয়ার প্রচলন বেশি লক্ষ করা যায়। চালের সাথে পরিমাণ মতো দুধ ও গুড় মিশিয়ে ভাতের মতো করে ক্ষীর রান্না করা হয়। নীলফামারীর গ্রামগুলোতে যেকোনো ভোজ উৎসবে ভাত খাওয়ার পূর্বে নিমন্ত্রিত অতিথিদের ক্ষীর খাওয়ানোর সু-ব্যবস্থা থাকে।

**ট. দই** : নীলফামারী অঞ্চলে মিষ্টান্ন জাতের লোকখাদ্যের মধ্যে দই অন্যতম। দই সাধারণত বাড়ি বাড়ি তৈরি হয় না। এ অঞ্চলের গৃহস্থ পরিবারগুলোয় যেকোনো পারিবারিক ভোজন অনুষ্ঠানে কিংবা বিয়ের অনুষ্ঠানে দই খাবার এর ব্যবস্থা সর্বাধিক লক্ষ করা যায়। নীলফামারী অঞ্চলে দই প্রস্তুতকারীকে দইওয়ালা বলে। দইওয়ালারা হাঁড়িতে দই নিয়ে ভাড় সাজিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে দই বিক্রি করে।

**ঠ. পিঠা** : পিঠা আবহমান বাংলার লোকসংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। নারী শিল্পকলার পরম উদ্ভাবন এটি। নীলফামারী অঞ্চলের নারীরা বিশেষ করে গ্রামীণ রমণীগণ এ শিল্পের নিপুণ উদ্ভাবক। এ অঞ্চলের যেকোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে, ব্রত-পার্বণে, পূজা-ঈদে, পিঠা তৈরির রেওয়াজ আছে। এ অঞ্চলে শীত মৌসুমে বিশেষ করে পৌষপার্বণে শীতের পিঠা বা পৌষ পিঠার যেমন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে তেমনি সেগুলো স্বাদে ও রুচিতেও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

পিঠার প্রধান উপকরণ আতপ চালের আটা। উপকরণ এবং প্রণালি বিচারে এ অঞ্চলে প্রধানত পাঁচ ধরনের পিঠা তৈরি হয়। যেমন আটার সাথে তালের রস মিশিয়ে তালপিঠা, গুড় মিশিয়ে গুড়পিঠা, নারিকেল মিশিয়ে নারিকেলপিঠা, তেলে ভেজে তেলপিঠা এবং বাষ্পীয় তাপে ভাপা পিঠা বা ভাগাপিঠা। উপকরণের ভিন্নতা থাকলেও প্রায় প্রত্যেক পিঠাতে কমবেশি গুড় মেশানো হয়। কোনো কোনো পিঠা সম্পূর্ণ মিষ্টি বা গুড় বর্জিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

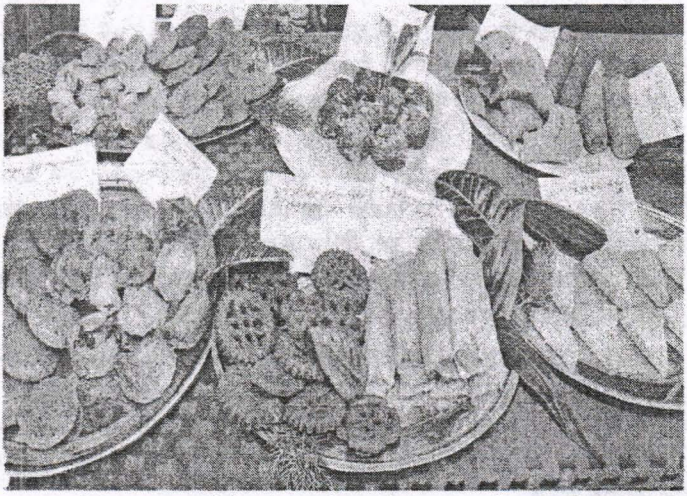

বিভিন্ন রকমের পিঠা পৌষপার্বণ অনুষ্ঠান, সদর, নীলফামারী

নীলফামারী অঞ্চলের পিঠার বহু বৈচিত্র্য থেকে এগুলোর বহু নামকরণও হয়ে থাকে। নামকরণ নিয়ে এ অঞ্চলের পিঠার একটি সংক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যেতে পারে। যেমন : কুলিপিঠা, কলাপিঠা, চিতাপিঠা, দুধপিঠা, ডিমপিঠা, তেলপিঠা, নোনাসপিঠা, তালপিঠা, নারকেলপিঠা, গড়গড়িপিঠা, সিমপিঠা, পাটিসাপটাপিঠা, ভাগাপিঠা, পুড়িপিঠা ইত্যাদি। এ অঞ্চলে কোনো কোনো পিঠা ছাঁচের সাহায্যে তৈরি করে তার উপর বিভিন্ন নকশা চিত্র আঁকা হয়ে থাকে। এগুলোকে এ অঞ্চলের নকশিপিঠা বলে। এসব নকশিপিঠা এ অঞ্চলের রমণী মনের শিল্পী প্রতিভার সাক্ষ্য দেয়।

www.pathagar.com

# লোকনৃত্য

মূলত লোকনাটকের সাথে সম্পৃক্ত দেহ ভঙ্গিগত এক শিল্প। নাট্যদৃশ্যের বাহিরেও আরো অনেক লোকনৃত্য আছে যা নীলফামারী অঞ্চলকে বিশেষত্ব দান করেছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিয়ের সময় পরিবেশিত নৃত্য, মেয়েলি গীতের সাথে পরিবেশিত নৃত্য, পুতুল খেলার নৃত্য, লাঠিখেলার নৃত্য প্রভৃতি।

**১. বিয়ের সময় পরিবেশিত নৃত্য :** 'গীত বিনে বিয়ে নেই, নাচ বিনে গীত নেই' এ সত্যকে লালন করেই নীলফামারীর গ্রাম্য অঞ্চলের বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে পরিবেশিত হয় নানা রকমের নাচ বা নৃত্য। নৃত্য পরিবেশনকারী নারীদেরকে এ অঞ্চলে নাচুনি বলা হয়। আর গীত পরিবেশনকারীদেরকে বলা হয় গিদালি।

বিয়ে অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনরত নাচুনি, সৈয়দপুর, নীলফামারী

**২. নবান্ন উৎসবে পরিবেশিত নৃত্য :** নবান্ন উৎসব নীলফামারী জেলার লোকজ ঐতিহ্যের ধারক। নতুন ধানের অন্ন ও পিঠা-পায়েস দিয়ে অনেকটা পারিবারিকভাবে এ উৎসব পালন করা হয়। অতীতে ধনী গৃহস্থ পরিবারে এ উৎসবে নৃত্য গীতের আয়োজন করা হতো। নবান্ন উৎসবে পরিবেশিত একটি নৃত্য গীতের বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হলো:

দুলা আইল গামছা ঘাড়ে
নাচিয়া নাচিয়া রে।



www.pathagar.com

নয়া ভাতের গন্ধ পায়া
না থাকিবার পারে রে।
কোন্‌টে গেলু বড় বুজান
বেচন (পাখা) হাতত আইসেক রে
নয়া ভাতের গন্ধে দামান
না থাকিবার পারে রে।

**৩. আরতিনৃত্য :** এটি মূলত দেবীর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে পরিবেশিত নৃত্য। সনাতন সমাজে সাধারণত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দেবীকে সামনে রেখে এ নৃত্য পরিবেশিত হয়। ধুপধোয়া বিশিষ্ট দুটি দিয়াড়ি হাতে নিয়ে বিভিন্ন রকমের অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে এ নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে।

**৪. অন্যান্য নৃত্য :** উল্লিখিত নৃত্যগুলো ছাড়াও পালাগানের নৃত্য, জারিগানের নৃত্য, লাঠিখেলার নৃত্য ইত্যাদি বিষয়ভুক্ত নৃত্যগুলো এ অঞ্চলের বিষয়ভিত্তিক লোক আয়োজনে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

# লোকক্রীড়া

নীলফামারী অঞ্চল লোকক্রীড়ায় বেশ সমৃদ্ধ। এর ঐতিহ্যও বেশ প্রাচীন। এ অঞ্চলের লোকক্রীড়াগুলোর অধিকাংশই কায়িক শ্রম ও নৈপুণ্য সাপেক্ষ। বুদ্ধিমত্তা তথা গাণিতিক ক্রীড়ার সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। সব মিলিয়ে এ অঞ্চলে প্রায় ৫০-৬০ রকমের খেলা প্রচলিত আছে। নীলফামারী জেলার সর্বত্রই এখনো কিছু প্রাচীন খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নীলফামারী জেলায় প্রচলিত লোক খেলার মধ্যে দড়ি খেলা, ফুললন, এক্কা দোক্কা, কিতকিত, হাডুডু, কানামাছি, দাড়িয়া বান্ধা, গোল্লাছুট, ছিবুড়ি, আমচি-বাগচি, গোস্তচোরা, খস্তাখস্তি, তালগাছ, মার্বেল, টোকাটুকি, মোরগযুদ্ধ, আতাপাতা, পিটিঝাপ্পা, কলম চোরা, রুমাল চুরি, হাঁড়ি ভাঙ্গা, সাগাই সাগাই, বাঘ-বকরি, পাইত, বউ বউ, টিপ, লাঠি, বিস্কুট, চকলেট, লুকোচুরি, টিলো, বোমবাস্টিং, ইকরি মিকরি, ইতল পিতল, অকদুল বগদুল, ট্রেন ট্রেন, কাটোল কাটোল, নুনের বস্তা, উল্টাবাজি, ডিগবাজি, চেংগু বা ডাংগুলি, সুইসুতা, পাচড়া পাচড়ি, আম-জাম, চোর ডাকাত, বুড়ির বেটি ও ধরাধরি খেলা উল্লেখযোগ্য। নিম্নে নীলফামারী অঞ্চলে প্রচলিত কিছু খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো :

**ক. গোল্লাছুট :** এটি একটি দলীয় খেলা। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা একত্রিত হয়ে দলবদ্ধ হয়ে খোলা মাঠে এই খেলাটি খেলে থাকে। এই খেলার শুরুতে খেলোয়াড় ভাগ করে নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মাঠের শেষ প্রান্তে একটি সীমানা রেখা নির্দিষ্ট করা থাকে। মাঠের অপর প্রান্তের একটি নির্দিষ্ট গর্ত বা বিন্দুকে কেন্দ্র করে প্রথম দল পরস্পর হাত ধরে ঘুরতে থাকে। এক সময় সুযোগ বুঝে বিপক্ষ দলের বাধা কৌশলে অতিক্রম করে সীমানা রেখা পার হয়ে আসে। অতঃপর সীমানা রেখা অতিক্রমকারী খেলোয়াড়রা কেন্দ্রবিন্দু থেকে শিকল লম্ফ দিয়ে দিয়ে সীমানা রেখা বরাবর অগ্রসর হয়। এভাবে লম্ফের মাধ্যমে সীমারেখা অতিক্রম করতে পারলে সে দল বিজয়ী হয়।

**খ. ইকরিবিকরি :** ইকরিবিকরি একটি ছড়াকাটা খেলা। নীলফামারী জেলার প্রতিটি অঞ্চলে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা বর্ষা কালে এই খেলা বেশি খেলে। বর্ষা কালে যখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ে তখন ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে চক্রাকারে হাটুমুড়ে বসে। অতঃপর মাদুরের মধ্যে তাদের দুহাত উপুড় করে রাখে। দলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়সে বড় কেউ একজন প্রধান হয়ে ইকরিবিকরি ছড়াটি আবৃত্তি করে। ছড়ার ধরন হলো এরকম :

ইকরিবিকরি চামচিকরি
চামত পইলো মাছি
কোদাল দিয়া চেচি
কোদাল হইলো ভোতরা
টাটকা মাছে ধোতরা।

www.pathagar.com

ইকরিবিকরি খেলায় মত্ত ছেলেমেয়ে, গাড়াগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী

দলের প্রধান ছড়াটি উচ্চারণ করে এবং উচ্চারণের সময় সবার আঙ্গুল স্পর্শ করে। সব শেষে যে আঙ্গুলে গিয়ে ছড়া থামে সে আঙ্গুলটি মুড়ে রাখা হয়। যে আঙ্গুলটি একবার মুড়ে সে আঙ্গুলকে আর স্পর্শ করা হয় না। এভাবে আবার খেলা শুরু হয়। শেষে যার একটি আঙ্গুল থাকে সেই চোর সাব্যস্ত হয়।

**গ. উটুগুটু বততলা :** এই খেলা খেলতে সাধারণত চার-পাঁচজন লাগে। এই খেলার নিয়ম হলো প্রত্যেক প্রতিযোগীর দুই হাত মাটিতে রাখতে হয়। প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে একজন হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে বলে :

উটুগুটু বততলা, সুপারিতলার পান
এদেশে ওদেশে যুদ্ধ বততলার গান।
আয় গোয়ালি হাট যাই
দুধ মাকা ভাত খাই।
এ্যালের পাত, ব্যালের পাত
ছিরি ছুকটি হাত কাট।

**ঘ. কড়ি খেলা :** এই খেলায় সাধারণত পাঁচটি কড়ি লাগে। দুজন মিলে এই খেলা খেলা যায়। অন্য খেলার মতো এ খেলাতেও জয় পরাজয় আছে। খেলার সময় যে ছড়া কাটা হয় তা হলো :

ফুলন ফুলন ফুলন, এককে দুলন, তিলন
ঝামন ঝামন ঝামন, এককে দোজামন
সুরুসাম সুরুসাম সুরুসাম, এককে দুসুরুসাম

www.pathagar.com

কদম কদম কদম, এককে জোর কদম
বকুল হামফু করিয়া ফুল, এককে জোর বকুল
তারিঝাম নিয়ারাম সুরিমরাম, এককে জোতারি জাম
ফুলস্টপ ফুলস্টপ ফুলস্টপ, এককে জোর ফুলস্টপ।
হাচ্চা বগের বাচ্চা, হাচ্চা বগের বাচ্চা,
তিন হাচ্চা, তিন কাচ্চা, তিন হাচ্চা।
দুই হাচ্চা, দুই কাচ্চা, দুই হাচ্চা।
গুটিকে গুটিকে বদলি, দশলি থোকা
ঝিরির ভাই ওহারা, পেট কাটে দোহারা
পেটের নাড়ি, নৌকার দাড়ি
অগদুল বগদুল করিফুল ফোটে
কোনো কোনো রাজা পোকর ছেকে
ছেকুক পুকুর, শুকাক বিল
সোনার কটুয়া, উপার খিল।

**ঙ. আতর বিলাই ন্যাংড়া বিলাই :** এই খেলা খেলতে পাঁচজন খেলোয়াড় লাগে। পাঁচ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন দলনেতা থাকে। দলনেতা গোপনে তার হাতের একটি আঙ্গুল ফুটিয়ে নেয়। এরপর আঙ্গুলগুলো সবাইকে ধরতে বলে। যে আঙ্গুলটি ফুটানো হয়েছে সেটি যে ধরবে সে হবে চোর। অতঃপর সকলে মিলে চোরের পিঠে আস্তে আস্তে আঘাত করবে আর বলবে :

আতর বিলাই ন্যাংড়া বিলাই
ধরিয়া কিলাই।

**চ. উড়ি উড়ি পোকা :** এই খেলাতেও একজন দলনেতা থাকে। খেলার শুরুতে দলনেতা বলে, এগিনা কি? সহযোগী খেলোয়াড় জবাবে বলবে ডালিম। তখন দলনেতা আবার বলবে খাইস কি? সহযোগী খেলোয়াড় জবাবে বলবে মাঞ্জা। ফেলাইস কি? চোচা। কার বাড়ির পোকা। তারপর এক পা তুলে সবাই বলবে :

উড়ি উড়ি পোকা
পাও ফেলাইলে পচা।

যে খেলোয়াড় সবার শেষে মাটিতে পা ফেলবে সে পরেরবার খেলার সময় দলনেতা হবে। এভাবে খেলা চলতে থাকবে।

**ছ. নুনঢোপ :** এই খেলার শুরুতে খেলোয়াড়দেরকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে টসে ভাগ্য পরীক্ষা করা হয়। কোন্ দল আগে খেলবে তা নির্ধারিত হওয়ার পর খেলা শুরু হয়। যে দল প্রথমে খেলার সুযোগ লাভ করে সে দলের খেলোয়াড়রা পরস্পর হাতধরাধরি করে দাঁড়ায়। সে সময় বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথম দলের খেলোয়াড়রা হাতধরাধরি করে ঘুরতে থাকে। সুযোগ পেলে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের চোখকে ফাঁকি দিয়ে প্রথম পক্ষের কোনো একজন খেলোয়াড় ছুটে দূরে গিয়ে বলবে নুনঢোপ। এসময় বিপক্ষের কোনো খেলোয়াড় তাকে ছুঁয়ে দিতে পারলে বিপক্ষের খেলোয়াড়টি সেই স্থান থেকে তিনটি লাফ দেওয়ার সুযোগ পাবে। তিন লাফে

www.pathagar.com

কেন্দ্রে আসতে পারলে দ্বিতীয় দল ক্ষমতায় আসবে। না হলে তারা পুনরায় খেলতে থাকবে। যদি বুড়ি পালাতে পারে তা হলে তারা এক দান পাবে।

**জ. টেলিফোন টেলিফোন :** এই খেলা খেলার সময় চার থেকে আটজন খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হয়। দুজন খেলোয়াড় মাটিতে বসে একটি রশি ধরে ঘুরাতে থাকে। এই রশির উপর একজন খেলোয়াড় লাফাতে লাফাতে বলবে :

টেলিফোন টেলিফোন টানা টানা
টেলিফোন বলে ঘুরে আনা।

এই সময় খেলোয়াড়কে ঘুরতে হবে।

টেলিফোন টেলিফোন টানা টানা
টেলিফোন বলে শিল্প দানা।

এই সময় খেলোয়াড়কে মাটিতে বসতে হবে।

টেলিফোন টেলিফোন টানা টানা
টেলিফোন বলে ঘুরে আনা।

এই সময় খেলোয়াড়কে বাহিরে বের হয়ে আসতে হবে। খেলা চলাকালে ঘূর্ণায়মান রশিটি খেলোয়াড়ের গায়ে লাগলে সে আউট হয়ে যাবে। যেকোনো একজন গেলে দলের আংশিক জয় হবে।

**ঝ. উপরান্তি বাইস্কোপ :** নীলফামারী জেলার প্রতিটি অঞ্চলের মেয়েরা উপরান্তি বাইস্কোপ খেলাটি খেলে থাকে। তবে জলঢাকা থানার বালাগ্রাম ইউনিয়নের মেয়েরা স্কুল টিফিনের সময় বেশি খেলে থাকে। উপরান্তি বাইস্কোপ খেলাটি ছড়ার খেলা। দুটি মেয়ে সামান্য দূরত্বে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরে হাত উঁচু করে ধরে। অন্যান্যরা সারি বেঁধে ঐ হাতের তলা দিয়ে চক্রাকারে ঘোরে। আর সবাই মিলে নিম্নোক্ত ছড়াটি পাঠ করে :

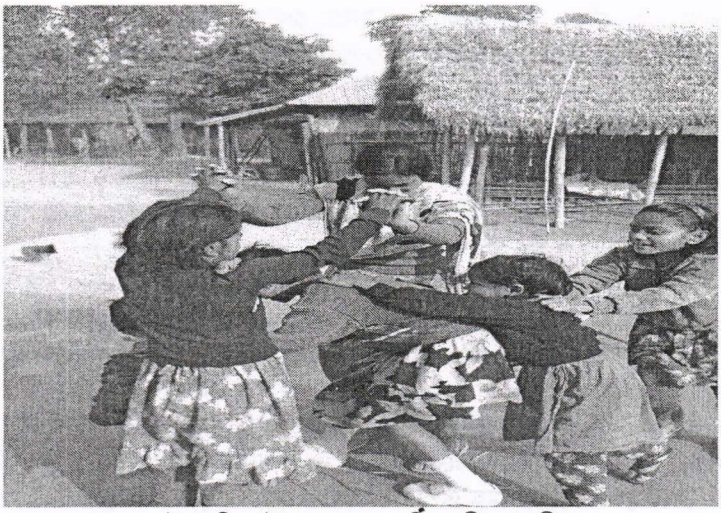

উপরান্তি বাইস্কোপ খেলা ডালিয়া, নীলফামারী

www.pathagar.com

উপরান্টি বাইস্কোপ
নাইন টেন টেসকোপ
চুলটানা বিবিয়ানা
সোহেব দাদার বৈঠকখানা
রাজবাড়িতে যেতে
পান সুপারি খেতে
পানের আগা মরিচ বাঁটা
স্প্রিংয়ের চাবি আটা
যার নাম মধুমালা
গলায় দিব মুক্তার মালা...।

মুক্তার মালা কথাটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুইজন বালিকা নিকটতম যে বালিকাকে ধরে ফেলবে, তখন সবাই মিলে ঐ বালিকাকে উপরে তুলে কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরি করবে।

**ঞ. বউছি :** বউছি দুপক্ষের সংঘবদ্ধ খেলা। নীলফামারীর প্রায় সব অঞ্চলেই এই খেলার প্রচলন আছে। বিশেষ করে গ্রামের স্কুলে ছেলেমেয়েরা টিফিন বা বিরতির সময় এ খেলাটি অধিক খেলে থাকে। সমান সংখ্যক খেলোয়াড় (প্রায় আট-দশজন) নিয়ে দল গঠিত হয়। সমতল ভূমিতে ২০-২২ হাত ব্যবধানে দুটো ঘর কাটা হয়। একটি বউ ঘর অপরটি খেলোয়াড়ের ঘর বা জারিঘর। টস অথবা আপোসে কোন্ দল প্রথম খেলার সুযোগ পাবে তা স্থির করা হয়। একে দান বা ঘাই বলা হয়। দলের মধ্যে অধিকতর চালাক ও সমর্থক খেলোয়াড় বউ বা বুড়ি বসে। সমস্ত খেলাটিতে বউ বা বুড়ির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিপক্ষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বউ তার ঘর থেকে জুড়ি ঘরে পৌঁছাতে পারলে এক পয়েন্ট হয়। এভাবে উভয়পক্ষ পর্যায়ক্রম খেলতে থাকবে এবং যার পয়েন্ট বৃদ্ধি পাবে সে দলের জিত হবে। খেলার শুরুতে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা উভয় ঘরকে ঘিরে সুবিধা ও প্রয়োজনমতো স্থান করে নেয়। লক্ষ্য হলো বউকে জুরি ঘরে আসতে না দেওয়া। জুরিঘরে আসার সময় বউকে ঘরের বাইরে স্পর্শ করতে পারলে বিপক্ষ দল দান পায়। উল্লেখ্য যে, বউকে জুরিঘরে নিয়ে আসার জন্য প্রথমপক্ষের কেউ একজন একদমে বা এক নিশ্বাসে 'ছি...' ধ্বনি উচ্চারণ করে বিপক্ষ দলকে ছোঁয়ার জন্য তাড়া করে। একে 'ছি' দেওয়া বলে। এ থেকে খেলাটির নাম বউছি হয়েছে বলে মনে করা হয়। ছি দিয়ে কাউকে স্পর্শ করে দম রেখেই যদি জুড়িঘরে ফিরে আসতে পারে তবে উক্ত খেলোয়াড় মারা যাবে। আর যদি আগেই শ্বাস ছেড়ে দেয় তবে সেই মারা পড়বে। দম শেষ হয়ে এলে সে প্রয়োজনবোধে বউয়ের ঘরেও আশ্রয় নিতে পারে। বউছি খেলায় যে একবার মারা পড়ে খেলা পার না হওয়া পর্যন্ত সে আর জীবিত হতে পারে না। যখন ছি দেওয়া হয় তখন নিরাপদ বুঝে বউ জুড়িঘরে চলে আসতে পারলে পয়েন্ট পায়। বিপক্ষের সবাই মারা পড়লে বউ এর পথ নিরঙ্কুশ হয়। আর যদি ছি দিতে গিয়ে স্বপক্ষের সবাই মারা পড়ে তখন বউকে একাকী ঝুঁকি নিয়ে দৌড় দিয়ে জুরিঘরে আসতে হয়। এ সময় বউ মারা পড়লে বিপক্ষদল খেলা পায়।

**ট. হাডুডু বা টিকটিক :** হাডুডু বা টিকটিক খেলা মূলত সংঘবদ্ধ দলের খেলা। এ খেলাটি জলঢাকা থানার গোলমুন্ডা অঞ্চলে এখনও প্রচলন আছে। তাছাড়া ডোমার

www.pathagar.com

থানার টিকটিক খেলা খুবই জনপ্রিয়। এ খেলার জন্য মাটিতে ২১×১৪ বর্গ হাতের একটি ঘর কেটে নেওয়া হয়। মাঝ বরাবর রেখা টেনে ঘরটিকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়। অতঃপর খেলার প্রস্তুতি হিসাবে দুদল দুঘরে অবস্থান নেয়। খেলা শুরু হলে এক

হাডুডু খেলা গোলমুন্ডা, জলঢাকা, নীলফামারী

পক্ষের যেকোনো একজন মাঝ রেখা থেকে শ্বাস বন্ধ করে অপরপক্ষের দলের কাছে যায় কাউকে স্পর্শ করে মেরে আসতে। সে যে দম বন্ধ করে আছে তা জানানোর জন্য শ্রুতিগ্রাহ্য স্বরে হাডুডু বা টিকটিক বা কপাটি কপাটি প্রভৃতি অর্থহীন ধ্বনি অথবা দুচার চরণের ছড়া আবৃত্তি করতে পারে। ছড়াগুলি সাধারণত স্বীয় বীরত্বব্যঞ্জক অথবা প্রতিপক্ষের প্রতি অবমাননা করা ও বিদ্রুপাত্মক হয়ে থাকে। সম্পূর্ণরূপে নিশ্বাস বন্ধ রেখে ডু দেওয়ার সময় বিপরীত পক্ষের যেকোনো একজনকে ছুঁয়ে গাং পার হলে যাকে ছুঁয়েছে সে "মারা" যাবে অর্থাৎ সে খেলার অধিকার হারাবে। আর যদি নিজেই আটকা পড়ে যায় এবং দম ছেড়ে দেয় তবে সেই মারা পড়বে। দ্বিতীয়বার ডু দিতে আসবে অপর পক্ষের যেকোনো একজন খেলোয়াড়। একে পাল্টা বা ডু বলা হয়। ছোঁয়াছুঁয়ি বা ধরা পড়ার ফলাফল একই রকম। না ছুঁয়ে বা ধরা না পড়ে নিজ ঘরে ফিরে এলে ফল অমীমাংসিত ও অপরিবর্তিত থাকে। হাডুডু খেলার লক্ষণীয় একটা দিক হলো : বিপক্ষের কোনো খেলোয়াড়কে মারতে পারলে পর্যায়ক্রমে নিজ দলের খেলোয়াড় জীবিত হয়ে ওঠে। কোনো এক পক্ষের সকল খেলোয়াড় মারা পড়লে অপরপক্ষের একটা "গেম" হয়।

**ঠ. ডাংগুলি :** ডাংগুলি মূলত বাহুবলের খেলা। এ খেলাটি নীলফামারী জেলার ডিমলা থানার বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের জনপ্রিয় খেলা। তাছাড়া নীলফামারীর প্রায় প্রত্যেক গ্রামাঞ্চলে এ খেলার পরিচিতি আছে। এ খেলাটি দলবদ্ধভাবে পরিবেশিত হয়।

www.pathagar.com

একহাত পরিমাণ একটি লাঠি বা ডান্ডা এ খেলার প্রধান উপকরণ। প্রশস্ত মাঠ এ খেলার উপযুক্ত স্থান। মাঠের একপ্রান্তে থাকে একটি গর্ত।

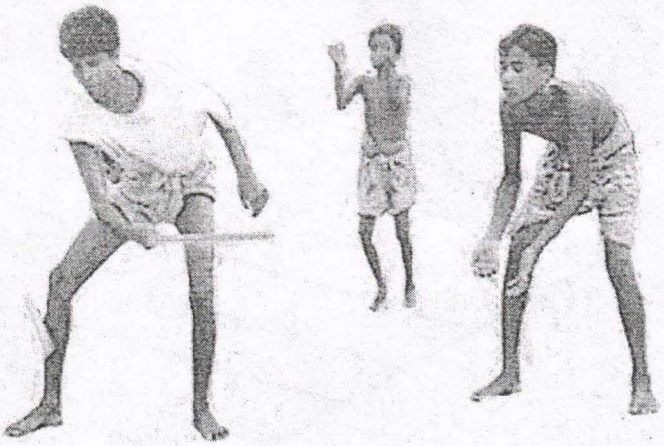

ডাংগুলি খেলা, বালাগ্রাম, জলঢাকা, নীলফামারী

খেলার টসে বিজয়ী দল গর্ত নেয়। অন্যদল বাইরে যায় খাটতে। যেকোনো একজন গর্তে গুলি বা চেঙ্গু রেখে ডান্ডার সাহায্যে উপরে তুলে বিপক্ষের দিকে সজোরে ছুঁরে দেয়। বিপক্ষের যেকোনো একজন ক্রিকেটের বলের মতো চেঙ্গুটিকে মাটিতে পড়ার আগেই লুফে নিতে পারলে ডান্ডাধারী দান হারায়। দলের অন্য ব্যক্তি ঐ নিয়মে ছোঁড়ার জন্য এগিয়ে আসে। চেঙ্গু মাটিতে না ফেলে শূন্যে তুলে ডান্ডার সাহায্যে যতবার স্পর্শ করা যাবে ততবার খেলার সুযোগ পাবে খেলোয়াড়। পরবর্তীতে ডান্ডার আঘাতে চেঙ্গু যতদূর যাবে ডান্ডাধারী খেলোয়াড় তার ডান্ডার দ্বারা ১, ২-২০ পর্যন্ত গুণবে। এভাবে যতবার ২০ হবে ততটি পয়েন্ট হবে। এভাবে যার পয়েন্ট বেশি হবে তার জিত হবে।

**ড. এক্কাদোক্কা বা কিতকিত :** নীলফামারীর প্রায় সব অঞ্চলে কিতকিত খেলার প্রচলন দেখা যায়। তবে সৈয়দপুর উপজেলায় গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা এ খেলাটি বেশি খেলে থাকে। কিতকিত খেলাও দলবদ্ধ খেলা। মাটিতে ১০- ১২ ফিট লম্বা এবং ৩-৪ ফিট প্রস্থ ঘর কাটা হয়। ঘরটি ছয়টি উপঘরে বিভক্ত করা হয়। ঘরগুলোকে পর্যায়ক্রমে এক্কা, দোক্কা, তেক্কা, চৌকা, পঞ্জা, এবং ছক্কা বলা হয়। ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসির গোলাকার টুকরা এ খেলার উপকরণ। টুকরাটিকে খোলা বলে। দুজনে অথবা দলবদ্ধভাবে এক্কা দোক্কা খেলতে পারে। তবে প্রত্যেকের স্বার্থ স্বতন্ত্র। প্রত্যেককে নিজ দায়িত্বে খেলতে হয়। খেলা শুরু হয় বাইরে থেকে। এক এক ঘরে খোলা ছুঁড়ে ফেলে এক পায়ে ভর করে ঘরের দাগ লাফ দিয়ে পেরিয়ে বুড়ো আঙ্গুলের ডগা দিয়ে ঠেলে সেটি বাইরে নিয়ে আসতে হয়।

www.pathagar.com

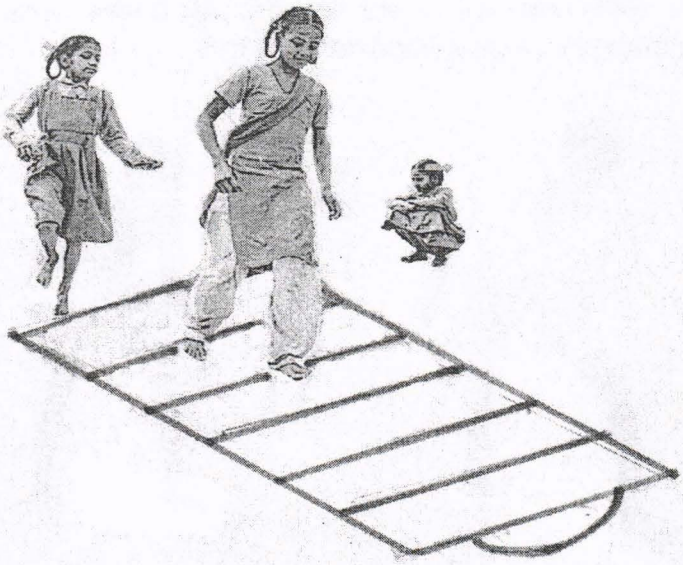

এক্কাদোক্কা খেলা, সৈয়দপুর, নীলফামারী

এ খেলায় সতর্ক থাকতে হয় পদে পদে। নির্দিষ্ট ঘরে খোলা রাখতে না পারলে সে দান হারায়। বিশ্রাম ঘর ছাড়া অন্য ঘরে দু-পা একত্রে মাটিতে ফেললে আউট হয়। পা অথবা খোলা দাগের উপর থাকলেও আউট। অর্থাৎ যতক্ষণ ঘরের ভিতরে আছে ততক্ষণ এক পায়ের উপর ভর করে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলতে হয় এ সময় একদমে বা নিশ্বাসে 'কিত্ কিত' এই দ্বৈত শব্দটি উচ্চারণ করতে হয়। এর অর্থ হলো সে খেলাটি এক নিশ্বাসে' খেলছে কি না তারই প্রমাণ। খেলার মধ্যে নিশ্বাস ছাড়লে বা নিলে সে আউট হয়ে যাবে। প্রথম বালিকা আউট হয়ে গেলে দ্বিতীয় বালিকা একই পদ্ধতিতে খেলা শুরু করে। শেষ বালিকা দান হারালে আবার প্রথম বালিকাটি তার অসমাপ্ত স্থান থেকে পুনরায় খেলা আরম্ভ করে। এভাবে চক্রাকারে খেলার সুযোগ আসে। কোনো একজন খেলোয়াড় সব ঘরে খোলা রেখে তা ফিরিয়ে আনতে পারলে তাকে ৬ নং ঘরের বাইরে পিছন দিকে না তাকিয়ে খোলা ঘরের মধ্যে ফেলতে হয়। হাতের তাক মাফিক খোলাটি যে ঘরে ঠিকমত পড়বে খেলোয়াড় তার অধিকারিণী হবে। ঘরের বাইরে পড়লে সে দান হারাবে। এভাবে সব ঘর অধিকারে আনতে পারলেই জয়। জেতাঘর প্রতিপক্ষকে ডিঙ্গিয়ে চলতে হয়।

www.pathagar.com

# লোকপেশাজীবী গ্রুপ

বাংলাদেশ নদীমাত্রিক, কৃষিনির্ভর স্বল্পোন্নত একটি দেশ হলেও এ দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন নিজেরাই তৈরি করে তেমনি এ অঞ্চলের নিম্নশ্রেণির জনগণও জীবন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সনাতনী পেশা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রচলিত কয়েকটি লোকপেশাজীবী শ্রেণির বিবরণ তুলে ধরা হলো :

**ক. জেলে :** অতীতে নদীবেষ্টিত নীলফামারী জেলায় বেশ কয়েকটি জেলে পাড়া ছিলো। মূলত নদী এবং খালবিলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করাই জেলেদের প্রধান কাজ। নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও নাব্যতা হ্রাসের কারণে জেলেদের সংখ্যা দিন দিন কমতে থাকে। বর্তমানে মাত্র হাতে-গোনা কয়েকটি জেলে পরিবার গোলমুণ্ডা ইউনিয়নের ভাবনচূড় গ্রামে এবং কৈমারী ইউনিয়নে দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে কোনো রকমে টিকে আছে।

**খ. কামার :** নীলফামারী জেলার সবগুলো উপজেলায় কামারেরা বসবাস করে থাকে। কৈমারী ও টেঙ্গনমারী ইউনিয়নে এবং পূর্ব খুটামারা গ্রামে বেশ কয়েকটি কামার পরিবার বসবাস করছে। তারা স্থানীয় লোকদের চাহিদা অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় দা, কুড়াল, খন্তি, কাটারি, পাসুন এসব জিনিস তৈরি করে থাকেন।

কামার পেশাজীবী, সৈয়দপুর, নীলফামারী

www.pathagar.com

কামারের তৈরি পণ্যের চাহিদা সারা বছর জুড়ে থাকলেও বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে তাদের তৈরি পণ্যের চাহিদা বাড়ে। তাছাড়া বছরের অন্যান্য সময়ে তাদের আয়ের পরিমাণ কমে যায়। এজন্য সারা বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করলেও তাদের জীবনযাত্রার তেমন কোনো উন্নতি হয় না।

**গ. কুমার :** কুমারেরা সাধারণত এঁটেল মাটি দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় হাঁড়ি-পাতিল, কলস, চারি, দিয়ার, মটকি, ডাবর এবং বিভিন্ন খেলনাসামগ্রী তৈরি করে থাকে। নীলফামারী জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কুমার সম্প্রদায়ের কয়েকটি পাড়া রয়েছে। পাড়াগুলো কুমারপাড়া নামে পরিচিত। কুমারপাড়ার লোকেরা পুরুষানুক্রমে এ পেশায় নিয়োজিত আছে।

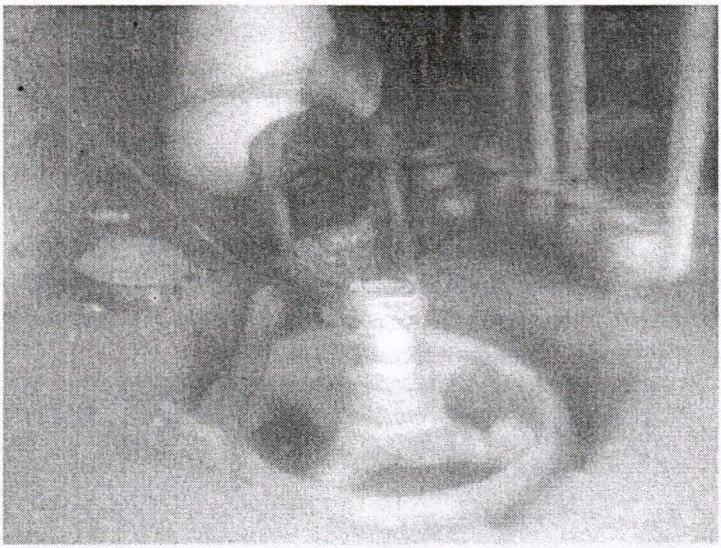

কুমার পেশাজীবী, সৈয়দপুর, নীলফামারী

**ঘ. ডোম :** নীলফামারী জেলার সবগুলো উপজেলায় ডোম সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করে থাকে। সাধারণত ডোমেরা বাঁশ দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় ডালি, কুলা, চালাসহ বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে থাকে। এ পেশার সাথে জড়িত লোকদের জীবনযাত্রার মান তেমন উন্নত নয়। তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর চাহিদা সব সময় থাকলেও সেখান থেকে তাদের আয়ের পরিমাণ খুবই কম। গ্রামে ধান কাটার মৌসুম এবং বর্ষাকালে মাছ ধরার মৌসুমে তাদের আয়ের পরিমাণ কিছুটা বাড়লেও বছরের অন্যান্য সময়ে তাদের আয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে তাদেরকে জীবনযাপন করতে হয়।

www.pathagar.com

খাচা, ডালি তৈরির কাজে ব্যস্ত ডোম সম্প্রদায়, আন্দারুর মোড়, ডোমার, নীলফামারী

**ঙ. ছুতার :** নীলফামারী জেলার সবগুলো উপজেলায় ছুতার পেশাজীবী মানুষ বসবাস করে। তারা স্থানীয় লোকদের চাহিদা অনুযায়ী কাঠ দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরি করে থাকেন। বর্তমান বাজার দরের তুলনায় তাদের দৈনিক আয়ের পরিমাণ খুবই কম হওয়ায় তাদের জীবনযাত্রার মানও ততটা উন্নত নয়।

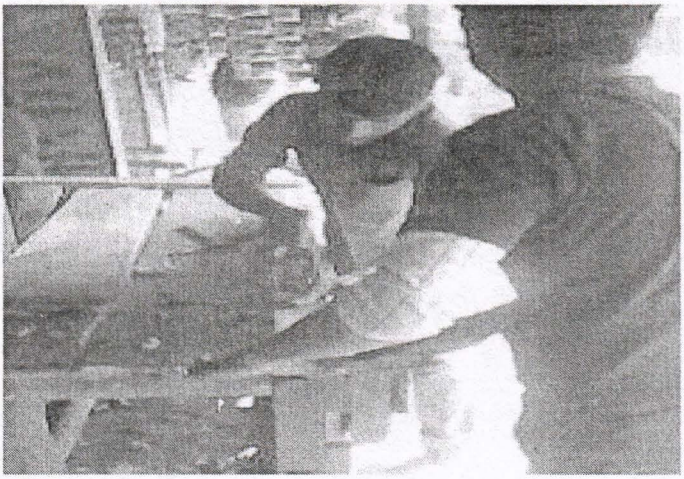

কাঠের আসবাব তৈরির কাজে নিয়োজিত ছুতার পেশাজীবী মানুষ, কামারপুকুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী

www.pathagar.com

**চ. গাছি :** নীলফামারী জেলার সবগুলো উপজেলায় গাছিদের বসবাস। গাছিরা সাধারণত শীত মৌসুমে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে খেজুর গাছের মাথায় ঢোঙ্গা বা পাতাসহ গাছের কাণ্ড সামান্য পরিমাণে চেঁচে নিয়ে সেখানে বিশেষ কৌশলে বাঁশের তৈরি নল লাগিয়ে খেজুরের রস সংগ্রহ করে থাকেন। খেজুরের রস বেশ সুপেয় হওয়ায় তা যেমনি কাঁচা খাওয়া যায় তেমনি এ রস দিয়ে নালি বা পাটালি গুড়ও তৈরি হয়। গাছিরা কাঁচারস এবং সেই রস থেকে তৈরি করা গুড় বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

খেজুরের রস নামানোর কাজ করছে গাছি পেশাজীবী লোক, কামারপুকুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী

**ছ. তেলি :** নীলফামারী জেলার সবগুলো উপজেলায় তেলিদের বসবাস লক্ষ করা যায়। তেলিরা সাধারণত কাঠের তৈরি ঘানিতে সরিষা মাড়াই করে তেল তৈরি করে থাকেন। এই তেল বাজারে বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করেন।

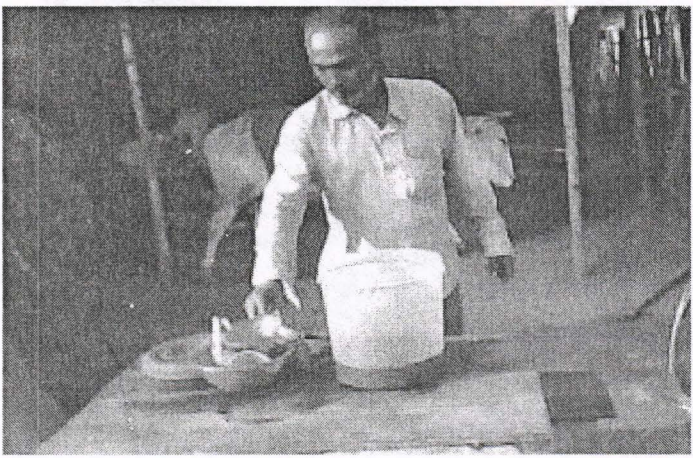

তেলের দোকানে দাঁড়িয়ে তেল বিক্রি করছেন তেলি চাপানি, ডিমলা, নীলফামারী

www.pathagar.com

**জ. মুচি :** নীলফামারী জেলার সবগুলো উপজেলায় মুচি সম্প্রদায়ের লোক কমবেশি বসবাস করে থাকে। এরা সাধারণত মৃত পশুর চামড়া সংগ্রহ করে এবং জুতা, স্যান্ডেল তৈরি, সেলাই ও জুতা পালিশের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

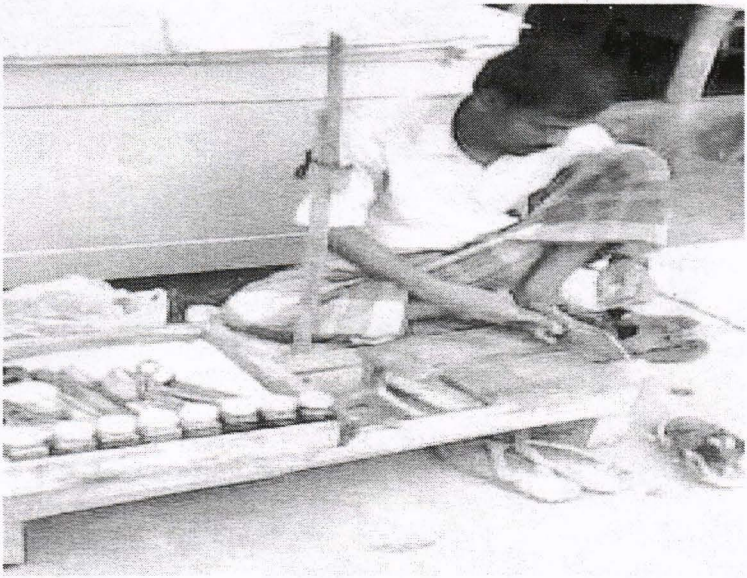

জুতা সেলাই কাজে ব্যস্ত মুচি, ডিমলা, নীলফামারী

**ঝ. মেথর বা ঝাড়ুদার :** নীলফামারী জেলার সবগুলো উপজেলায় কমবেশি মেথর সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করে থাকে। উল্লেখ্য যে, এ সম্প্রদায়ের লোকদের নিজস্ব বা স্থায়ী কোনো আবাসস্থল নেই। এরা সাধারণত শহর বন্দরের অফিস-আদালতের বারান্দায় রাত্রীযাপন করে থাকে। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ময়লা-আর্বজনা পরিষ্কার করাসহ ডাস্টবিন পরিষ্কার, শৌচাগার পরিষ্কার করার কাজ করে থাকেন।

**ঞ. নাপিত :** নীলফামারী জেলার মুচি সম্প্রদায়ের একটি অংশ নাপিত পেশায় নিয়োজিত। এ অঞ্চলের গ্রামগঞ্জের বাজারগুলোতে বাজারের দিনে বাজার বা হাটের ধারে পিঁড়ায় বসিয়ে নাপিতেরা মানুষের চুল দাড়ি কামানোর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অন্য সময়ে এরা চামড়ার ব্যবসায়ের সঙ্গেও জড়িত থাকে। কোনো কোনো বাজারে নাপিতেরা বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক ছবি সজ্জিত ঘর তৈরি করে বা ভাড়া নিয়েও তাদের পেশাগত কাজ চালিয়ে থাকে। নীলফামারী জেলায় অনেক গ্রামেই এদের এখন বসবাস। এদের স্বতন্ত্র গ্রাম বা পাড়া নেই।

www.pathagar.com

বাজারের একধারে বসে চুল কাটছে নাপিত, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী

**ট. ধুনুরী :** ধুনুরী সাধারণত তুলোধুনোর কাজ করে থাকে। ধুনুরী নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রাদায় বা জাতিসত্তা নয়। এ পেশায় নিয়োজিত যেকোনো সম্প্রদায়ের মানুষই ধুনুরী নামে পরিচিত হতে পারে। এরা গ্রামে বা শহরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মানুষের পুরাতন বা ছেঁড়া লেপ, তোষকের তুলো ধুনাই করে সেগুলোর অনেকটা নতুন রূপ তৈরি করে দেন। এছাড়াও তারা ফেরি করে তুলো বিক্রি এবং নতুন লেপ তোষক তৈরির কাজও করেন। ধুনুরীর হাতে বাঁশের তৈরি ধনুকের মতো ধুনর থাকে।

লেপ তৈরির কাজে ব্যস্ত ধুনুরী, আমবাড়ীহাট, ডোমার, নীলফামারী

www.pathagar.com

ধুনর দিয়ে তুলো ধুনর কাজ করে বলেই সম্ভবত এদের নাম হয়েছে ধুনরী। বর্তমানে নীলফামারী জেলার প্রত্যেক উপজেলা বন্দরে ধুনরীরা তাদের নিজস্ব দোকানে বসে ধুনুরীর কাজ করে থাকেন। এখন আর তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে দেখা যায় না।

**ঠ. সাপুড়িয়া :** কথিত আছে-বহুদিন পূর্বে বেদে সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ যাযাবর জীবনযাপনের পথে নীলফামারী ডোমার অঞ্চলে স্থায়ীভাবে আশ্রয় নিয়েছে। এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোক এখনও নগরে বন্দরে সাপ খেলা দেখিয়ে ঔষধি ডালপালা এবং তাবিজ বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। এরা সাপ ধরা কাজ করে এবং সাপের তেলও বিক্রি করে। নীলফামারী অঞ্চলে এরা সাপুড়িয়া নামে পরিচিত। সাপে কামড়ানো মানুষের চিকিৎসা এবং ঝাড়ফুক দিয়ে সাপুড়িয়ারা ওঝার কাজও করে থাকে। ডোমার অঞ্চলে সাপুড়িয়াদের স্থায়ী আশ্রয় হলেও পূর্ব পুরুষদের পেশাগত অভ্যাসে এরা দেশের বিভিন্ন স্থানে এখনও বিচরণ করে বেড়াচ্ছে।

সাপের খেলা দেখানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন সাপুড়িয়া, ডিমলা, নীলফামারী

www.pathagar.com

# লোকচিকিৎসা ও তন্ত্র-মন্ত্র

নীলফামারী জেলার আনাচেকানাচে এখনো অনেক ওঝা কবিরাজ রয়েছে যারা ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ দিয়ে রুগীকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের সে চেষ্টা সফলতার মুখ দেখতে পায় না। তারপরও এ অঞ্চলের ওঝা কবিরাজগণ তাদের স্বকীয় পেশায় এখনো বহাল। তাদের বিভিন্ন মন্ত্রসিদ্ধ চিকিৎসার বিবরণ নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো :

## ক. লোকচিকিৎসা

**১. ভাঙা হাড় জোড়া লাগানো :** কারো হাত পা ভেঙে গেলে সাপের তেল এবং বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার শিকর-বাকরের রস দিয়ে ভাঙা জায়গায় ন্যাপ বা প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করলে ভাঙা হাড় জোড়া লাগে। এমন চিকিৎসা এ অঞ্চলের অনেক কবিরাজই দিয়ে থাকেন। তবে টেংগরমারী কিশোরগঞ্জের শামসুল কবিরাজের এরূপ চিকিৎসার যথেষ্ট নাম আছে।

**২. জিন ও ভূত ছাড়ানো :** কাউকে জিন বা ভূতে আছর করেছে বলে ধারণা করলে কবিরাজের বাড়ি গিয়ে কবিরাজকে ডেকে আনা হয়। কবিরাজের পরামর্শ অনুযায়ী একজন তুলারাশির লোককে নিয়ে আসা হয়। এরপর শুরু হয় ঝাড়ফুঁক, তেল-পড়া, পানিপড়া, তাবিজ-কবচ ইত্যাদি দিয়ে রুগীকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করা হয়।

## খ. তন্ত্রমন্ত্র

**১. সাপের বিষঝাড়ার মন্ত্র :** সাপে কাটা রুগীর শরীর থেকে বিষ ঝাড়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কিশোরগঞ্জের মাগুড়া গ্রামের আবুল কালাম ওঝা নিচের মন্ত্র পড়ে তার বুকে তিনবার ফুঁ দিয়ে নেয়, যাতে তার নিজের শরীরে বিষ না ঢোকে। মন্ত্রটি নিম্নরূপ :

ঘর হতে বের হলাম আমি
দুয়ারে দিলাম পা।
গামছা হাতে চললাম।
পথে ঘাগর বাজে, গাইপথ ছেড়ে দে।
ওরে সাফা তোর গরুর বাবা যাই।
হাত মোর গরুর, পাও মোর গরুর।
গরুর মোর সর্ব অঙ্গের গা।
সর্ব অঙ্গের ভারে রে সাফা

www.pathagar.com

তুই কোন্‌খানে খাবি খা।
নড়িসচড়িস, মুখ যদি বের করিস,
জিব আস্থিক মানিক কিরে সাফা।
সাফা তোর ফেটে যাবে মুখ।

এরপর রুগীর বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে ওঝা নিচের মন্ত্র পড়ে তিনবার ফুঁ দিয়ে তার নিজের শরীর বন্ধ করে নেয়। শরীর বন্ধ করার মন্ত্রটি নিম্নরূপ :

আলা বারি তালা, মোহাম্মদের লাগে ধন্দ,
এই চার কথা দিয়ে আমার দেহ করলাম বন্ধ।
আমার এই বন্ধে যে করিবে বাণ,
কভু জ্ঞান দোহায় আলা তার
ওস্তাদের মস্তকে লাগে বাম পা।
কার আজ্ঞে, কামরূপ কামিক্ষে,
শিক্ষাগুরু ওস্তাদের আজ্ঞে,
দোহাই আলা মোহাম্মদের আজ্ঞে।
আমার এই দেহ বন্ধ নড়ে,
দোহাই আলা মোহাম্মদের
শির কাটে ভূমিস্থলে পড়ে।

সাপের বিষ ঝাড়ার সময় প্রথমে সরস্বতীর বন্দনা করতে হয়। বন্দনাটি নিম্নরূপ :

দেও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার,
এই বিদ্যা খাটুক মাগো সদা সর্বকাল
আজ্ঞে মা মনসার পদে
কোটি কোটি নমস্কার।

রুগীকে দেখার পর আঁচলে গিট বেঁধে অন্য একটি মন্ত্র পড়া হয়। মন্ত্রটি নিম্নরূপ :

ও পাড়ে ধোপার ঝি কাপড় কাচে,
পদ্মের পাতে বিষ ভাসে।
হে ধোপার ঝি তুই গুরু
আমি তোর শিষ্য বান্ধি রাখলাম
অঙ্গে কাল কুটি।
চোসাপার বিষ,
থাকরে বিষ তুই অঞ্চল ধরে,
আমি আসি ঈশ্বর মহাদেবের
সেবা করে।
তবেই তোর দেব বন্ধ ছেড়ে।

উপরের মন্ত্র পড়ার পর রুগীর গায়ে ফুঁ দিয়ে সাথে সাথে গিঁট বেঁধে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

রুগীর শরীরে বিষের তীব্রতা একটু বেশি মনে করলে ওঝা রুগীকে তার বাড়ির উঠানের এক জায়গায় বসিয়ে ছুরি হাতে নিয়ে পূর্বদিক থেকে শুরু করে রুগীর চারদিকে ঘিরে একটি গোলাকার বৃত্ত আঁকে। বৃত্ত আঁকার পর ছুরি বা চাকু দাগের ওপর গেঁথে রাখে। নিচের মন্ত্র পড়ে এই কাজগুলো খুব দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করে থাকে।

রামের গণ্ডি, লক্ষ্মণের বাণ,
সীতার গণ্ডি করিলাম এই স্থান।
আমার এই গণ্ডি যে কাটবে,
রাম লক্ষ্মণের বুক জড়বে,
আমার এই গণ্ডি হরে
রাম লক্ষ্মণ মা হরণ করে,
লব কোষ সীতা হরণ করে।

রুগীর শরীর থেকে বিষ নামানোর জন্য হাত চালান দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার শুরুতে একজন তুলা রাশির লোক নিয়ে আসা হয়। তুলা রাশির লোকটি তার হাত মাটিতে রাখে। এরপর ওঝা এক চিমটি মাটি নিয়ে তুলা রাশির লোকটির হাতে অল্প অল্প করে ছিটাতে থাকে। তুলা রাশির লোকটির হাতের উপর মাটি ছিটানোর সময় ওঝা নিম্নরূপ মন্ত্রটি পড়ে ফুঁ দেয়।

অঙ্গ চলে কুম্বো চলে,
পাতাল বাসকি বাক চলে,
ঘাট-অঘাট চলে,
সমুদ্র শিবির আসন চলে,
ছয় কোটি সাতলী পর্বত চলে,
করলাম সার তিরিশ কোটি দেবতা,
আমার হস্তে কর ভর।
যেখানে থাকে বিষ,
সেইখানে গিয়ে ধর।
না থাকে সাপের বিষ,
ডাইনে বামে গিয়ে ধর।
দোহাই ধর্মের, দোহাই খোদার।

**২. ঝাড়নমন্ত্র :** রুগীর শরীর থেকে বিষ নামানোর সময় নিমগাছের পাতাসহ ডাল অথবা বিষ ঢেকিয়া দিয়ে রুগীর শরীরের উপর থেকে নিচের দিকে ঝেড়ে বিষ নামোনো হয়। এভাবে বিষ রুগীর শরীর থেকে নিচের দিকে নেমে আসে বলে ওঝার বিশ্বাস। এভাবে বিষ ঝাড়ার সময় ওঝা নিচের মন্ত্র পড়ে রুগীর শরীরে ফুঁ দেয়।

১. আদি কৃষ্ণ সাপিনি শঙ্খ,
চক্র, গদা, পদ্মধর,
আলা গুরু পয়গম্বর।
চাপড় সারে বিষ নেই আর।
রক্ত কাঞ্চনো ফুলের মালা,

www.pathagar.com

ঘর যা, ঘর যা,
বিষ তুই উড়ে পালা।

২. সাপের বিষ ঝিতি ঝাড়ে অঙ্গের,
অষ্ট অঙ্গের বিষ,
ফুঁ দিলে নাই।
নেই বিষ কার অঙ্গে হাঁড়ির ঝি,
মা কালী চণ্ডীর আজ্ঞে।
নেই বিষ, বিষহরীর আজ্ঞে।
নেই বিষ মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
ফুঁকে করলাম পানি।

৩. ধুলা নিলাম হাতে,
ধুলা নিলাম পাতে
এই ধুলা ছাড়িয়া দিলাম
কালনাগিনির গাতে।
দোহাই লাগে মা পদ্মার
মাথা যদি উঁচু করিস
ঠিক পদ্মার মাথা খাইস
দোহাই মা মনসা,
দোহাই মা মনসা।

**তথ্যসহায়ক**

১. আবুল কালাম আজাদ, বয়স : ৪১, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি.এ, গ্রাম: মাগুড়া শাহপাড়া, পো : মাগুড়া, উপজেলা : কিশোরগঞ্জ।

২. মোঃ আতিয়ার রহমান, পিতা : আজিজার রহমান, পেশা : কবিরাজ গ্রাম : ডাঙ্গাপাড়া, উপজেলা : ডিমলা।

www.pathagar.com

# ধাঁধা

লোকসাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ উপাদান হলো ধাঁধা। ধাঁধা প্রাচীন কালের কিংবা আধুনিক কালের যে যুগেরই সৃষ্টি হোক না কেন নতুন, পুরাতন যেকোনো ধাঁধা থেকে শ্রোতারা সমান আনন্দ লাভ করে থাকে। ধাঁধা মূলত শিশু-কিশোরদের জন্য। কিন্তু ধাঁধার আবেদন শিশুদের ছাপিয়ে বড়দের আসরেও প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখে। যেকোনো ধাঁধার উত্তর জানার জন্য বড়দের তুলনায় শিশু-কিশোরদের আগ্রহ থাকে বেশি। কিশোর বয়সি ছেলেমেয়েরা নতুন নতুন ধাঁধা সংগ্রহ করে তাদের পরিচিত মহলে প্রচার করে আনন্দ লাভ করে। ছন্দ ছাড়া ধাঁধা হয় না। অতি সাধারণ মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হলেও ধাঁধাগুলো সব সময় প্রচলিত অর্থ বহন না করে প্রতীকি অর্থ বহন করে থাকে। প্রতিটি ধাঁধায় প্রশ্ন করে তার উত্তর খোঁজা হয়। ধাঁধার মাধ্যমে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতা উভয়ে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। ধাঁধা হলো বুদ্ধির খেলা। ধাঁধার মাধ্যমে শ্রোতার উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করা হয়। বুদ্ধির দৌড়ে কে কত বেশি অগ্রসর হতে পারে তা যাচাই করা হয়। কোনো কোনো ধাঁধার উত্তর এর বর্ণনায় দেওয়া থাকে। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে শ্রোতাকে তা উদ্ধার করতে হয়। কোনো কোনো ধাঁধার উত্তরের জন্য বক্তা শ্রোতার কাছে অপমানজনক শর্ত জুড়ে দেয়। তখন শ্রোতা তার আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্য ধাঁধার উত্তর খোঁজার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গ্রাম-গঞ্জের সর্বত্রই ধাঁধার আসর বসে। নীলফামারী জেলায় প্রচলিত ধাঁধাগুলো শ্লোক বা ছিলকা নামে পরিচিত। আমাদের সংগৃহীত ধাঁধাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো :

১। চামড়ার ধনুক, বাতাসের তীর
মারবো হেঁটে লাগবে নাকে।
উত্তর : পায়ুপথ দিয়ে বের হওয়া বাতাস।

২। দুই হাটু ফেলে হাপার হুপুর ঠেলে
গোললা উঠি ছাড়ে।
উত্তর : ছাগলের বাচ্চা দুধ খাওয়ার সময় এরকম হয়।

৩। ইর গেনু, বির গেনু, গেনু বিরের হাট
এমন কইনা দেখি আনু ষোলো সাইরা দাঁত।
উত্তর : লাউ।

৪। গাছোত আছে তিনটা নারিকেল পারো রে বাপই খাই
তোমরাও দুই বাপ পুত হামরাও দুই বাপ পুত
সমান সমান যেন পাই।
উত্তর : বাপ, ছেলে ও নাতি।

৫। ছোটো ছোটো ছেলেরা দুধ ভাত খায়
বড়ো বড়ো গাছের সাথে ঢুস খেলায়।
উত্তর : কুড়াল।

www.pathagar.com

৬। হাতে নিলে নড়বড় করে থুথু দিয়া খাড়া করে
টপ করে ধরে পট করে ভরে। যদি হয় ভণ্ড দশ টাকা দেবো দণ্ড।
উত্তর : সুই সুতা।

৭। একটি গাছে বারোটি ডাল, বারোটি ডালে ত্রিশটি পাতা।
এক পৃষ্ঠ কালা, এক পৃষ্ঠ ধলা।
উত্তর : এক বছর।

৮। মা যখন নানির পেটে, তখন আমি বাবুর হাটে।
উত্তর : কলার গাছ।

৯। চার ব্যাটা কাতর কোতর এক ব্যাটা পাগল নাত
আর দুই ব্যাটা শুকনা কাঠ। উত্তর :
গরুর পা, লেজ ও শিং।

১০। এক কুড়ি দুই ছেলে, দুই পাশে দুই জাল ফেলে
যখন জালে মাছ ঢোকে কেউ হাসে কেউ কাঁন্দে।
উত্তর : ফুটবল খেলা।

১১। কি দেখছেন হামাত্তি ধুলা উড়াচ্ছে তোমাত্তি
দেখিবার আসিবে হামাক নিয়া যাইবে তোমাক।
উত্তর : মাছ ধরা টেপাই।

১২। চান্দের মতো চান চুকাতি মুলার মতো চাকি
ডুবি দিতে কাতিকুতি সোন্ধাইলে মন খুশি।
উত্তর : চুড়ি।

১৩। ছইলের মাও কার ছোয়াক ধোয়ান গাও
যার ছোয়া তার বাপ, তার শ্বশুর আমার বাপ।
উত্তর : নিজের ছেলে।

১৪। তিন তেরো আরো বারো নয় দিয়া পূরণ করো
আমার স্বামীর এইটা নাম, পার করি দেও নাইওর যাইম।
উত্তর : ষাইটা আলি।

১৫। আগত ফলে তার পরে ফুলে, বুঝিলে আশপাশ
না বুঝিলে বছর ছয় মাস।
উত্তর : কদম।

১৬। কাশিয়ার তলে তলে এলুয়া নড়ে
এদি আমার বন্ধু যাওয়া আইসা করে।
উত্তর : নিশ্বাস।

১৭। কি করেন বাহে গাপা গুপা, কথা কইলে হয় পাপ
এই লোকটার মামা শ্বশুর মোর শ্বশুরের বাপ।
উত্তর : বউ ও ফুফা শ্বশুর।

১৮। আকাশে নোলপোত জমিনে ডোর
এই ছিলকা ভাঙি না দিলে গুষ্টি সুদ্দায় চোর।
উত্তর : ঘুড়ি।

www.pathagar.com

১৯। ঠাংলা নোদা নোদা
এই ছিলকা ভাঙ্গি না দিলে গুষ্টি সুদ্দায় ভোদা। উত্তর : সুয়াপোকা।
২০। উত্তরা গাছের গুয়া রে ভাই দক্ষিণা গাছের পান
এই ছিলকার মানে দিয়া পান খেয়া যান।
উত্তর : ১, ২, ৩ আজকা হামার গুয়া খাওয়ার দিন।
২১। ঠেলি দিলে মেলি যায়, বাড়ে দিলে চলে যায়।
উত্তর : ছাতা।
২২। ছোটোতে রক্তবর্ণ চক্ষু সারি সারি
উল্লাসে শিব নয় কিন্তু জটাধারী
মাছও নয়, মাংসও নয় সকল লোকে খায়
বুঝিবার না পারিলে বুঝি দিতে হয়।
উত্তর : আনারস।
২৩। ছোটোতে কৃষ্ণবর্ণ ধরে পঞ্চশির
রাবণের পুত্র নয় সেই মহাবীর
বৃদ্ধ কালেও নারীর মন করে জয়।
উত্তর : কামরাঙ্গা।
২৪। হাঁটিলে জাবর কাটে খাড়া হইলে চুপ
সলে গাং গাং করে কোন্ দেবতার মুখ।
উত্তর : শামুক।
২৫। ধোক্কর খাইয়া খোড়ে মাটি
দশ ঠ্যাং তিন পুকটি।
উত্তর : গরুর হাল ও হালুয়া।
২৬। হুর গেইল হুর আসিল।
উত্তর : চোখের দৃষ্টি।
২৭। কথা শুনতে লাগে ধান্দা
জানালা দিয়া ঘর বেড়ে গেইল
গৃহস্থ রইল বান্দা।
উত্তর : জাল।
২৮। দৌড়াইতে দৌড়া যায়, ঢোকা যায় না।
উত্তর : রেলগাড়ি।
২৯। আই মাই ঝাই, ছোটোতে কাপড়চোপড় বড় হইলে নাই।
উত্তর : বাঁশ।
৩০। দেয় দেখি আননু না, না দিলে আননু হয়।
উত্তর : মই।
৩১। ধিপ ধাপ পারাস, শাক শাক সোল্লক
পানিকিনা পইলো, কাজ গেনা হইলো।
উত্তর : পাট ধোয়ার পদ্ধতি।

www.pathagar.com

৩২। গোর গোর তলা, পিছলা ঘাট
বত্রিশটা ঘাটের একটা পাত।
উত্তর : জিহ্বা।

৩৩। তিন ভাই তলতি ধরে, এক ভাইয়ের মুখ দিয়া গোল্লা পড়ে।
উত্তর : চুলা।

৩৪। কাটিলে বাঁচে, না কাটিলে মরে।
উত্তর : সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর নাভি।

৩৫। আতালে ধান ফেলাইলাম, পাতালে ফেলাইলাম মই
সমুদ্রে ধান ফেলাইলাম ফুটিয়াছে খই।
উত্তর : আকাশের তারা।

৩৬। রাজা নোয়ায় রানি নোয়ায়, নয়কো সাধু দাস
পরের কন্যার রূপ বেশি কে করে বিলাস।
উত্তর : ফুল।

৩৭। উত্তর হইতে আইলো বক টিমটিম করে,
মাছ নাই, খাড় নাই, হাকাউ ঠোকা মারে।
ত্তর : কোদাল।

৩৮। নিমাতা ভাই চলো এখান থেকে পালিয়ে যাই।
একথা কইলো কায়, ছয় মাস আগে মইছে তায়।
উত্তর : শামুক।

৩৯। নদীও নোমায় নালাও নোমায় তল দিয়া যায় স্রোত
পুলিশও নোমায়, দারোগাও নোমায় মাথাত একটা টোপ।
উত্তর : তেলের ঘানি।

৪০। হাতও নাই, পাও নাই, ছলছলেয়া যায়
পিটিত চামড়া নাই সর্বলোকে খায়।
উত্তর : পানি।

৪১। এক বাটপারের ফাঁকি, আড়াইশ থেকে
পাঁচ পঞ্চাশ গেলে কত থাকে বাকি।
উত্তর : শূন্য।

৪২। ঢাকাতে একটা আছে, বাংলাদেশে নাই
কলিকাতায় দুইটা আছে, পৃথিবীতে নাই।
উত্তর : ক।

৪৩। চিকচিকা ভুই নিকা, তিন টিকা ছয় চৌকা।
উত্তর : গরুর হাল ও হালুয়া।

৪৪। ডানা নেই তবু উড়তে পারি
হাত নেই তবু ভাঙতে পারি।
কণ্ঠ নেই তবু শব্দ করি।
উত্তর : বাতাস।

www.pathagar.com

৪৫। কাল কি কৃষ্ণ জলে বাসা, হাড় নাই মাংস ভরা।
উত্তর : জোঁক।

৪৬। ভাষা আছে, কথা আছে, সাড়াশব্দ নাই
প্রাণীর সাথে থেকেও তার নিজের প্রাণ নাই।
উত্তর : বই।

৪৭। মাথায় মুকুট গোল গা, পেটের মধ্যে হাত পা
চলে কিন্তু নড়ে না, এটা কি তা বলো না।
উত্তর : শামুক।

৪৮। জন্ম হতে যতক্ষণ আয়ু হবে তার
মৃত্যুর ততক্ষণ পরে হাসে সে আবার।
উত্তর : সূর্য।

৪৯। বাঘের মতো লাফ দেয়, কুকুর হয়ে বসে
পানির বুকে ছেড়ে দিলে শোলা হয়ে ভাসে।
উত্তর : ব্যাঙ।

৫০। হাত নাই, পাও নাই, দেশে দেশে ঘোরে
অভাব হইলে তার লোকে অনাহারে মরে।
উত্তর : টাকা।

৫১। সবুজ বুড়ি হাটে যায়, হাটে যায়া চিমটি খায়।
উত্তর : লাউ।

৫২। লোহার খুঁটি কাঁচের ঘর, তার মধ্যে আছে আলোর বর।
উত্তর : হেরিকেন।

৫৩। সাগরে জন্ম তার আকাশে উড়ে, পর্বতে মার খেয়ে কেঁদে ঝরে পড়ে।
উত্তর : মেঘ।

৫৪। আঁধার ঘরে বাদর নাচে, না না করলে আরো নাচে।
উত্তর : জিহ্বা।

৫৫। সমুদ্রেতে জন্ম আমার থাকি সবার ঘরে,
একটু পানির পরশ পেলে যাইগো আমি মরে।
উত্তর : লবণ।

৫৬। মাটির হাঁড়ি, কাঠের গাই, বছর বছর দোয়াই আর খাই।
উত্তর : খেঁজুর গাছ।

৫৭। সাগরে যার জন্ম, নগরে বাস, মায়ে ছুলে হয় পুত্রের সর্বনাশ।
উত্তর : লবণ।

৫৮। ১১, ১২, ১৩ এই কিচ্ছার মানে দিয়া শরবতের গ্লাস ধর।
উত্তর : ১, ২, ৩ আজ হামার শরবত খাওয়া দিন।

৫৯। গোল, চ্যাপ্টা, সাদা বরণ
তিনো ভাইয়ের একটে মরণ
উত্তর : পান, সুপারি ও চুন।

www.pathagar.com

৬০। যখন তুই দেখিস তখন তোর মতন
আর যখন মুই দেখোং তখন মোর মতন।
উত্তর : আয়না।

৬১। হাতির জোকল শরীরটা, খাইতে খাইতে ডাণ্ডাটা।
উত্তর : খড়ের ঢিপি।

৬২। চার অক্ষরে নাম তার খাওয়ার জিনিস হয়,
শেষের দুই অক্ষর কেটে দিলে লেখার জিনিস হয়
প্রথম দুই অক্ষর কেটে দিলে দেরি হয়ে যায়
উত্তর : চকলেট।

৬৩। ময়ূরের পাখা হাতির দাঁত
এই কিচ্চার মানে দিবার না পাইলে শুয়র খাওয়া জাত।
উত্তর : মূলা।

৬৪। এডি কোনা টিপনুং, এক সেকেণ্ডে ঢাকা ঘুরি আসনুং।
উত্তর : কারেন্ট/ টর্চলাইট।

৬৫। এক হাত মিয়া সোয়া হাত দাড়ি, চলছে মিয়া শ্বশুর বাড়ি।
উত্তর : কচুরি পানা।

৬৬। বিধবা না হইয়াও সে পড়ে সাদা শাড়ি, নায় না, খায় না তবু সে সুন্দরী।
উত্তর : রসুন।

৬৭। বিনি সুতায় মোহন মালা, কেউ দেখে না তারে
ইহার নাম নিষ্ঠুর জ্বালা, শেষ করিয়া ছাড়ে।
উত্তর : প্রেম।

৬৮। ছোটো একটি মামা গায়ে হাজার জামা।
উত্তর : পেয়াজ।

৬৯। উপর থাকি পইলো, কাটিয়া এক কুলা হইলো।
উত্তর : কাঁঠাল।

৭০। একটা বুড়ির মেলা পুনদ্দি।
উত্তর : রসুন।

৭১। বাগান থেকে আসলো বুড়ি, এসে থালায় দিল প্রস্রাব করি।
উত্তর : লেবু।

৭২। এক হাত দড়ি, গুছাইতে না পারি।
উত্তর : রাস্তা।

৭৩। বাবা নাই জন্ম দিল, জন্ম দিল পরে
ছেলে যখন জন্ম নিল, মা ছিলো না ঘরে।
কেবা সেই জন্মদাতা, কে সেই জন
এমন আশ্চর্য কথা শুনেছো কখন।
উত্তর : কুশ।

৭৪। তিন পাকে তিনটা বাঁশের মুড়া, মধ্যেতে একটা খাটিয়া বুড়া
খাটিয়া বুড়া ডিম পাড়ে, কার বাবা বলতে পারে?
উত্তর : চুলা, ভাতের ডেসকি।

www.pathagar.com

৭৫। কোন্ কাজ করলে পিছন দিক দিয়া পিছাতে হয়।
উত্তর : ঘর নেপার কাজ।

৭৬। পানির তলত লেবুর গাছ, নাড়তে খালি সর্বনাশ।
উত্তর : শিং মাছ।

৭৭। খাইলে খাওয়াও যায় না, খেয়েও স্বাদ মেটে না।
উত্তর : চুমু।

৭৮। বাপ সিলসিল, মাও পাতারি, ভাই দুমদুম, বোন সুন্দরী।
উত্তর : কুমড়ার গাছ, পাতা, কুমড়া ও ফুল।

৭৯। আল্লার কি ব্রেন পাছাত লাগে দিছে কারেন।
উত্তর : জোনাকি পোকা।

৮০। নিজ মুখে সে পরকে খাওয়ায়, ভুলে কভু নিজে নাহি খায়।
উত্তর : চামুচ।

৮১। ছোটো ছোটো ছেলেগুলা ভাঙা নায়ে থাকে,
আগুনের তাপ পেলে লাফাইয়া লাফাইয়া নাচে।
উত্তর : খই।

৮২। একটু খানি পুকুরটা পিতলের ছাউনি
মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, তবু পড়ে পানি।
উত্তর : চোখ।

৮৩। দুই অক্ষরে নাম মোর পৃথিবীতে থাকি
শেষের অক্ষর বাদ দিলে সেই নামে ডাকি।
উত্তর : মা।

৮৪। নদীর উপর একটা ঘর, বুড়ি কয় মোকে কর
নাংটি খিচি দিলে ঠেলা, বুড়ি কয় হইচে এলা।
উত্তর : নৌকা।

৮৫। টিপিলে সয় না, আছড়াইলে ভাঙে না।
উত্তর : ভাত।

৮৬। উপর থাকি পইলো, চ্যাপটা হইলো।
উত্তর : গোবর।

৮৭। উপর থাকি পইলো ঢ্যাপ, ঢ্যাপ কয় মোর প্যাট কাট।
উত্তর : সুপারি।

৮৮। বড় একান আঙিনা, শিউলি ফুল পড়ি থাকে কাও কুড়ায় না।
উত্তর : আকাশের তারা।

৮৯। কালা বনে কালা হরিণ থাকে।
উত্তর : উকুন।

৯০। ইর গেনু বির গেনু, গেনু বিরের হাট
একেক সাইরে দেখি আনু, হাজার হাজার দাঁত।
উত্তর : আকাশের তারা।

www.pathagar.com

৯১। একশ ভাই, একান সিকাই।
উত্তর : ঝাড়ু।

৯২। একনা গাছ ঝাপুর ঝুপুর, তাতে আছে কালা কুকুর।
উত্তর : উকুন।

৯৩। বিশ্ব কুণ্ডুলির তলত ধুমা গুড়গুড় করে,
রাজার বেটা লক্ষীছাড়া
মানষি গোটো করে।
উত্তর : হুকা।

৯৪। পাতা কাটি লতা কাটি বসানুং চারা
ফল নাই, ফুল নাই, পাতাতেই ভরা।
উত্তর : পান।

৯৫। মধ্য নদীত ফেলানুং ছুড়ি, পাত কাটা গেল হাজার কুড়ি।
উত্তর : কাঁচি।

৯৬। তিন অক্ষরে নাম তার অতি ভয়ংকর
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে হয় অলংকার।
উত্তর : হাঙ্গর/হার।

৯৭। চলে কিন্তু হাঁটে না, কি জিনিস তা বলো না।
উত্তর : টাকা/ঘড়ি।

৯৮। আল্লাহর কি কুদরত, গাছের ভিতর শরবত।
উত্তর : খেঁজুর গাছ।

৯৯। এ পাড়ার বুড়ি মরলো, ও পাড়ায় গন্ধ পেলো।
উত্তর : কাঁঠাল।

১০০। সে এমন রসিক চান, নাকে বসে ধরে কান।
উত্তর : চশমা।

১০৯। মুখ নাই, নাই মাথা
টিপ দিলে কয় কথা।
উত্তর : মোবাইল/রেডিও।

১১০। আম নয়, জাম নয়, গাছে নাহি ফলে
তবুও সবাই তারে ফল বলে।
উত্তর : যোগফল/বিয়োগফল।

১১১। গাছ নাই পাতা আছে, মুখ নাই কথা আছে।
উত্তর : বই।

১১২। বাবা দেয় একবার, মা দেয় বার বার।
উত্তর : সিঁথির সিঁদুর।

১১৩। কোন্ সাগরে জল নাই।
উত্তর : ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

www.pathagar.com

১১৪। কাঁচাতে মানিক ফল সর্বলোকে খায়
পাকিলে মানিক ফল গড়াগড়ি যায়।
উত্তর : ডুমুর।

১১৫। মাসে আসে, মাসে যায়, দিনে না খায়, রাতে খায়।
উত্তর : রমজানের রোজা।

১১৬। যখন তুমি জন্ম নেও তখন কিন্তু আমি নেই
যখন তোমার শৈশব কাল তখন এসে দেখা দেই,
যখন তোমার বৃদ্ধ কাল তখন আমি চলে যাই।
উত্তর : দাঁত।

১১৭। পাখা নাই উড়ে চলে, মুখ নাই ডাকে
বুক চিরে আলো ছোটে, চিনে সবাই তাকে।
উত্তর : মেঘ।

১১৮। হাত পা সকলি আছে, নাই লেজ মুড়া
সকলে কোলে বসে কিবা ছেলে বুড়া।
উত্তর : চেয়ার।

১১৯। মুখ দিয়া বমি করে রক্ত কাল
তোমার আমার সবার কাছে জিনিসটা ভালো।
উত্তর : কলম।

১২০। তুমি আমি একজন দেখিতে একরূপ,
আমি কতো কথা কই, তুমি থাক চুপ।
উত্তর : ছবি।

১২১। উঠায় মুড়ায় হেপ দিলে খাড়ায়
ঠাইস্যা ধরো পুংগার গোড়ায়
যুবকের একবার, বুড়ো লোকে সাতবার।
উত্তর : সুই, সুতা।

১২২। সবুজ বরণ দেহটি, গাছের মাথায় ধরেছে,
পেটের মধ্যে দুধ রুটি দুই-ই ভরেছে।
উত্তর : নারিকেল।

১২৩। এঁড়ের হয় না মুসলমানি, গাভির হয় না বিয়ে
সে গাভির দুধ খাও কোন কলেমা দিয়ে।
উত্তর : বিসমিল্লাহ দিয়ে।

১২৪। এমন জিনিস আছে যা সর্বলোকে খায়
ছোটো ছেলেমেয়েরা খেলে মায়ের কাছে যায়।
বৃদ্ধ লোকেরা খেলে করে হায় হায়
যুবক যুবতীরা খেলে পরে এদিক ওদিক চায়।
উত্তর : হোঁচট খাওয়া।

www.pathagar.com

১২৫। একটা ঘরের সাতটা বাটি
যে না বলতে পারে তার কান কাটি।
উত্তর : চালতা।

১২৬। আকাশ থেকে পড়লো গোটার মধ্যে নউ
যে না ভাঙতে পারে সে আমার বউ।
উত্তর : জাম।

১২৭। লম্বা সাদা দেহ তার মাথায় টিকি রয়
টিকিতে আগুন দিলে দেহ হয় ক্ষয়।
উত্তর : মোমবাতি।

১২৮। রাত্রি কালে আঁধার যার যার ঘরে
তার বাড়িতে সকলে কান্নাকাটি করে।
উত্তর : চোর।

১২৯। কয়ে টয়ে নাম না, তার মধ্যিখানে পা
রাত্রি কালে বন্ধ করে দিনে করে হা।
উত্তর : দরজা।

১৩০। উত্তর থেকে আইল ঘোড়া, তার তিন ঠ্যাং পোড়া
খায় মাদারের গুড়া, হাগে কড়া কড়া।
উত্তর : চুলা।

১৩১। হয় পায়ে আসে, চার পায়ে বসে, দুই পায়ে ঘষে।
উত্তর : মাছি।

১৩২। লাল গাভি বন খায়, জল খেয়ে মারা যায়।
উত্তর : আগুন।

১৩৩। হাত নাই, পাও নাই, রসিক নাগর
অনায়াসে পার হয় অকূল সাগর।
উত্তর : সাপ।

১৩৪। ফুটার মাঝে খুঁটা দিয়ে, বেটাবেটি ঘুমাইয়া রয়।
উত্তর : দরজার খিল।

১৩৫। ফুটার ভিতর ফুটা দিয়ে এমনি মজার কল
হাতে নাতে ফলবে ফল।
উত্তর : তালা চাবি।

১৩৬। শত শত দাঁত তার, ভাঙলে জঙ্গল বন
দাঁত দিয়া পোকা তোলে বল কোন্ জন।
উত্তর : চিরুনি।

১৩৭। উঠান ঠন ঠন ঘণ্টায় বাড়ি
কোন্ ছাগলের মুখে দাড়ি।
উত্তর : রসুন।

www.pathagar.com

১৩৮। মুখ দিয়ে খায় সে মুখ দিয়ে হাগে
সারাদিন ঘুমিয়ে থাকে, রাতের বেলায় জাগে।
উত্তর : বাদুড়।

১৩৯। ইড়িং বিড়িং তিড়িং ভাই, চোখ দুটো তার মাথা নাই।
উত্তর : কাঁকড়া।

১৪০। এতম গাছে বেতম ধরে, ধরতে ধরতে আরো ধরে
পাকেও না, গলেও না, সন্ধ্যা বেলায় থাকেও না।
উত্তর : হাট।

১৪১। চুমা দিলে কাঁন্দে, মাটিতে রাখলে শান্ত হয়।
উত্তর : হুঁকা।

১৪২। ইট ঘুঘুর পিট টান, কোন ঘুঘুর চার কান।
উত্তর : চৌয়ারী ঘর।

১৪৩। ছয় আঙ্গুল জীবটা, দশ আঙ্গুল শিং
চলেছে সে হেঁটে হেঁটে রাত আর দিন।
উত্তর : শামুক।

১৪৪। মাটির মধ্যে জন্ম-কর্ম মাটির রস খায়
হাত পাও মেলে আসমান ধরতে চায়।
উত্তর : গাছ।

১৪৫। জামাই এলো কাজে, বলতে পারি না লাজে
আমার একটা কাজ আছে, দুই ঠ্যাংয়ের মাঝে।
উত্তর : গাই দোয়ানো।

১৪৬। পুরুষরা খাড়া করে, মেয়েরা হাত বুলাট করে।
উত্তর : মাটির দেওয়াল লেপা।

১৪৭। গাছের নাম গজারি, পাতার নাম ইলিশা
ধরে কামরাই পরে কালিজিরা।
উত্তর : তিল।

১৪৮। মামুর বাড়ি ঘুড়ি, এক বিয়ানে বুড়ি।
একশত ঘর তার এক ভিটায় আছে।
উত্তর : মৌমাছি।

১৪৯। আন্ধা পুষ্করিণী, বান্ধা মাছ, ফুল ফোটে বার মাস
দিবসের মটর তার পূর্ণ রাত জ্বলে।
উত্তর : আকাশ ও তারা।

১৫০। হাটু হীন দুই শিং, থাকে জঙ্গলে
দাঁড়িয়ে ঘুমায় সে না পড়ে টলে।
উত্তর : গণ্ডার।

১৫১। মামুর বাড়ি পাছে, ঘাড় ভাঙা হেয়ালে নাচে।
উত্তর : চাকী।

www.pathagar.com

১৫২। গেরুয়া বসন গায়, খুলিতে বসন তায়
চোখে জল এসে যায়, লোকে কেঁদে খেতে চায়।
উত্তর : পেঁয়াজ।

১৫৩। পাতাটি ঢোলা, ফুলটি কুজো, তাতে হয় দেবতা পুজো।
উত্তর : কলা।

১৫৪। মায়ের নাম লতাবতী, বইনের নাম মোনাবতী
ভাইয়ের নাম ঠেঙ্গা, এ শোলগগা ভাঙা।
উত্তর : পান, চুন, সুপারি।

১৫৫। চিরিক চিরিক পাতা, জয় নগর যাতা, ঠান্ডা পানি খাতা।
উত্তর : তরমুজ।

১৫৬। কোন্ হাঁস হাঁস নয়? কোন্ হাঁসের পাখা নাই?
উত্তর : ইতিহাস।

১৫৭। কোন্ গাছ সাজে, কোন্ গাছ সাজে না।
উত্তর : গেট ফুলের গাছ সাজে, বট গাছ সাজে না।

১৫৮। কোন্ শাড়ি পড়া যায় না।
উত্তর : মশারি।

১৫৯। ছোট্ট একনা গাব গাছ, গাব ঝোপা ঝোপা
কারও বাপের সাধ্য নাই গাব পাড়িতে পারে।
উত্তর : আকাশের তারা।

১৬০। মাঠে তার বাড়ি, পরনে লাল শাড়ি, বেড়ায় মানুষের বাড়ি।
উত্তর : মরিচ।

১৬১। এতটুকু ঘর চুনকাম করা, কোন্ মিস্ত্রির সাধ্য নাই ভেঙে গড়ে তোলা।
উত্তর : ডিম।

১৬২। লাঠি ভন ভন, লাঠি ভন ভন করে
ঢাকা শহরে আগুন লেগেছে, কে নিভাতে পারে?
উত্তর : মেঘ।

১৬৩। ছোটো বেলায় ঘোমটা দিয়ে, যায় সে শ্বশুর বাড়ি
যৌবনে হয় উলঙ্গ পরে না শাড়ি।
উত্তর : বাঁশ।

১৬৪। উপর থাকি পড়লো টিয়া, সোনার মুকুট মাথায় দিয়া।
উত্তর : তাল।

১৬৫। জঙ্গল দিয়ে উড়ে চলে, পিছ দিয়ে আগুন জ্বলে।
উত্তর : জোনাকি পোকা।

১৬৬। ইত্তির গাছত বিত্তি নাচে, ফিরিয়া দেখোং মরিয়া আছে।
উত্তর : খই।

১৬৭। না দিলে খায়, দিলে না খায়।
উত্তর : গাছের বেড়া।

www.pathagar.com

১৬৮ এটে থুনুক হইলো কি? ছওয়ায় চাইলে দেব কি?
উত্তর : বরফ।

১৬৯। ছোয়ায় কাঁন্দে দেব কি? রাজার রাজ্যেত নাই, পশারীর দোকানোত নাই।
উত্তর : চাঁদ।

১৭০। একটা বুড়ি গাও ধোয়, গাও ভিজে তার গামছা ভিজে না।
উত্তর : কচুর পাতা।

১৭১। ইর গেনু বির গেনু ,গেনু বিরের হাট,
একটে কোনা দেখি আনু, এক কোনা দাঁত।
উত্তর : কুড়াল।

১৭২। ঢিপির উপর ঢিপি, ঢিপি হইল কাইত, এই কিচ্ছা ভাঙি দিবার না পাইলে শুয়র খাওয়া জাইত।
উত্তর : কেঁচোর বাসা।

১৭৩। খেড় বাড়ি থাকি বেড়াইল মাগুর, ধরতে ধরতে হইল গাবুর।
উত্তর : আগুন।

১৭৪। চার অক্ষরে নাম তার মানুষের জীবনে একবার আসে
মাঝের দুটি অক্ষর কেটে দিলে দুধের উপর ভাসে।
উত্তর : সংসার/ সর।

১৭৫। অন্ধন ঘরে বান্ধন আছে, মানা করলে বেশি নাচে।
উত্তর : চোখ।

১৭৬। এমন একটা জিনিস আছে টিপ দিলে কথা কয়।
উত্তর : টেলিভিশন।

১৭৭। আসতে দাঁড়াছি, আসিয়া পাইছি, যাইতে হারাইছি।
উত্তর : দাঁত।

১৭৮। একতলায় ৩২টা মানুষ, দুই তলায় দুইটা খাল, তিন তলাতে দুইটা টিউব লাইট, চার তলায় জঞ্জাল।
উত্তর : মুখমণ্ডল, ৩২টি দাঁত, নাকের ছিদ্র ও মাথার চুল।

১৭৯। আইল হতে বাহির হলো সাপ, ধরতে না পারলে বাপরে বাপ।
উত্তর : পায়ুপথ দিয়ে নির্গত বাতাস।

১৮০। বারো মাসে তেরো সাইলা, আবার পোয়াতি।
উত্তর : চাঁদ।

১৮১। কোন্ জিনিস বাড়ে না, শুধু কমে।
উত্তর : আয়ু।

১৮২। পিপিপি লেজ দিয়ে পানি খায়, তার নাম কি।
উত্তর : হারিকেন।

১৮৩। এমন একটা জিনিস আছে, যার পেটের মধ্যে লেজ আছে।
উত্তর : দাঁড়িপাল্লা।

১৮৪। এমন বীর রাজার সাথে খায় ক্ষীর।
উত্তর : মাছি।

www.pathagar.com

১৮৫। ওই দিকে একটা লেবুর গাছ, লেবু ঝুমঝুম করে
কারো বাপের শক্তি নাই, কাটি আনতে পারে।
উত্তর : ছায়া।

১৮৬। ওই দিকে একটা ধানের শীষ, লাল টুকটুক করে
কারো বাপের শক্তি নাই কাটি আনতে পারে।
উত্তর : সূর্য।

১৮৭। এমন একটা জিনিস আছে দলের মধ্যে বাস করে
হাড় হাড্ডি নাই তার, মানুষকে খাবার আশা করে।
উত্তর : জোঁক।

১৮৮। দল নড়ে দলুয়া নড়ে, নড়ে বাঁশের গাজা। হাতির পিটে চড়ে যায় মহারানির বেটা। মহারানির বেটা নয়, চামচিলকার নাতি। এই ধাঁধার মানে দিতে লাগবে আশ্বিন কাতি।
উত্তর : ভূমিকম্প।

১৮৯। একনা বুড়ি খই খায়, মোক দেখি কইর দেয়।
উত্তর : শামুক।

১৯০। একনা বুড়ি সাদা কাপুড়ি।
উত্তর : রসুন।

১৯১। চলিতে চলিতে তার মাথা হলো ভার
মাথাটি কাটিয়া দিলে চলিবে আবার।
উত্তর : পেন্সিল।

১৯২। আল্লার দড়ি ভিজাইতে পারি, শুকাইতে না পারি।
উত্তর : জিহ্বা।

১৯৩। আল্লার দড়ি বিছাইতে পারি, গোছাইতে না পারি।
উত্তর : রাস্তা।

১৯৪। লোহার গাই, লোহার বাছুর, গাই ছেকে মামা শ্বশুর।
উত্তর : টিউবঅয়েল।

১৯৫। তিন অক্ষরে নাম তার সবাই পছন্দ করে
মধ্যের অক্ষর কেটে দিলে গণনা করা যায় তারে।
উত্তর : মাংস/মাস।

১৯৬। হাত সরু, পা সরু, হলুদমাখা গাও
এই কিচ্ছার মানে না দিলে, মাইয়া তোমার মাও।
উত্তর : বোলতা।

১৯৭। আট পা ষোলো হাটু, ডাঙ্গায় বসায় জাল নিচেটু
মাছ না ফান্দি, ফান্দিচে পানি,
সকালে উঠি করে দোমাদুমি।
উত্তর :মাকড়সার জাল।

www.pathagar.com

১৯৮ টিউ টিউ টিউ, আকাশ দিয়া উড়ি বেড়ায়
মোরটে আছে জিউ।
উত্তর : ঘুড়ি।

১৯৯। বিধাতার এক ঘর, নেইকো দুয়ার।
তার মধ্যে বাস করে এক জীব চমৎকার।
বাহির হইবার কালে করে খান খান
বাহির হইয়া মায়ের স্তন না করে পান।
উত্তর : ডিম।

২০০। ৩০ ফুল, ৫ কদম এই কিচ্ছার মানে দিয়া বলবেন কবুল।
উত্তর : ৩০ রোজা, ৫ নামাজ।

২০১। গলায় ঘুগুরা মাথায় ছাতি
বলেন তো এই ধাঁধার মানে কি।
উত্তর : সুপারি গাছ।

২০২। সর্ব অঙ্গ সাদা তার, গলায় লোহার হার
লাফ দিয়া আহার করে, লম্বা লেজ তার।
উত্তর : ঝাকি জাল।

২০৩। এক হাত বগিলা বারো হাত শিং
নাচে বগিলা হটিং টিং।
উত্তর : বড়শির ছিপ।

২০৪। পিটাতি পিটা বানায়, দু হাত কালোয় সার।
উত্তর : রুটি বেলনা।

২০৫। ইর গেনু বির গেনু, গেনু বিরের হাট
একনা বুড়িক দেখিয়া আনু তিন কোনা দাঁত।
উত্তর : চুলার টিরা।

২০৬। দুই পাশে বাল মধ্যেত লাল
স্বামী আছে যতদিন, দিতে হবে তত দিন।
উত্তর : সিঁথির সিঁদুর।

২০৭। এক হাত গাছটা, ফল ধরে পাঁচটা।
উত্তর : হাতের আঙ্গুল।

২০৮। বিয়ের সময় দাদা দেয় একবার, সারা জীবন বৌদি দেয় বার বার।
উত্তর : সিঁথির সিঁদুর।

২০৯। তেল চুকচুক পাতা, ফলের উপর কাঁটা
পাকলে হয় মধুর মতো, বিচি গোটা গোটা।
উত্তর : কাঁঠাল।

২১০। কোন্ পাখির ডিম নাই।
উত্তর : বাদুর।

২১১। দেখিতে আশ্চর্য বড়, মা ছোটো তার ছেলে বড়।
উত্তর : খৈ।

www.pathagar.com

২১২। এক গ্লাসে দুই রকম পানি, এই ধাঁধার মানে না দিলে
তুমি আমার বোনের স্বামী।
উত্তর : ডিম।

২১৩। এমন এক বিছানা শুইতে পারি না।
উত্তর : পানি।

২১৪। আগে মুখে দেয়, তারপর ঢুকে দেয়।
উত্তর : সুই-সুতা।

২১৫। ঢুকানোর সময় ঢোকে না, বের করার সময় বের হয় না।
উত্তর : চুড়ি।

২১৬। ঢুকলে বের হয় না।
উত্তর : কবর।

২১৭। বাজার থেকে এলো সাহেব কোর্ট-প্যান্ট পরে
প্যান্ট খোলার পর চোখের পানি ঝরে।
উত্তর : পেঁয়াজ।

২১৮। আল্লার দড়ি শুকাইতে পারি, ভেজাতে না পারি।
উত্তর : কচুরপাতা।

২১৯। দশ ভাই ধরে, দুই ভাই মারে।
উত্তর : উকুন।

২২০। আসার সময় কেঁদেছিলাম সবাই তখন হাসে
যাবার সময় হাসলাম আমি সবাই তখন কাঁদে।
উত্তর : জন্ম ও মৃত্যু।

২২১। বন থেকে এলো টিয়া, সোনার টুপি মাথায় দিয়া।
উত্তর : আনারস।

২২২। খোদার এমন কাম, এক ঘরে এক খাম।
উত্তর : ছাতা।

২২৩। আকাশে, বাতাসে, মাটিতে, উপরে
ঘরে বাহিরে, ছোটো-বড় সবারে।
উত্তর : ভালোবাসা।

২২৪। একটা মেয়ের হাতে একটা পুতুল আছে। সেই পুতুলটা হাসছিলো, এমন সময় রাস্তা দিয়ে দুইটা ছেলে যাচ্ছিল। একটা ছেলে বললো, এই মেয়ে হাসছ কেন? আর একটা ছেলে বললো, তোমার নাম কি?
উত্তর : আমিনা।

২২৫। একলোক নদীতে গোসল করছে, এমন সময় দুইটা লোক যাচ্ছে। একটা লোক বলছে নদীতে কতটুকু পানি, আর একটা লোক বলছে তুমি কিসের চাকরি কর।
উত্তর : কোম্পানি।

২২৬। লোহার গাই লোহার বাছুর,
তাকে ছেকে মামা শ্বশুর।
উত্তর : তালাচাবি।

www.pathagar.com

২২৭। আছে ফল, গাছে নাই,
খায় ফল চোচা নাই।
উত্তর : বরফ।

২২৮। তুমি থাক ডালে ডালে, আমি থাকি জলে
তোমার সাথে দেখা হবে, মরণের কালে।
উত্তর : মাছ ও মরিচ।

২২৯। এক বেটির নাম পার্বতী, নাচতে নাচতে গর্ভবতী।
উত্তর : লাটাই, সুতা।

২৩০। দৌড়ি গেনু দৌড়ি আনু, লাল লাঠিটা ছাড়ি আনু।
উত্তর : পায়খানা।

২৩১। গালে দিলে নগন্য, পায়ে দিলে ধন্য।
উত্তর : জুতা।

২৩২। পায়ে দিলে নগন্য, মাথায় দিলে ধন্য।
উত্তর : পাগড়ি।

২৩৩। যৌবনে যুবতী, বুড়ো কালে লাল
নেংটা হয়ে বাজারে আসে, জিভে আসে জল।
উত্তর : তেতুল।

২৩৪। তিন অক্ষরে নাম তার সবার কাছে প্রিয় হয়
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে জার্মানির শহর হয়।
উত্তর : জীবন।

২৩৫। বাজারে বউ রানি, এক বাটায় দুই রকম পানি।
উত্তর : ডিম।

২৩৬। আকাশে আকাল নারু, মন ঘুমনীর পাত
কপালে তিলকের ফোঁটা, হস্তে দুইটি দাঁত,
যদি বাঁচে কড়ি, দুই চারটা হাতে ধরি।
উত্তর : সুপারি, পান, চুন, দাঁত ও দই।

২৩৭। এক চরু ভাসে, আর এক চরু হ্যাটে
মাঝেতে ডুবি দিয়া খাস্তাস খাস্তাস করে।
উত্তর : সস্তা (সুপারি কাটার যন্ত্র)।

২৩৮। চাপিয়া চুপিয়া বইসো, চ্যাপ্টা পিড়ার মাঝোত
আর ন্যালন্যালাটা ডুবি দেও, গোরগোরাটার মাঝোত
টাপাস টুপুস করে পরে, হেন্দুর ঘর তাকে দিয়া
কালীপূজা করে।
উত্তর : সয়াবিন তেল।

২৩৯। হাসতে হাসতে চলে গেলাম পর পুরুষের কাছে
দেওয়ার সময় কাঁন্নাকাটি, হয়ে গেলে হাসাহাসি।
উত্তর : চুড়ি।

www.pathagar.com

২৪০। দুলাভাই গো দুলাভাই, কোন্ ক্লাশে পড়ো
কোন্ গাছে পাতা নাই আমাকে বলো।
উত্তর : তরুলতা।

২৪১। খাইলে সোজা হয়, না খাইলে পড়ি যায়।
উত্তর : বস্তা।

২৪২। হায় তরমুজ করি কি? বোটা নাই তার ধরি কি?
উত্তর : ডিম।

২৪৩। হঠাৎ বাবু নমস্কার, তিনটি ছিদ্র আছে কার?
উত্তর : স্যান্ডেল।

২৪৪। উপরে সাদা, ভিতরে সাদা, তার ভিতরে লাল।
উত্তর : ডিম।

২৪৫। চলে কিন্তু হাঁটে না, নামটি কি তার বলো না।
উত্তর : টাকা।

২৪৬ এমন একটা জিনিস যা বাড়বে, তোমাকে সাফল্য দেবে। কিন্তু কেউ তোমার কাছ থেকে তা নিতে পারবে না।
উত্তর : শিক্ষা।

২৪৭। খায় দায় মোতে না,
চিতর হয়ে শোতে না।
উত্তর : মুরগি।

২৪৮। হাত আছে পা নাই,
ভুড়ি আছে মাথা নাই।
উত্তর : শার্ট।

২৪৯। হাটলাং মুরগির ঝাটলাং পাও
গোশত থুইয়া রস খাও।
উত্তর : কুশার/ আখ।

২৫০। যা দিবে তাই খাবে
পানি দিলে মরে যাবে।
উত্তর : আগুন।

২৫১। এইটে গাননু গাছগাছালি, রংপুর গেলো ডাল
তোতা পাখি বাসা করে থাকবে কতো কাল।
উত্তর : রাস্তা।

২৫২। পান দিনু, সুপারি দিনু, পানত দিনু আতর
এই কিচ্ছার মানে না দিলে গুষ্টি শুদ্ধায় মেথর।
উত্তর : চুন।

২৫৩। চতুর্দিকে লোহার আইলো,
পানি শালা কুদি আইলো।
উত্তর : ডাব/ নারিকেল।

www.pathagar.com

অথবা, চারিদিকে লোহার আইলো
ফকির শালা কুদি আইল।
উত্তর : ডাব/ নারিকেল।

২৫৪। ইর গেনু বির গেনু, গেনু বীরের হাট
দেখি আনু একনা বুড়ির গায়ে গায়ে দাঁত।
উত্তর : শিমুল গাছ।

২৫৫। তুমি থাক খালে বিলে আমি থাকি ডালে
তোমার আমার দেখা হবে মরণের কালে।
উত্তর : মাছ ও মরিচ।

২৫৬। দুইটা চালের একটা বাতা।
উত্তর : কলার পাতা।

২৫৭। আম নয়, জাম নয়, গাছে নাহি ধরে
সকল লোকে জানে, তবুও ফল বলে তারে।
উত্তর : পরীক্ষার ফল।

২৫৮। পরের ঘরে জন্ম আমার, দেখতে আমি কাল
তবুও লোকে ভুল করে না, বাসতে আমায় ভালো।
উত্তর : কোকিল।

২৫৯। সাদা পাহাড়ে হরিণ কালো জল খায়
মাথায় টুপি দিয়ে সারাদেশ বেড়ায়।
উত্তর : খাতা-কলম।

২৬০। রাজার বেটা গোসল করে, লুঙ্গি ভেজে না।
উত্তর : কচুর পাতা।

২৬১। উঠো বুড়া মুই বইসোং।
উত্তর : পুরনো খুঁটি।

২৬২। গুয়া গেল গড়গড়েয়া সত্তা গেলো হাট
বাট্টা গেলো শ্বশুর বাড়ি পান খাইবেন কাত।
উত্তর : হাতে।

২৬৩। চার ভাই ঠাকার ঠুকুর,
দুই ভাই বসিনা ঠাকুর,
দুই ভাই টগরা বাজায়,
এক ভাই চরপ ঘুরায়।
উত্তর : গরু।

২৬৪। নদীর পাড়ে বাদামের গাছ
বাদাম ঝুমঝুম করে
একটা বাদাম ছিড়লে
আল্লাহ বিচার করে।
উত্তর : কোরআন শরীফ।

www.pathagar.com

২৬৫। ইত্তি নাচে, বিত্তি নাচে
শুকান ডালে ঘুঘু নাচে
রাত পোয়ালে ঘুঘু মরি থাকে।
উত্তর : কেরোসিনের কুপি।

২৬৬। তিন অক্ষরে নাম তার জলে বাস করে
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে আকাশে উড়ে।
উত্তর : চিতল/ চিল।

২৬৭। তিন অক্ষরে নাম তার স্থানের নাম বুঝায়
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে সর্বলোকে খায়।
উত্তর : ভারত/ ভাত।

২৬৮। ছোট একটা দিঘি, চিংড়ি মাছ ভর্তি।
উত্তর : জাম্বুরা।

২৬৯। একটা গাছের একটা ফল
পাকিলে হয় টলমল।
উত্তর : আনারস।

২৭০। একনা পকি লাল টিসটিস করে
মাথা ছাড়ি ফিচাত জবো করে।
উত্তর : মরিচ।

২৭১। তিন অক্ষরে নাম তার জলে বাস করে
মধ্যের অক্ষর কাটা দিলে আফসোস করে।
উত্তর : ইলিশ।

২৭২। তিন অক্ষরে নাম তার জলে বাস করে
প্রথমের অক্ষর কাটা দিলে মিষ্টি লাগে।
উত্তর : মাগুড়।

২৭৩। ঠিসি ঢুকি দেইম
রক্ত বের করি ছাড়ি দেইম।
উত্তর : পান- সুপারি ও পিক।

২৭৪। এক ছাগলের তিন মাথা
খায় ছাগল দুনিয়ার পাতা।
উত্তর : চুলা।

২৭৫। টিপাটিপি এক টিপে দুই বিচি।
উত্তর : বাদাম।

২৭৬। ঘরের ভিতর ঘর, তার ভিতর ঘর
তার ভিতর বসি আছে, হলুদমাখা বর।
উত্তর : ভিমের কুসুম।

২৭৭। ঢেউয়ের উপর ঢেউ
তার উপর বসিয়া আছে,

www.pathagar.com

লাট সাহেবের বউ।
উত্তর : কচুরিপানা।

২৭৮। একটা পুকুর পানি দিয়া ভর্তি
টিপিলে পানি বেরায় ঝরঝর করি।
উত্তর : চোখ।

২৭৯। একঝাঁক পাখি এসে গাছে বসলো। অন্য একটি পাখি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো : তোমাদের সংখ্যা কতো। জবাবে সে জানালো, 'আমরা যতো, আরো ততো, আরো আসবে অর্ধেকের অর্ধেক। এক আসবে যখন ১০০ পূরবে তখন।
উত্তর : ৪৪, ৪৪, ১১, ১।

২৮০। আমার দাদি খুব অসুস্থ। একটা লেবুর দরকার। লেবু আনতে সাতটি নদী পার হতে হবে। প্রথম মাঝি বললো, যতো আনবে আমাকে অর্ধেক দিবে দ্বিতীয় মাঝি বললো, যতো আনবে আমাকে অর্ধেক দিবে। তৃতীয় মাঝি বললো, যতো আনবে আমাকে অর্ধেক দিবে। চতুর্থ মাঝি বললো, যতো আনবে আমাকে অর্ধেক দিবে। পঞ্চম মাঝি বললো, যতো আনবে আমাকে অর্ধেক দিবে। ষষ্ঠ মাঝি বললো, যতো আনবে আমাকে অর্ধেক দিবে। সপ্তম মাঝি বললো, যতো আনবে আমাকে অর্ধেক দিবে। আমাকে মোট কয়টি লেবু আনতে হবে।
উত্তর : ১২৮টি।

২৮১। বুড়োদের ন'বার ছ'বার, ছোকরাদের একবার।
উত্তর : সুই, সুতা।

২৮২। যতটা টানে ততটা কমে
বলতে পার তার মানে।
উত্তর : বিড়ি/ সিগারেট।

২৮৩। ঘরের ভিতর ঘর, তার ভিতরে কন্যা আর বর।
উত্তর : মশারি।

২৮৪। রাজার বউ রানি, এক বাটায় দুই রকম পানি।
উত্তর : ডিম।

২৮৫। চিত করে ফেলে, উপুড় করে ধরে
এমন করা করে, গহনা সুদ্ধ নড়ে
উত্তর : সিলপাটা/ শিল ও বাটনা।

২৮৬। চারটা ঘড়া উপুড় করা,
তার ভিতরে মধু ভরা।
উত্তর : গাভির দুধের বাট।

২৮৭। এক থালা সুপারি, গুণতে পারে কোন্ ব্যাপারি।
উত্তর : আকাশের তারা।

২৮৮। শুইতে গেলে দিতে হয়, না দিলে ক্ষতি হয়।
যা ভেবেছো তা নয়।
উত্তর : দরজার হুরকা।

www.pathagar.com

২৮৯। বলতে পারিস অন্ত, দাঁড়িয়ে ঘুমায় কোন্ জন্তু ?
উত্তর : ঘোড়া।
২৯০। পাকলে খেতে চায় না
কাঁচায় খেতে চায়
এ কেমন ফল বলো তো আমায়।
উত্তর : শসা।
২৯১। মাইয়া লোকের হাতে নাচে
সাত শ' মুখ কার আছে?
উত্তর : চালুনি।
২৯২। ভোলা মিয়ার শয়তানি
বাইরে লোহা ভিতরে পানি।
উত্তর : নারিকেল।
২৯৩। তিন অক্ষরে নাম তার, বৃহৎ বলে গণ্য
পেটটা তার কেটে দিলে, হয়ে যায় অন্ন।
উত্তর : ভারত।
২৯৪। ছাই ছাড়া শোতে না,
লাথি ছাড়া ওঠে না।
উত্তর : কুকুর।
২৯৫। জলেতে বাস তার, জলে ঘরবাড়ি
ফকিরও নয়, ওঝাও নয়, মুখে আছে দাড়ি।
উত্তর : চিংড়ি মাছ।
২৯৬। ঘর আছে, দরজা নাই
মানুষ আছে, কথা নাই।
উত্তর : কবর।
২৯৭। হেন কোন্ গাছ আছে এ ধরায়
স্থলে, জলে কভু তা নাহি জন্মায়।
উত্তর : পরগাছা।
২৯৮। কৈলাটির নানী
হাত দিয়া ধরলে হয় পানি।
উত্তর : বৃষ্টির সাথে পড়া পাথর।
২৯৯। আমার একটা পাখি আছে, যা দেই তাই খায়
কিছুতেই মরে না পাখি, জলে মরে যায়।
উত্তর : আগুন।
৩০০। হাত নাই, পা নাই, পিট দিয়ে চলে
রাত দিন জলে।
উত্তর : নৌকা।
৩০১। দুই মায়ের এক সন্তান
বলতো এটা কি?
উত্তর : দরজার খিল।

www.pathagar.com

৩০২। চার অক্ষরে নাম তার গুণে পরিচয়
সামনের দুই অক্ষর বাদ দিলে বিয়ে করতে যায়।
উত্তর : মুজিবর।

৩০৩। তিন অক্ষরে নাম তার সবাই খেতে চায়
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে মূল্য বুঝায়।
উত্তর : বাদাম।

৩০৪। এক হাত গাছটা, ফল হয় পাঁচটা।
উত্তর : হাতের আঙ্গুল।

৩০৫। ইরকিচি বিরকিচি, নাই চোচা নাই বিচি।
উত্তর : লবণ।

৩০৬। নদীর পারত ব্যালের গাছ
ঝলমল করে, কারো বাপের শক্তি নাই
কাটি আনির পারে।
উত্তর : পানি।

৩০৭। এগিনা আনা খুঁটি
টিপটিপা পুঠি।
উত্তর : ঢ্যাপ।

৩০৮। আড়াতে থাকে আড়ানি
পানিতে থাকে ডোবানি
খালে ভক্ত, তিনে শক্ত।
উত্তর : বাঘ, কুমির ও সাপ।

৩০৯। লাল টুক্‌টুক্ বাঁশের মুড়া
বাপ থাকতে ব্যাটা বুড়া।
উত্তর : মরিচ।

৩১০। দুই ভাই ধরে, এক ভাই ঝাপ্পে।
উত্তর : ছেউতি।

৩১১। লাঠির উপর গুঠি, গুঠির উপর দানা
এই ছিলকার মানে না দিলে গোষ্ঠি সুদ্দায় কানা।
উত্তর : ভুট্টা।

৩১২। একখান বাতা দুইখান চালি
মানেটা কি কতো শালি। উত্তর : কলার পাতা।

৩১৩। এতের কাকই ব্যাতের কাকই
হাত দিলে মোর কাঁন্দে বাপই।
উত্তর : হারমোনিয়াম।

৩১৪। এগিনা এনা পাখি, লোহার কালাই খায়,
সাতটা নদী পার হয়া, যুদ্ধ করিবার যায়।
উত্তর : বন্দুক।

www.pathagar.com

৩১৫। রাজার ব্যাটা ভাত খায়
পিঁড়ার তলদি সাপ যায়।
উত্তর : পিঁপড়া।

৩১৬। অউ মউ চউ চাকলা
একগাছতে ফল, ফুল
কারেঙ্গা, কাচা কলা।
উত্তর : শিমুলের ফুল।

৩১৭। আমি খেয়ে মরি লাজে, অন্যে হাসে প্রাণে বাজে।
উত্তর : হোঁচট খাওয়া।

৩১৮। উপর থাকি পইলো খোচা
রান্ধি খাইলে এত মজা।
উত্তর : সজ্না।

৩১৯। চুটকুট ভেকেরা মাঝোত কুজ,
এগিনা কথার উত্তর সারাদিন খুঁজো।
উত্তর : চিংড়ি মাছ।

৩২০। খুঁজে খুঁজে মরি,
খুঁজে পেলেও ঘরে তুলি না।
উত্তর : ঝাড়ু।

৩২১। একেনা ঝিক নেতের পেতের, তাতে পইছে মাছরাঙ্গা,
মাছরাঙ্গা মারলো ডুব, কিবা পাখির কিবা রূপ।
উত্তর : দেবী।

৩২২। মধ্য নদীত ফেলালু কুঠা,
কুঠা করে মোর উঠা ডুবা,
গাই বড় হারামজাদা
দুধ বড় মিঠা।
উত্তর : মধু।

৩২৩। গোস্তর উপর টোগরা, মুই তোর সোগরা।
উত্তর : নখ।

**তথ্যসহায়ক**

১। কৃষ্ণ কুমার, পেশা : কুমার, বয়স : ৫৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, ডিমলা, সদর
২। পূর্বোক্ত
৩। চিরলা, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৩৬, শিক্ষাগত যোগ্যতা: নাই, রামডাঙ্গা, ডিমলা
৪। আব্দুল মজিদ, রিকশা চালক, বয়স : ৫৩, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, ডালিয়া তালতলা, ডিমলা
৫। মোঃ জহর আলী, পেশা : কৃষি, বয়স : ৪৭, শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম শ্রেণি, মধ্য ছাতনাই, ডিমলা

www.pathagar.com

৬। পূর্বোক্ত
৭। মোঃ সফিয়ার রহমান, পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৩২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ষষ্ঠ শ্রেণি, দোয়ানি গড্ডিমারি, ডিমলা
৮। পূর্বোক্ত
৯। পূর্বোক্ত
১০। পূর্বোক্ত
১১। ইসলাম আলী, পেশা : চায়ের দোকানদার, বয়স : ৫০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, মধ্য ছাতনাই, ডিমলা
১২। পূর্বোক্ত
১৩। মেরিনা বেগম, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৩৭, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, নাউতারা, ডিমলা
১৪। পূর্বোক্ত
১৫। তুলেস চন্দ্র দাস, পেশা : জেলে, বয়স : ৩৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : সপ্তম শ্রেণি, রামডাঙ্গা, ডিমলা
১৬। পূর্বোক্ত
১৭। ইউসুফ আলী, পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৪৮, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, দক্ষিণ হাইস্কুল পাড়া, ডিমলা
১৮। পূর্বোক্ত
১৯। জয়নাল আবেদীন, পেশা : কৃষি, বয়স : ৬২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : তৃতীয় শ্রেণি, দক্ষিণ খড়িবাড়ি, ডিমলা
২০। রাবেয়া, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৩৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, টেপা খড়িবাড়ি, ডিমলা
২১। সনু রাম রায়, পেশা : কৃষি, বয়স : ২২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : চতুর্থ শ্রেণি, হলহলিয়া, মির্জাগঞ্জ, ডোমার
২২। পূর্বোক্ত
২৩। পূর্বোক্ত
২৪। পূর্বোক্ত
২৫। পূর্বোক্ত
২৬। মনি, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৮০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, বোড়াগাড়ি, ডোমার
২৭। কাজিমুদ্দিন, পেশা : কৃষি, বয়স : ৬০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, বোড়াগাড়ি, ডোমার
২৮। মোজাম্মেল হক, পেশা : কৃষক, বয়স : ৭৩, শিক্ষাগত যোগ্যতা : চতুর্থ শ্রেণি, হরিণচড়া, ডোমার
২৯। মমেজা খাতুন, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৫৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, হরিণচড়া, ডোমার
৩০। নছম উদ্দিন, পেশা : কৃষি, বয়স : ৮০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, বোড়াগাড়ি, ডোমার
৩১। মোঃ একরামুল হক, পেশা : কৃষি, বয়স : ৫৪, শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই.এ, হরিণচড়া, ডোমার
৩২। পূর্বোক্ত
৩৩। পূর্বোক্ত
৩৪। পূর্বোক্ত
৩৫। মোঃ মমিনুর রহমান, পেশা : ছাত্র, বয়স : ২৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই.এ, সাতজান, নাউতারা, ডিমলা
৩৬। পূর্বোক্ত
৩৭। পূর্বোক্ত

www.pathagar.com

৩৮। পূর্বোক্ত
৩৯। মোছাঃ অলিমা খাতুন, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৪৭, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, ডালিয়া সরকারপাড়া, ডিমলা
৪০। ছইতন, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৫২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, ডালিয়া সরকারপাড়া, ডিমলা
৪১। শফিকুল ইসলাম, পিতাঃ জয়নুল আবেদিন, গ্রামঃ উত্তর দেশিবাই, উপজেলাঃ জলঢাকা
৪২। পপি রানি, পিতাঃ মানিক চন্দ্র, উপজেলাঃ জলঢাকা
৪৩। জেসমিন আক্তার, পিতাঃ যাদু মিয়া, গ্রামঃ পশ্চিম গোলমুণ্ডা, উপজেলাঃ জলঢাকা
৪৪। মিতু আক্তার, উপজেলাঃ জলঢাকা
৪৫। ফাতেমা তুজ জোহরা, পিতাঃ খলিলুর রহমান, গ্রামঃ আমরুল বাড়ি, উপজেলাঃ জলঢাকা
৪৬। তাসমিনা আক্তার তিসা, পিতা : খলিলুর রহমান, গ্রাম : আমরুল বাড়ি, উপজেলা : জলঢাকা
৪৭। খায়রুন নাহার খুশি, পিতা : খলিলুর রহমান, গ্রাম : আমরুল বাড়ি, উপজেলাঃ জলঢাকা
৪৮। রুবেল হোসেন আজাদ, উপজেলাঃ জলঢাকা
৪৯। মোঃ রিপন ইসলাম, পিতা : ইছাহাক আলী, উপজেলা : জলঢাকা
৫০। মিষ্টি আক্তার, উপজেলা : সদর
৫১। কৃষ্ণা রানি, গ্রাম : বেড়াডাঙ্গা, উপজেলা : সদর
৫২। আইরিন নাহার, পিতা : আতিকুর রহমান, গ্রাম, পোষ্ট ও উপজেলা : জলঢাকা
৫৩। শাহনাজ পারভীন, উপজেলা : জলঢাকা
৫৪। নিশা রায় নবনী, পিতা : নৃপেন্দ্রনাথ রায়, গ্রাম : পূর্ব গোলমুণ্ডা, উপজেলা : জলঢাকা
৫৫। বৃষ্টি রানি রায়, পিতা : দীনবন্ধু রায়, গ্রাম : মুদিপাড়া, উপজেলা : জলঢাকা
৫৬। লাবনী আক্তার টুম্পা, পিতা : আব্দুল মান্নান, উপজেলা : জলঢাকা
৫৭। সুমনা আক্তার সেতু, পিতা : জাহেদুল ইসলাম, গ্রাম : শৌলমারী, উপজেলা : জলঢাকা
৫৮। আঁখি মণি, পিতা : আখতারুজ্জামান, গ্রাম : বারঘড়িপাড়া, উপজেলা : জলঢাকা
৫৯। বিনীতা বিশ্বাস, পিতা : বিপুল বিশ্বাস, গ্রাম : আদর্শপাড়া, উপজেলা : জলঢাকা
৬০। পূর্ণিমা রানি, ডাক ও উপজেলা : জলঢাকা
৬১। নুরনাহার আক্তার, পিতা : মোঃ লোকমান আলী, গ্রাম : দক্ষিণ কাজীর হাট, উপজেলা : জলঢাকা
৬২। সাগরিকা রায়, জলঢাকা
৬৩। নাহিদ হোসেন, গ্রাম : চড়াইখোলা, উপজেলা : সদর
৬৪। মমিনুর রহমান, গ্রাম : পূর্ব বালাগ্রাম, উপজেলা : জলঢাকা
৬৫। খাদিজা তুল কোবরা, পিতা : আব্দুল গফুর, গ্রাম : বগুলা গাড়ি, উপজেলা : জলঢাকা
৬৬। নাসিমা ইসলাম, উপজেলা : সদর
৬৭। শাম্মী আক্তার শিমু, উপজেলা : জলঢাকা
৬৮। মোঃ মজিদুল ইসলাম, গ্রাম : চড়াইখোলা, কাঞ্চন পাড়া, উপজেলা : সদর
৬৯। আরমিন আক্তার মিম, গ্রাম : চড়াইখোলা, উপজেলা : সদর
৭০। আয়শা সিদ্দিকা, গ্রাম : চড়াইখোলা, উপজেলা : সদর
৭১। নুসরাত ইসলাম বন্যা, পিতা : নূর ইসলাম, গ্রাম : বগুলাগাড়ি, পোষ্ট : রাজারহাট, উপজেলা : জলঢাকা
৭২। রেবিনা আক্তার, পিতা : মকছুদার রহমান, গ্রাম : উত্তর চেরেঙ্গা, উপজেলা : জলঢাকা
৭৩। সুমাইয়া আক্তার, পিতা : আবুবকর সিদ্দিক, গ্রাম : কলেজ পাড়া, উপজেলা : জলঢাকা।
৭৪। মোছাঃ নাজমা আক্তার, জলঢাকা
৭৫। নাজমুল হাসান নিরব, জলঢাকা সদর

www.pathagar.com

৭৬। শাহানাজ আকতার, পিতা : সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম : দুন্দিবাড়ি, ডাকঘর : বালাপাড়া, উপজেলা : জলঢাকা
৭৭। মোঃ সুরত আলী, বয়স : ৫৫ বছর, গ্রাম : সঙ্গলসী, সদর
৭৮। মোছাঃ সামসুন নাহার, বয়স : ৬৩ বছর, গ্রাম : কুন্দল, সৈয়দপুর
৭৯। উম্মেহানী, বয়স : ৫৫ বছর, বাঙালিপুর, সৈয়দপুর
৮০। নাজমুল হক, বয়স : ৫৫ বছর, বাঙালিপুর, সৈয়দপুর
৮১। আজিজুল হক, বয়স : ৫০ বছর, বাঙালিপুর, সৈয়দপুর
৮২। ভূবন কৃষ্ণ দাস, বয়স : ৭০ বছর, গ্রাম : পুটিমারী, কিশোরগঞ্জ

www.pathagar.com

# প্রবাদ-প্রবচন

নীলফামারী জেলার গ্রামাঞ্চলের বয়স্ক ব্যক্তিগণ তাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় কিছু অর্থপূর্ণ বাক্য তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কথা প্রসঙ্গে উচ্চারণ করে থাকেন। এই সকল বয়স্ক ব্যক্তিদের উচ্চারিত অর্থময় বাক্যগুলোই এক সময় প্রবাদ প্রবচনের শিল্পরূপ লাভ করে। নীলফামারী জেলার সর্বত্রই অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত আছে। সেগুলোর মধ্য থেকে আমাদের সংগৃহীত বহুল প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনগুলো নিচে তুলে ধরা হলো :

১। মাগের জারে বাগ কাঁন্দে, চৈতের জারে মইষের শিং নড়ে
আর পৌষের জারে বামন আগা হালের গরু ব্যাচে গার কাপড় কেনে।

২। টোপরা দেখি টুপরি নাচে, নাই টোপরাটা বসিয়া আছে।

৩। হাসর হাত তোনা মোনা, হামার ধান বাড়ির সোনা।

৪। আম খাইও জাম খাইও, তেঁতুল খাইও না
তেঁতুল খাইলে প্যাট বিষাইবে ছাওয়া হবে না।

৫। বাড়ির গরু খুলির ঘাস খায় না।

৬। কথাতে কথা বেরায়, ব্যঞ্জনে বেরায় ঝোল।
অধিক কথা কইলে লাগে গণ্ডগোল।

৭। ভালোর ভালো সর্বকাল, মন্দর ভালো আগে
রাজকন্যা যায় বাপের বাড়ি, সন্ন্যাসিক খাইল বাঘে।

৮। মনে মনে খা মাই মনে মনে গিল
পানের বোটা দিয়া তেল দিলাম, এইটায় তোর শিল।

৯। তকদিরে যদি সুফল ফলে, শুকনাতেও ডিঙ্গা চলে
ঘরে বসি খায় নানা ভোগ
তকদির যদি ফেরে পরে দুবলা বনেও বাঘ ধরে
পিছে পিছে বেড়ায় নানান রোগ।

১০। কপালে কইল্যা ভাজি বিচি ঘচাঘচ
কচুর চেয়ে লতি ভালো চলে ফচাফচ।

১১। আগ না ভাবনু পাচ না ভাবনু , বড়র সাথে করনু মেলা
আর আহার করতে ঠোঁট ভাংবু, এলা বসিয়া বোঝং ঠেলা।

১২। ছি রে নারী পচা মাথা তোর, গাও নাড়তে জাত গেল
টাকার খরচ মোর।

১৩। জান কথা ফান, না জান কথা পূর্ণিমার চান।

১৪। মানির মান থাকবে না, চেংরা হইচে দেওয়ানি
নদী হইচে বালুচর, কোষকে বাতি জ্বলিবে।

www.pathagar.com

১৫। আদি মাটিত না দেই পাদি, চুকানি মাটিত সেও
বাপের যে কিনা আছে ভাঙ্গা টিকর, সে কিনা আবাদ করি খাও।
১৬। আড়াই বেচা পান বাড়াই বেচা পান
বান্ধি দাসি কথা কয়, তাও না দি কান।
১৭। আগে ছিনু কাউয়া কুলি, এলা হইচে কৃষ্ণমনি
জল দিয়া আন্দিল ভাত, তাকে করছে মহাপ্রসাদ।
১৮। বুড়ার হইচে বাবত আর চেংরার হইচে তাবত।
১৯। ক্ষুদা যখন পাইবে তখন বাঘেও ধান খাইবে।
২০। রাগ নোমায় চণ্ডাল ভঞ্জায়, পুরুষের নাহি বিনাশ।
২১। যেই খাল খোড়েগা, সেই খালে পড়েগা।
২২। আষাঢ় মাসে নামিল বৃষ্টি, ব্যাঙের খেলা চমৎকার
হোলা ব্যাঙের নাচা ঝাপ্পা, টোকরাই ব্যাঙের পেটটা ফাপা
ঘরের টুনি ব্যাঙ বলে, দিল্লির খবর আমার কাছে।
২৩। ভোদার খড়ি খোদায় গোনে, চালাকের খড়ি বাটপারে গোনে।
২৪। বাড়িত নাই কোন্ পুষ্টিত মাকে ছোনো।
২৫। বিয়া করলাম আন্তা, বউ খায় গরম হামাক দেয় পান্তা।
২৬। আগা হাল যেদিক যায়, পাছা হালও সেদিক যায়।
২৭। চোদন পাইলে বিলাইও গাছত চড়ে।
২৮। কথাতে কথা বাড়ে যত্তনে বাড়ে ঘি
কথার পৃষ্ঠে কথা বলবো আমি করবো কি।
২৯। বাপের সুপুত্র হয় ছেয়ায় ছেয়ায় হাট যায়
বাপের কুপুত্র হয় ঘাটায় পথে ন্যাদাই খায়।
৩০। মহাজ্ঞানীর মাথা বিনীত সতত ফলভার, শাখাপ্রশাখা যত অবনত।
৩১। যেখানে গুড় সেখানে মিষ্টি, পিঁপড়ায় করে দেয় ঝগড়ার সৃষ্টি।
৩২। আগের দিন আর নাই রে নেত, দিন হইচে তোর আর এক মত।
৩৩। এখন কি বুঝবু মাই বুঝবু কাইল, হাত ধরি পার করিম তোক বড় বড় আইল।
৩৪। ঘসি দেখি গোবর হাসে, ঐ দশা মোরো আছে।
৩৫। কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষে, আং না ঢাং বাঁশের খোলটা খাং।
৩৬। চোখ রাঙা পুরুষ ভালো, যদি না খায় ভাং।
মুচকি হাসি নারী ভালো যদি না করে নাং।
৩৭। আগত খাইছি ঢেমসির গুড়া, এলা খাইছি চাউলের গুড়া।
৩৮। হাতের নাম থাপন, তায় জানে মোর পর আর আপন।
৩৯। আটিয়া কলাক কলা না কই বিচি খসখস করে
পরার পুতক পুত না কই হিয়া ঝিরঝির করে।
৪০। মাই এবার তুই ভাদর মাসে নাই খাইস পিঠা
এই জন্যে ধানত পইছে চিটা।

www.pathagar.com

৪১। আগের দিন আর নাই রে কাউয়া, আমের ডালি মাথায় নিয়া
হাগির বইছে নাউয়া।
৪২। পোয়াল খ্যাড়ের ছাই আর, কাঙালের সাগাই।
৪৩। বাড়ির মুরগা টারির ডেকি।
৪৪। হাগার বাপে চেতায়।
৪৫। ফরুয়ার শাটক বেশি।
৪৬। মনসিদ্ধি কাটুয়ায় গঙ্গা।
৪৭। টিকরাত নাই ছাল চামড়া, কিনি বেড়ায় নাল দামড়া।
৪৮। ঝোলাত নাই কড়ি ফকির মজা গুয়া বাচে / চাউল নাই ঝুলিত, ফকির নাচে খুলিত।
৪৯। শুনা কথা দুনা, তাতে দিছে আকালির চুনা।
৫০। পাইছে ছাতি ফরকাইছে নাটি।
৫১। কাঙাল পাইছে শাড়ি বেড়ায়ছে টারি টারি।
৫২। চোদনের ঠেলাত বৈরাগী নাচে।
৫৩। পড়িয়া হয় না শিক্ষিত, না পড়ি হয় পণ্ডিত।
৫৪। চিকা মারি হাত গোন্ধায়।
৫৫। হেরা হারাম সরুয়া মিঠা।
৫৬। ভাত নেনগো খালা আম্মা সাংকি হইছে খালি
তোমার দেশের ভাষা হামার দেশের গালি।
৫৭। কি দেখিস রে হ্যাদলা, নয়া সাগাইর ভার ভাটালি, বুড়া সাগাইর ফ্যাদলা।
৫৮। হাগার চেয়ে প্যারপেরি বেশি।
৫৯। আলো চাল দেখি ভেড়ার মুখ চুলকায়।
৬০। পাটা নাই কিনতে হোলত দড়ি নাগাইস।
৬১। রাজার সুখে প্রজার বাস, আন্দনির সুখে পন্তায় গাস।
৬২। যাকে না প্যালে গরু, বাড়িত তায় হইছে থলের পরমানিক।
৬৩। আদা গারে গাদা, কুশার গারে হারামজাদা
দাদায় গারে নারিকেল, বক্কিল গারে বাঁশ।
৬৪। কথা কই হামরা মুকত, হানলে মারি বুকত।
৬৫। খুচরা পাইসার আওয়াজ বেশি।
৬৬। হাজার টাকা সরিমুখি, আদি পাইসা চাড়ালমুখি।
৬৭। লাঠি ছাড়েন সাথী ছাড়েন না।
৬৮। ভাই ভাই বনে গাই গাই বনে না।
৬৯। যদি হয় দুই ভাই, তা হলে বাঘ মারিতে যাই।
৭০। যেমন তেমন দুই ভাই যেমন তেমন দুই গাই।
৭১। নাউয়া দেখলে নখ বাড়ে, হ্যারার উপর পেসার মারে।
৭২। বেল পাকিলে কাউয়ার কি, মুসলমান মরিলে নাউয়ার কি।
৭৩। ধারুয়া ধার পায়, জারুয়া জাগা পায়।

www.pathagar.com

৭৪। আসল কথায় দোস্ত বেজার গরম ভাতে বিলাই বেজার।
৭৫। নরম জাগাত বিলাই হাগে।
৭৬। কলির ধার কলিতেই শোধ।
৭৭। হেন্দুর মুখের দাড়ি আর নদীর পাড়ের জমি।
৭৮। পায় না মুরগি হাচড়ে বেশি, সেই মুরগির দাম বেশি।
৭৯। যেমন হ্যাকরা তেমন হেকরি, যেমন পাটাশাক তেমন নাকড়ি।
৮০। নিপুত্রির ধন খায় নিরঞ্জন।
৮১। যে বকরির বকরি তেখ্যাওয়া তার দড়ি
বাচ্চায় না পায় দুধ ওলান যায় ধেদড়ি।
৮২। যে বাঙ্গা ফলে দো পাতায় তার চিন।
৮৩। যে দেশেতে যাও না কেন ক্যারকা ছাড়া নাই।
৮৪। বালফাটা ফকিরের কানঢাকা টুপি।
৮৫। হোল ফ্যালা আড়িয়ার দপদপি খ্যানে সার।
৮৬। বিপদের সময় ব্যাঙেও ডেওয়ায়।
৮৭। মার আগত মামার বাড়ির গল্প।
৮৮। পুরান পাগলার ভাত নাই নয়া পাগলার আমদানি।
৮৯। দর্জির মার ছিড়া খ্যাতা, ছাকর বানের ভিজা মাথা।
৯০। গাছত চড়ে দিয়া মই নিগি পালাইস।
৯১। চাঁদেরও কলঙ্ক হয়, জানের বন্ধু আপন না হয়।
৯২। আম কাঁটল শুকি মরে, খোকসার গাছত পানি ঢালে।
৯৩। চোরের দশ দিন আর গিরির এক দিন।
৯৪। কোমরের ছুরি প্যাট কাটে।
৯৫। অতি বড় ঘরনি না পায় ঘর, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।
৯৬। অলক্ষীতে ঘর ছাড়ে কাঙালের ক্ষুধা বাড়ে।
৯৭। বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না।
৯৮। অল্প জলের পুঁটি রে তুই, গভীর জলের বুঝবু কি?
পানি শুকাইবে বকে ধরিবে, মিটবে রে তোর কিটকিটি।
৯৯। জড়গোষ্ঠী হ্যাঙ্গা, কইড় দেওয়া ঠ্যাঙ্গা।
১০০। সুখে থাকিলে বামন ডোডায়।
১০১। যার জন্যে করলাম চুরি সেই বলে চোর।
১০২। দুষ্টু লোকের মিষ্টি কথা, উকুন নাই মাইর চুলকায় মাথা।
১০৩। দিনোত করে চকিদারি, আইতত করে বাইগোন চুরি।
১০৪। যার খালু তারে পাতোত হাগলু।
১০৫। যখন ওঠে প্যাটের বিষ, তখন উঠে আল্লার উদ্দিস।
১০৬। কাজ তো নাই যেন অকাজের পাণ্ডা।
১০৭। আগে গেইলে সাপে খায়, পাছত গেইলে সোনা পায়।
১০৮। যদি থাকে মনোত থাকে না কেন দেশের এক কোনত।

www.pathagar.com

১০৯। হম্বু কালে খাইছে দই, তার কথা কেনে আইজো কই।
১১০। কোন কুলে জন্ম হোক নসিব মতো ভালো হোক।
১১১। এত্তনা মাই তুই এতো নাটক করিস
কলার থোপত চ্যারা থুইয়া, ঢোনা ধরি টানিস।
১১২। মাইয়া হইতে বন্ধুবান্ধব, মাইয়া হইতে ভাই
মাইয়াতে শ্বশুর শালা ন্যাকা জোকা নাই।
১১৩। রাস্তা নষ্ট করলো ট্রাক, বেইচ্যাক নষ্ট করলো ব্রাক
আর চেংরাক নষ্ট করলো টিপি, বই আর ডিমান।
১১৪। লাভে লোহা উবায় বিনা লাভে তুলাও না উবায়।
১১৫। মুখ মোন্দা গরু গু খাওয়ার জম।
১১৬। শয়তানের ভ্যালটা মরণ।
১১৭। আমে ধান, তেইতোলে বান।
১১৮। পান খায়া না খাইলোং চুন সে বা পানের কিবা গুণ।
১১৯। পানে মাটি দুধে ছাই সব রোগের আপন ভাই।
১২০। চেংরাক না দেখাই ঘুঘুর বাসা, বেইচ্যাক না কই মনের কথা।
১২১। মোক না দোষং মোর কপালোক দোষং
ভাত খাবার বসি টোংরা চোষোং।
১২২। অসের খাটোং সমেক পরে, খ্যায়ার ব্যাচে খায় ধনা
সোহাগি মাইর খায়, কাম করি খায় সোনা।
১২৩। দুঃখের আগত কইলে কথা দুঃখ মানি নেয়
সুখের আগত কইলে কথা হাসিয়া ফেলায়।
১২৪। দিনে আইতে সিয়ায় ফোড়ায়, ছেয়াত বসি কাম
সুখত থাকি বামন ডোডায়, কয়া গেইছে কাম।
১২৫। সূচ, সোহাগা, সুজন, ভাঙে-গড়ে তিনজন।
১২৬। আছে গরু না বয় হাল, তার দুঃখ সর্বকাল।
১২৭। মা দেখি ছাওয়া জোর, কলা দেখে নোকা তোল।
১২৮। হালের গরু পালের শোভা।
১২৯। নিন্দ না মানে ভাঙ্গা খাট, পিপাসা না মানে ঘাট-অঘাট।
১৩০। বাড়িলে কদু, না বাড়িলে কুমড়া।
১৩১। আম, কাঁঠাল শুকি মরে, খোকসার গাছত পানি ঢালে।
১৩২। কাঙাল পাইছে চিঠি, চিঠি বেড়াইছে দোলাবাড়ি দোলাবাড়ি।
১৩৩। আইলো বান্দো পানিও ছেকো, কায় কুদি যায় তাকো দেখো।
১৩৪। আসল কাজে মুসল নাই, ঢেঁকি ঘরে চান্দোয়া।
১৩৫। ভালো জাতের কচু হলে, এক ভাপে সেজে
ভদ্রলোকের সন্তান হলে এক কথায় বোঝে।
১৩৬। নদীর পানি ঘোলায় ভালো, জাতের মেয়ে কালোয় ভালো।

www.pathagar.com

১৩৭। মুখ খানোতে চর থাপ্পড়, মুখ খানোতে ভাত কাপড়।
১৩৮। হাতের নাম থাপন, হাতে চেনে পর আর আপন।
১৩৯। টাকার নাম বইনা, ব্যারকে আনো অপরের কইনা।
১৪০। পান খাইতে তার সাদ লাগে না, সাদ লাগে চুনে
রূপে তার মন ভোলে না, মন ভোলে তার গুণে।
১৪১। রসুনে রসুনে গোটা, পেয়াজ মাঝখানে ফ্যারকাটা।
১৪২। নিজের খাই নিজের দাই, মানুষের কেনে খোসা ব্যারকের যাই।
১৪৩। আটো থালির ঠাসো ভাত, এইটা আমার মায়ের হাত
চ্যাতেরা থালির ব্যাদেরা ভাত, এইটা আমার শাশুড়ির হাত।
১৪৪। হাত পাওগুলা ছাওয়ার মতন, কথাগুলা বুড়া মানুষের মতন।
১৪৫। খুচরা কামের মজিরা নাই, পান্তা ভাতের নাম নাই।
১৪৬। ভাত খায় ভাতারের, গরু চরায় নাঙ্গের।
১৪৭। ঘর থাকতে মাথা ভেজা, দরজির ছেড়া কেতা।
১৪৮। কাম নাই কুত্তার আইলে আইলে দৌড়।
১৪৯। মালির বাড়িত খাওয়া দাওয়া, তেলির বাড়িত থানা।
১৫০। সাত বিষ কোকে, দুই হাটুয়া বুকে।
১৫১। জাতে না ছাড়ে জাতের খোয়, শিয়ালে না ছাড়ে বন
সাত ধোয়া দিয়া শুকটা আন্দিলে তবু না যায় গোন।
১৫২। ঢালে পানি ধরে না, গোড়ায় রস ধরে না।
১৫৩। ভার ভারাটি দেখলে মল্লের মাও হয়, না দেখিলে কিছুই নাই।
১৫৪। ঘি দিয়ে আন্দে নিমের পাত, তাও না ছাড়ে আপন জাত।
১৫৫। ইলিশ মাছের খিসখিস কাটা, পরের মায়ের চৌদ্দ বুড়ি কথা।
১৫৬। ভ্যাবলের মাও ভাজুক।
১৫৭। ঠোট সেলাই করে থাকা।
১৫৮। কুত্তা রাজা হলেও জুতা খায়।
১৫৯। দাসীর কথা বাসি হলে ফলে।
১৬০। হায় রে আমরা কেবল আটি আর চামড়া।
১৬১। দিন গেল মোর আলে-ঝালে
সইন্দার সময় বারা ঝোলে।
১৬২। টোপলা দেখি টুপলি নাছে
নাই টোপলা বসি থাকে।
১৬৩। কোলার ছাওয়া নোনা
পাথারী ছাওয়া সোনা
১৬৪। চোর খায় চাম্পাকলা
চোরের মাইয়ার ডাঙ্গর গালা।

www.pathagar.com

## তথ্যসহায়ক

১। মোঃ অলিয়ার রহমান, বয়স : আশি বছর, পেশা : কৃষি, লেখাপড়া : চতুর্থ শ্রেণি, চান্দখানা, চিলাহাটি, ডোমার
২। পূর্বোক্ত
৩। পূর্বোক্ত
৪। পূর্বোক্ত
৫। পূর্বোক্ত
৬। প্রফুল্ল, বয়স : ৪৫ বছর, লেখাপড়া : নবম শ্রেণি, পেশা : কৃষি, দক্ষিণ তিতপাড়া, ডিমলা
৭। পূর্বোক্ত
৮। পূর্বোক্ত
৯। আবুল কালাম আজাদ, পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৪২ বছর, লেখাপড়া : পঞ্চম শ্রেণি, ডালিয়া সরকার পাড়া, খালিসা চাপানি, ডিমলা
১০। পূর্বোক্ত
১১। মোঃ মাহতাব উদ্দিন, পেশা : কৃষি, বয়স : ৬০ বছর, লেখাপড়া : নাই, ডালিয়া সরকার পাড়া, খালিসা চাপানি, ডিমলা
১২। পূর্বোক্ত
১৩। রওশনারা বেগম, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৪০ বছর, লেখাপড়া : পঞ্চম শ্রেণি, রামডাঙ্গা, ডিমলা
১৪। পূর্বোক্ত
১৫। ভারতি, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৫৭ বছর, লেখাপড়া : নাই, রামডাঙ্গা, ডিমলা
১৬। পূর্বোক্ত
১৭। পূর্বোক্ত
১৮। পূর্বোক্ত
১৯। পূর্বোক্ত
২০। আক্কাছ আলী, পেশা : কৃষি, বয়স : ৭০ বছর, লেখাপড়া : পঞ্চম শ্রেণি, বাইশ পুকুর, ডালিয়া খালিসা চাপানি, ডিমলা
২১। পূর্বোক্ত
২২। গেদু রাম দাস, পেশা :জেলে, বয়স : ৬৭ বছর, লেখাপড়া : নাই, রামডাঙ্গা, ডিমলা।
২৩। পূর্বোক্ত
২৪। সহিদুল ইসলাম, পেশা : কৃষি, বয়স : ৪২ বছর, লেখাপড়া : নাই, পূর্ব ছাতনাই, ডিমলা
২৫। পূর্বোক্ত
২৬। ফজলু, পেশা : দিনমজুর, বয়স : ৪৫ বছর, লেখাপড়া : নাই, দক্ষিণ সুন্দরখাতা, বালাপাড়া, ডিমলা
২৭। পূর্বোক্ত
২৮। পূর্বোক্ত
২৯। লাবু মিয়া, পেশা : ব্যবসা, বয়স : ১১৫ বছর, লেখাপড়া : নাই, মধ্য ছাতনাই, ডিমলা
৩০। সফিয়ার রহমান, পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৩২ বছর, লেখাপড়া : ষষ্ঠ শ্রেণি, দোয়ানি, ডিমলা
৩১। পূর্বোক্ত
৩২। পূর্বোক্ত
৩৩। ইউসুফ আলী, পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৪৮ বছর, লেখাপড়া : নাই, দক্ষিণ হাইস্কুলপাড়া, ডিমলা

www.pathagar.com

৩৪। পূর্বোক্ত
৩৫। আরতি বালা, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৫০ বছর, লেখাপড়া : নাই, দক্ষিণ তিতপাড়া, ডিমলা
৩৬। পূর্বোক্ত
৩৭। চিরলা, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৩৬ বছর, লেখাপড়া : নাই, রামডাঙ্গা, ডিমলা
৩৮। পূর্বোক্ত
৩৯। পূর্বোক্ত
৪০। পূর্বোক্ত
৪১। আব্দুল মজিদ, পেশা : রিকশা চালক, বয়স : ৫৩ বছর, লেখাপড়া : নাই, ডালিয়া তালতলা, ডিমলা
৪২। পূর্বোক্ত
৪৩। মমিনুর রহমান, পেশা : ছাত্র, বয়স : ২৫ বছর, লেখাপড়া : আই.এ, সাতজান, নাউতারা, ডিমলা
৪৪। ৪৪ থেকে ১০৯ পর্যন্ত পূর্বোক্ত
১১০। মোরশেদা বেগম, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৪৩ বছর, লেখাপড়া : পঞ্চম শ্রেণি, নটাবাড়ি, নাউতারা, ডিমলা
১১১। পূর্বোক্ত
১১২। পূর্বোক্ত
১১৩। পূর্বোক্ত
১১৪। সবুজ মিয়া, পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৩০ বছর, লেখাপড়া : আই.এ, ডোমার
১১৫। পূর্বোক্ত
১১৬। পূর্বোক্ত
১১৭। পূর্বোক্ত
১১৮। পূর্বোক্ত
১১৯। সাদেকুল ইসলাম, পেশা : ছাত্র, বয়স : ২৫ বছর, লেখাপড়া : বি.এ অনার্স, ডোমার
১২০। পূর্বোক্ত
১২১। পূর্বোক্ত
১২২। পূর্বোক্ত
১২৩। আরমিন আক্তার মিম, গ্রাম : চড়াইখোলা, উপজেলা : সদর
১২৪। আয়শা সিদ্দিকা, গ্রাম : চড়াইখোলা, উপজেলা : সদর
১২৫। মোছাঃ সিমু আক্তার, গ্রাম : নতিব চাপড়া, উপজেলা : সদর
১২৬। সাগরিকা রায়, উপজেলা : জলঢাকা
১২৭। মমিনুর রহমান, গ্রাম : পূর্ব বালাগ্রাম, উপজেলা : জলঢাকা
১২৮। মোজাম্মেল হক, গ্রাম : চেরেঙ্গা, উপজেলা : জলঢাকা
১২৯। খায়রুন নাহার খুশি, পিতা : খলিলুর রহমান, গ্রাম : আমরুল বাড়ি, উপজেলা : জলঢাকা
১৩০। সাথী রায়, পিতা : হরিকান্ত রায়, গ্রাম : সবুজপাড়া, উপজেলা : জলঢাকা
১৩১। শাহানাজ আকতার, পিতা : সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম : দুন্দিবাড়ি, ডাকঘর : বালাপাড়া, উপজেলা : জলঢাকা
১৩২। মোঃ সুরত আলী, বয়স : ৫৫ বছর, গ্রাম : সঙ্গলসী, সদর
১৩৩। মোছাঃ সামসুন নাহার, বয়স : ৬৩ বছর, গ্রাম : কুন্দল, সৈয়দপুর
১৩৪। উম্মেহানী, বয়স : ৫৫ বছর, বাঙালিপুর, সৈয়দপুর
১৩৫। নাজমুল হক, বয়স : ৫৫ বছর, বাঙালিপুর, সৈয়দপুর
১৩৬। আজিজুল হক, বয়স : ৫০ বছর, বাঙালিপুর, সৈয়দপুর
১৩৭। ভূবন কৃষ্ণ দাস, বয়স : ৭০ বছর, গ্রাম : পুটিমারী, কিশোরগঞ্জ

www.pathagar.com

# লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

কার্যকরণ সম্পর্কে অজ্ঞাত মন যখন বস্তু, ভাব বা ঘটনার গুণধর্মে অমূলক আস্থা স্থাপন করে এবং তার অলৌকিক ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে তখনই এক একটি অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম হয়। অশিক্ষিত মনই এরূপ বিশ্বাসের ধারক ও বাহক। আমাদের মনের আকাশে কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার অদৃশ্য ধূলিকণার ন্যায় ভেসে বেড়ায়। সেগুলো জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিছু লোকবিশ্বাস মানুষের আচার-আচরণ দ্বারা সমর্থিত হয়ে জীবনযাত্রার পথে স্থায়ী ও প্রথাগত স্বীকৃতি লাভ করে। ক্রমে এগুলো মনের গভীরে স্থান পায়। ব্যক্তির আচরণসিদ্ধ, প্রথাবিদ্ধ বিশ্বাসের এ স্তরকে সংস্কার নামে আখ্যায়িত করা হয়। আবার অমূলক ও অকারণ বলেই এগুলোকে কুসংস্কারও বলা হয়। লোক বিশ্বাসের সবটাই অজ্ঞতাপ্রসূত, তমসাবৃত ও প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ নয়। সংশয় সন্দিগ্ধ মনের এই দোলাচল অবস্থাতেই বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাব পড়ে বেশি।

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষকে বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়, স্থানান্তরে যাতায়াত করতে হয়। আমাদের সংস্কারপ্রবণ মনে যাত্রা শুভ, কি যাত্রা অশুভ তা বিচার করা হয় কিছু জাগতিক বস্তু ও মানসিক ক্রিয়ার চিহ্ন দেখে। মানব মনের বিচিত্র রহস্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে শুভাশুভ বাছবিচার মূল্যবান উপাদান হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। হাঁচি মঙ্গলজনক ও অমঙ্গলজনক দুই-ই হতে পারে। খাবার সময় হাঁচি পড়লে বাড়িতে অতিথি আসে। আবার সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় হাঁচি পড়া অমঙ্গলজনক।

সাধারণত পিছু ডাক অশুভ হলেও মায়ের পিছু ডাক শুভ। মায়ের পিছু ডাক সন্তানকে ঘরে ফিরিয়ে আনে বলে সাধারণ বিশ্বাস। এরূপ বিশ্বাস এবং সংস্কারের বেড়াজালে নীলফামারীর সাধারণ মানুষও বাঁধা পড়ে আছে। তারাও মনে করেন কাকের কোনো কোনো ডাক শুভ আবার কোনো কোনো ডাক অশুভ। কাকের একপ্রকার ডাকে বাড়িতে অতিথি আসে, কর্কশ ডাক দুঃসংবাদ বহন করে। রাত্রে কাকের ডাক খুবই অমঙ্গলজনক। একে মৃত্যুর পূর্ব ঘোষণা বলে মনে করা হয়।

সংস্কার বিজ্ঞানের পথ ধরে চলে না। আমাদের দুর্বল মন অমূলকভাবে তা বিশ্বাস করে। এমনকি অমূলকভাবেই তা লালন করে থাকে। সমাজজীবনে জ্যোতিষের প্রভাব আছে। জ্যোতিষের গণনার ফলাফলের উপর বিশ্বাস করে মানুষ মানুষকে কঠোর পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিয়ে ও শুভ কর্মের দিনক্ষণ ঠিক করা হয় জ্যোতিষী বিচার করে। শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে বিয়ে শুভ নয়। হিন্দু বিয়ের লগ্ন ঠিক করা হয় পঞ্জিকায় শুভক্ষণ দেখে। জন্মবারে বিয়ে নিষিদ্ধ। এসব সংস্কার নীলফামারীর সাধারণ মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে স্থান নিয়েছে। আবার রবিবারের দিন বাঁশ কাটা যায় না। কারণ রবিবার বাঁশের জন্ম দিন। অকল্যাণকর কিছু প্রাণীর নাম সরাসরি উচ্চারণ করা হয় না। অন্য নামে তাদের পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন কাউকে সাপে কামড় দিয়েছে না বলে বলা হয় পোকায় কেটেছে। রাতের বেলা হলুদের নাম

www.pathagar.com

সরাসরি উচ্চারণ করা হয় না। রাতে হলুদকে বলা হয় রং। রাতের বেলা চুনকে বলা হয় দই।

যেসব মায়ের সন্তান আঁতুড় ঘরে মারা যায়, সেসব সন্তানের বিশ্রি নাম রাখলে যম তাকে ছোঁয় না। এজন্য হাড্ডি, টাঙ্গুরা, চিকা এসব নামে তাদেরকে ডাকা হয়।

ঘরের বাহিরে পা রাখলে পদে পদে বিপদ হতে পারে। এজন্য যাত্রার মুহূর্ত শুভ হোক এবং নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরে আসুক এই কামনাই একান্ত হয়ে ওঠে। আসি বলে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া বাংলার হিন্দু-মুসলমান সবার ঘরে ঘরে এখনো চালু আছে।

নীলফামারী অঞ্চলের সাধারণ লোকের বিশ্বাস- কোনো খাদ্যদ্রব্য, ক্ষেতের ফসল বা শিশু সন্তানের উপর মন্দ লোকের কুনজর পড়লে ক্ষতি হয়। জিন বা ভূতের প্রভাব থেকে সন্তানকে রক্ষা করার জন্য মা তার সন্তানের কপালের একপাশে কাজলের ফোঁটা দিয়ে থাকেন। তাদের ধারণা এতে ভূতের প্রভাব পড়বে না।

বিপদের সম্ভাবনা থেকে বাঁচার জন্য এ অঞ্চলের মানুষ তার কাজকর্ম, কথাবার্তা ও আচার-আচরণে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে পূবেই সতর্কতা অবলম্বন করে। কিছু বিধিনিষেধ ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত ভালোমন্দের বাছবিচার থেকে উদ্ভূত। যার বাস্তব গুণাগুণ আছে। জগৎ ও জীবনের চারপাশে নানা ঘটনা, বিষয় ও বস্তুকে কেন্দ্র করে অসংখ্য বিধিনিষেধ ছড়িয়ে আছে এ অঞ্চলে। ঋতুবতী ও গর্ভবতী থাকাকালে নারীর যে খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ, অন্য সময়ে তা নিষিদ্ধ নয়।

এ অঞ্চলের গ্রামীণ রমণীগণ তাদের স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। কোনো শুভ কাজের সময় ডিম বা কলা খাওয়া নিষিদ্ধ, খেলে ঐ কাজে সফলতা আসে না। অন্য সময় এসব খাবার নিষিদ্ধ নয়। রাতের বেলা কিছু জিনিস ধার দেওয়া নিষিদ্ধ, এতে ঘরের লক্ষ্মী চলে যায়। কিন্তু দিনের বেলা ধার দিলে কোনো ক্ষতি হয় না। এসব বিশ্বাস কেবল তারা অন্তরে পোষণ করেন না, বাস্তব জীবনাচরণেও সেসব অনুসরণ করেন।

আধুনিক যুগে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটলেও এ অঞ্চলের অনেক বিশ্বাস ও সংস্কার এখনো পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে যায় নি। সাধারণ মানুষের অবচেতন মনের গভীরে কিছু বিশ্বাস স্থায়ী হয়ে ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথায় পর্যবসিত হয়েছে। আচরণসিদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ এ জাতীয় বিশ্বাসের স্তরকে বলা হয় সংস্কার। সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত মানুষের কাছে এগুলো যতোই অমূলক, অকারণ ও অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হোক না কেন, নিরক্ষর সমাজে ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক পরিসরে কিছু পুরনো বিশ্বাস ও সংস্কার আজও অনেক মানুষ লালন করে আসছে। সংসার জীবনে কিংবা সামাজিক পরিবেশে এসব লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার লালনের ক্ষেত্রে নারীদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।

নীলফামারীর গ্রাম-গঞ্জে এখনো সৌভাগ্য বা কাজের সাফল্য কামনায় দেবতার মন্দিরে, পিরের দরগায় মানত করার রীতি প্রচলিত আছে। মানতকারী তার ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে আল্লাহ-রাসুল, পির-ফকির বা দেবদেবীর উদ্দেশ্যে মানত করে থাকে। তাদের ধারণা এতে মানতকারীর মনোবাসনা পূর্ণ হবে, তার উদ্দেশ্য সফল হবে।

ভূতপ্রেত বা অলৌকিক বিশ্বাস নীলফামারীর লোকসমাজের একটি প্রচলিত সংস্কার। অমাবস্যা রাতে ভূতপ্রেত নাকি মাটিতে বিচরণ করে এবং সুযোগ পেলেই

www.pathagar.com

তারা মানুষের উপর আচর বা ভর করে। ঘুমন্ত শিশু হঠাৎ চমকে উঠলে মা মনে করে যে, তার সন্তানের গায়ে হাওয়া বা বাও লেগেছে। তাই সে স্বামীকে অনুরোধ করে পির-ফকিরের কাছ থেকে মন্ত্রপূত তাবিজ আনার জন্য। তাবিজ-কবচ ও ঝাড়ফুঁকে এ অঞ্চলের নিরক্ষর মহিলাদের বিশ্বাস এতোটাই প্রবল যে, তারা মনে করে কবিরাজের কাছ থেকে তাবিজ নিয়ে বন্ধ্যা নারীও সন্তানবতী হতে পারে।

আমাদের দেশের অন্যান্য স্থানের মতো নীলফামারী জেলার কিছু লোকজন এখনও লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের উপর বিশ্বাস করে। তারা সেই কথাগুলোকে কখনও বাস্তবে প্রয়োগ করে। নিচে নীলফামারী জেলায় প্রচলিত আরো কিছু লোকবিশ্বাস ও সংস্কার তুলে ধরা হলো :

১। জামটিয়া (জোড়াকলা) খেলে জমজ সন্তান হবে এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা জামটিয়া কলা খাওয়া থেকে বিরত থাকে।
২। সকালবেলা গোয়ালের গবর ফেলানোর পূর্বে টাকা দিলে অভাব হয়।
৩। পরনের কাপড় ধোয়ার পর স্ত্রী কাপড় চিপে পায়ে পানি ফেললে স্বামীর রক্ত শূন্য হয়।
৪। সন্ধ্যার পর টাকা ধার দিলে অভাব হয়।
৫। সন্ধ্যার পর কাউকে দুধ দেওয়া যায় না, দিলে অমঙ্গল হয়।
৬। সন্ধ্যার পর ডিম বিক্রি করা যায় না, করলে অমঙ্গল হয়।
৭। ময়রার প্যাস্টার খড় গাছে দিলে ফলন ভালো হয়।
৮। ফলের গাছে ফল না ধরলে সেই গাছে ঝাড়ু টাঙিয়ে দেওয়া হয়, এতে ফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৯। কেনো বিবাহিত মহিলার সন্তান না হলে তাকে হাতির আইটা খাওয়ালে তার সন্তান হবে বলে ধারণা করা হয়।
১০। বকরি ও গরুর বাছুর হারিয়ে গেলে পুকুরে পান সুপারি দিলে বুড়ি ঠাকুরানি তা ফিরিয়ে দিবে বলে ধারণা করা হয়।
১১। হুতুমপ্যাঁচা মাথার উপর ডাকলে মৃত্যু সংবাদ আসে।
১২। সন্ধ্যার পর চাউল ধার দেওয়া যায় না।
১৩। বিড়াল মুখ চাটলে বাড়িতে আত্মীয় আসতে পারে বলে ধারণা করা হয়।
১৪। কোনো জিনিস হাত থেকে পড়ে গেলে বাড়িতে আত্মীয় আসবে বলে ধারণা করা হয়।
১৫। শনি ও মঙ্গলবার হলুদ ধার দিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।
১৬। রবিবার বাঁশের ঝাড় থেকে বাঁশ কাটা যায় না।
১৭। মাকড়সা কারো গায়ে উঠলে নতুন জামা কেনা হবে বলে ধারণা করা হয়।
১৮। কারো বাড়িতে কাক ডাকলে বিপদের সংবাদ পাওয়া যায়।
১৯। মহিলা লোকের চোখ চুলকালে তার সন্তানের অসুখ হয়।
২০। হাতের তালু চুলকালে টাকা আসে।
২১। কারো চোখের পাতা কাঁপলে তার অসুখ হবে বলে ধারণা করা হয়।
২২। কারো বাড়ির পাশে হাঁড়িচাঁচা পাখি ডাকলে সেই বাড়িতে ঝগড়া লাগে।

www.pathagar.com

২৩। ভাঙা আয়নায় মুখ দেখলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।
২৪। ঘরের মধ্যে মাকড়সার জাল থাকলে দেনা বাড়ে।
২৫। ধান খেতে ধানের শিশ বের হওয়ার সময় কলার মোচা খেলে ধানে পাতান হয়।
২৬। ফলের গাছ রোপণ করার পর পরই চারা রোপণকারী তার হাত ধুয়ে ফেললে সেই ফলের গাছ থেকে উৎপন্ন ফলের মিষ্টি থাকে না।
২৭। ফলের গাছ রোপণ করার সময় নিচের দিকে তাকালে ছোট থাকতে সেই গাছে ফল ধরে।
২৮। বনজ গাছ লাগানোর সময় উপরের দিকে তাকালে গাছ লম্বা ও মোটা হয়।
২৯। ফলন্ত গাছে ফল ধরার পর পচে গেলে সেই গাছের ফল দিয়ে হাতি, ঘোড়া বানিয়ে তেরাস্তার মোড়ে রেখে দিলে গাছের ফল পচা বন্ধ হয় এবং গাছের ফলন বৃদ্ধি পায়।
৩০। ফলের গাছ রোপণ করার পর রোপণকারী পায়খানা করতে গেলে সেই গাছের ফল পচে যায়।
৩১। কারো জ্বর হলে শুকুরকে ডাঙ্গালে তার জ্বর সেরে যায়।
৩২। সুপারি গাছ থেকে সুপারি পাড়ার পর সুপারির বাদা ফেঁড়ে দিলে গাছে সুপারির ফলন ভালো হয়।
৩৩। হলুদ ও আদা রোপণ করার দিন মাছ ও শুটকি খেলে তা পচে যায়।
৩৪। আদা রোপণ করার পর আদার খেতে সটির গাছ রোপণ করলে আদার ফলন ভালো হবে বলে ধারণা করা হয়।
৩৫। ধানের চারা রোপণ করার সময় মুরগি জবাই করলে ধান খেতের ফলন ভালো হবে।
৩৬। গর্ভবতী গাভির বাছুর হওয়ার পূর্বে হুঁকার ভাঙা ছিলিম গাভির গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যাতে কারো নজর না লাগে।
৩৭। গাভির বাছুর হওয়ার পর ফুল পড়তে দেরি হলে মইয়ের ন্যাংড়া গাভির গলায় বেঁধে দিলে তাড়াতাড়ি ফুল পড়ে।
৩৮। গাভির শাল দুধ নীল সাগরে উৎসর্গ করলে গাভির দুধ বেশি হবে বলে ধারণা করা হয়।
৩৯। মুরগির ডিম ফুটানোর জন্য মুরগিকে ডিমে তা দেওয়ার জন্য বসানোর পূর্বে আড়িয়া গরুকে দিয়ে শুকিয়ে নিলে সবগুলো ডিম থেকে বাচ্চা বের হবে বলে ধারণা করা হয়।
৪০। কারো চোখে অঞ্জনি উঠলে তার চোখে ছোট বাচ্চার নুনু ছোওয়ালে অঞ্জনি ভালো হয়ে যায়।
৪১। কারো গায়ে হাম উঠলে অফলন্ত আম গাছের শিকরের মাটি তার গায়ে দিলে সুস্থ হয়ে যায়।
৪২। হাঁস, মুরগি, কবুতর জবাই করার পর পাখনা উঠানোর সময় কথা বললে পাখনা বাড়ে।

www.pathagar.com

৪৩। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন বাঁশের ঝাড়ে মাটি দিলে সেই বাঁশ ঝাড়ের বাঁশ বৃদ্ধি পায়।

৪৪। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন ফলের গাছ রোপণ করলে সেই গাছে তাড়াতাড়ি ফল ধরে।

৪৫। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন গোয়াল ঘরে মাটি দিলে গরু বাছুরের রোগ বালাই হয় না।

৪৬। পাগলা কুকুর কামড়ালে যাকে কুকুর কামড়িয়েছে তার পিঠে কাঁসার থালা বসিয়ে দিলে আর কোনো সমস্যা হবে না।

৪৭। শিলাবৃষ্টির সময় বড় বড় শিলা পড়লে বাড়ির আঙিনায় সরিষা ছিটিয়ে দিলে আকাশ থেকে বড় শিলা না পড়ে ছোট শিলা পড়ে।

৪৮। তেল পিঠা ভাজার সময় মুখে বাতাস ঢুকিয়ে পিঠা ভাজতে বসলে পিঠা ভালো হয়।

৪৯। তেল পিঠা ভাজার সময় যাতে কেউ জাদু টোনা করতে না পারে সেজন্য চুলার চারপাশে লোহার চাকু দিয়ে মাটিতে দাগ কাটা হয়।

৫০। বউনি করার পূর্বে দোকানের মাল কাউকে বাকি দিলে সেদিন তার সব মাল বাকিতে দিতে হবে বলে ধারণা করা হয়।

৫১। কোনো বিবাহিত লোক বাড়ির এক দরজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে বের হলে তার বউ পালিয়ে যাবে বলে ধারণা করা হয়।

৫২। দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়ানোকে কুলক্ষণ মনে করা হয়।

৫৩। ঘরের মধ্যে রাতের বেলা নখ কাটাকে দোষণীয় মনে করা হয়।

৫৪। সকাল বেলা কোথাও যাত্রাকালে পানিবিহীন কলসি/ বন্ধ্যা নারী/ নিদাড়িয়া/ আঁটকুড়া লোক দেখাকে কুলক্ষণ মনে করা হয়।

৫৫। রাতের বেলা কাউকে ঘর থেকে ডাক দিলে তার সাথে জিন-ভূত আসতে পারে বলে বিশ্বাস করে রাতে কাউকে ডাকা হয় না।

৫৬। দুগ্ধপোষ্য শিশুর গায়ে যাতে বদ নজর না লাগে সেজন্য শিশুর কপালের এক পাশে কাজলের কালি দিয়ে টিপ দেওয়া হয়।

৫৭। দুগ্ধপোষ্য শিশুর দাঁত ওঠার আগে তাকে আয়না দেখালে আর দাঁত উঠবে না বলে ধারণা করা হয়।

৫৮। রাতের বেলা ঘর ঝাড়ু দেওয়া, ফুঁ দিয়ে বাতি নিভানো, মাথা আচড়ানো এসব কাজকে অশুভ বলে মনে করা হয়।

৫৯। অনেকে পিরের মাজারে মানত করে পির সাহেবের কাছে তাদের মনোবাসনা পূরণার্থে প্রার্থনা করে থাকে।

৬০। কোনো শুভ কাজ উপলক্ষে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর কেউ পেছন থেকে ডাক দেওয়াকে অশুভ মনে করা হয়।

৬১। অমাবস্যার রাতে/ চন্দ্র গ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলাদেরকে সুপারি কাটতে নিষেধ করা হয়। এসময় সুপারি কাটলে বিকলাঙ্গ সন্তান জন্ম নেবে বলে ধারণা করা হয়।

www.pathagar.com

৬২। কোনো শুভ কাজে যাত্রাকালে কলা/ ডিম খেতে নিষেধ করা হয়।

৬৩। শস্য খেতে যাতে কারো নজর না লাগে সেজন্য হাঁড়িতে চুন/ কালি মেখে কাকতাড়ুয়া বানিয়ে জমিতে পুঁতে রাখা হয়। অথবা ঝাড়ু টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

## তথ্যসহায়ক

১। ১ থেকে ২৩ পর্যন্ত, জোলেখা বেগম, বয়স : ৪৫, লেখাপড়া : নাই, সাতজান, নাউতারা, ডিমলা

২। ২৪ থেকে ৪০ পর্যন্ত, মোতাহারা বেগম, বয়স : ৬০, লেখাপড়া : নাই, ছোট রাউতা, ডোমার

৩। ৪০ থেকে ৪৬ পর্যন্ত, মমিনুর রহমান, পেশা : ছাত্র, বয়স : ২৫, লেখাপড়া : এইচ.এস.সি, সাতজান, নাউতারা, ডিমলা

৪। ৪৭ থেকে ৫২ পর্যন্ত, মোঃ হেলাল হোসেন, বয়স : ৩০, লেখাপড়া : আলিম, সাতজান, নাউতারা, ডিমলা

৫। ৫২-৬২ পর্যন্ত, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, বয়স : ৪০, পেশা : শিক্ষকতা, বাবুপাড়া, সদর, নীলফামারী

www.pathagar.com

# লোকপ্রযুক্তি

নীলফামারী অঞ্চলের সাধারণ মানুষের হাতে তৈরি এমন অনেক বস্তুগত লোকশিল্প আছে যেগুলো তারা জীবন নির্বাহে প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এসব প্রযুক্তিগত লোকশিল্প এ অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। প্রযুক্তিগত লোকশিল্পের মধ্যে কিশোরগঞ্জের মাঝিপাড়া গ্রামের দরিদ্র শ্রেণির মানুষের হাতে তৈরি মাছ ধরার বিভিন্ন যন্ত্র যেমন ডারকি, পলুই, হ্যাঙ্গা, জলঢাকা বালাগ্রামের সাধারণ মানুষের হাতে বুনন মাছ ধরার বিভিন্ন জাল যেমন—পাতানো জাল, ছিঠকি বা মুঠো জাল, চটকা বা চউড় জাল এবং ডিমলার সরিষা মাড়ার ঘানিগাছ এবং ডিমলার কার্পেট বোনার তাঁত উল্লেখ করবার মতো। নিম্নে এসব শিল্পের ধারাবাহিক পরিচয় সংক্ষিপ্তাকারে ব্যক্ত করা হলো :

## ক. মাছ ধরার প্রযুক্তি

**১. ডারকি বা দোড় :** ডারকি মূলত বাঁশের তৈরি এক সুনিপুণ লোকশিল্প। বাঁশের অসংখ্য চিকন কাঠি সরু সুতলি দিয়ে গেঁথে লম্বা আয়তকার বিশিষ্ট অনেকটা বাক্স আকৃতি করে এটি তৈরি করা হয়।

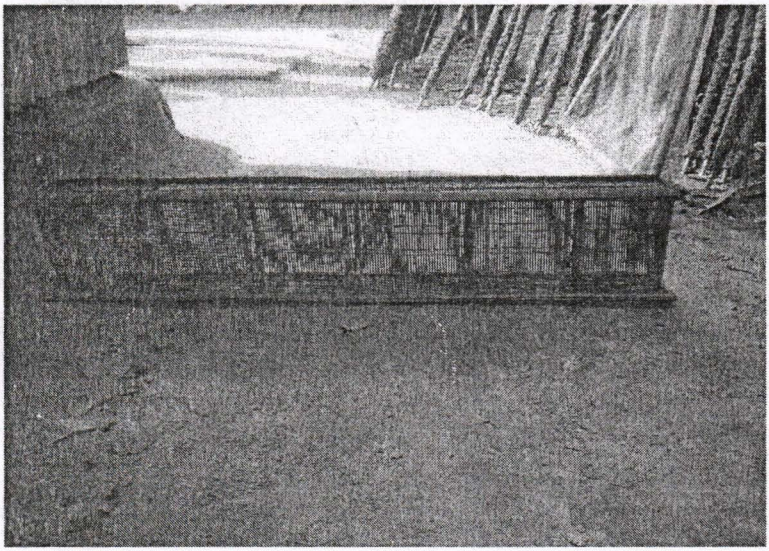

ডারকি বা দোর পূর্ব বালাগ্রাম, জলঢাকা , নীলফামারী

www.pathagar.com

এর উভয় পেটে তিনটি বা তারও অধিক উপর নিচ লম্বাটে আকৃতির দোর থাকে। কোনো জলাশয়ে (সম্ভাব্য ছোট মাছ থাকার) ডারকি বসিয়ে দিয়ে তার উভয় পার্শ্বে আল বেঁধে দেয়া হয়। এর ফলে ডারকির দোর দিয়ে মাছ এপার ওপার যাতায়াত করার সময় ডারকির মধ্যে বাঁধা পড়ে যায়। পরে ডারকি তুলে তার উপরপিঠের মুখ দিয়ে মাছ ঝেড়ে বের করে নেয়া হয়। ডারকি মূলত ছোট মাছ ধরার এক শিল্পগত প্রযুক্তি।

২. পলুই : পলুই মূলত ছাপ দিয়ে মাছ ধরার এক প্রকার যন্ত্র। বাঁশের মোটাকাটি উপর নিচ লম্বা করে পাটসুতার বেনুনির শক্ত ফাঁদে আটকিয়ে এ যন্ত্র তৈরি করা হয়। এর উপরে ৫ থেকে ৯ ইঞ্চি ব্যাসার্ধে পেষ্টাকৃতির একটি মুখ থাকে এবং নিচের অংশের মুখ যথেষ্ট প্রশস্ত (১ থেকে ২ ফুট) হয়ে থাকে।

পলুই দিয়ে মাছ ধরছে স্থানীয় সাধারণ মানুষ পূর্ব বালাগ্রাম, জলঢাকা, নীলফামারী।

উপরের পেষ্টাকৃতি মুখ হাতল হিসেবে ব্যবহার হয়। জলাশয় বা খালবিলে মাছ ধরার সময় পলুইকে খুব দ্রুত পানির বিভিন্ন স্থানে ছাপবসানো হয়- এর ফলে পলুইয়ের মধ্যে বন্দি মাছ আর বের হতে পারে না। পরে হাতলের মুখ দিয়ে হাত প্রবেশ করে হাত দিয়ে মাছ ধরে উপরে নিয়ে আসা হয়।

৩. **পকিয়া :** পকিয়ার বুনন কৌশল অনেকটা ডারকির মতো, তবে ডারকির মতো এটি লম্বাকৃতি নয়।

এটি দখতে অনেকটা ব্রিফকেসের মতো। এর পাশে লম্বা ট আকৃতির একটি মুখ থাকে। জলাশয়ের এক ধারে বা কিনারে বা আলের পাশে পকিয়া ফেলে রাখা হয়। পকিয়ার অভ্যন্তরে মাছের বিভিন্ন খাদ্য যেমন- ধানের গুড়া, গবর, খৈল ইত্যাদি রেখে

www.pathagar.com

দেয়া হয়। খাদ্য সন্ধানী মাছ খাবার লোভে পকিয়ায় প্রবেশ করে বাঁধা পরে যায়। পরে পকিয়া ডাঙ্গায় তুলে এনে মাছ বের করে নেয়া হয়।

**৪. হ্যাংগা বা হ্যাংগাজালি :** ৩ থেকে ৪ ফিট লম্বা সরু বাঁশের তিনটি ডাব বা লাঠির প্রান্তগুলো পরস্পর সংযুক্ত করে অনেকটা ত্রিভুজ আকৃতির করে নিয়ে সেখানে থলির মতো করে জাল ঝুলিয়ে হ্যাংগা জালি তৈরি করা হয়। হ্যাংগা জালি খুব সহজ লভ্য একটি প্রযুক্তি। এর দুই বাহু সমান থাকে। সম্মুখ বাহু অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। এই সম্মুখ বাহুর দিকটাকে হ্যাংগাজালির মুখ বলে। পানির স্রোতের মুখে হ্যাংগাজালির মুখ বসিয়ে দিয়ে পেছনের অংশ উঁচু করে রাখা হয়। স্রোতের টানে মাছ হ্যাংগাজালির মধ্যে জালের থলিতে ঢুকে পড়ে। অতঃপর হ্যাংগাজালি উপরে তুলে এনে মাছ সংগ্রহ করা হয়।

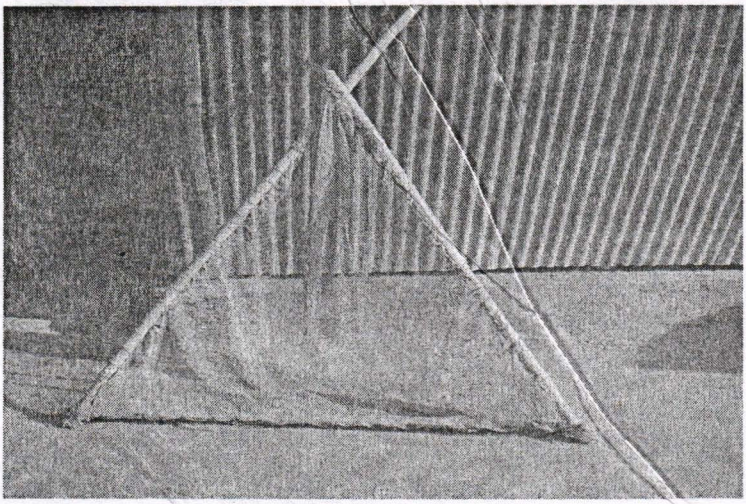

হ্যাংগা বা হ্যাংগাজালি ডোমার, নীলফামারী।

**৫. জাল :** মাছকে বন্দি করার অন্যতম লোক প্রযুক্তি হলো জাল/ নাইলোনের সুতায় বিশেষ কারিগরি দক্ষতায় জাল বুনোন করা হয়। নীলফামারী জেলার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে বিশেষ করে খালবিল বা নদীর ধারে অবস্থিত গ্রামগুলোতে জালের ব্যবহার সর্বাধিক। কিশোরগঞ্জের কৈকুড়ি, জলঢাকার বালাগ্রাম এবং ডিমলা ও ডোমারের তিস্তাতীরস্থ অঞ্চলের জেলে সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই জালের সাহায্যে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। মাছ ধরার কৌশল ভেদে এ অঞ্চলের জালগুলোর মধ্যে অনেক রকম বা প্রকার ভেদ লক্ষ করা যায়। যেমন :

ক. ছিটকা বা মুঠি জাল; খ. চৌরজাল বা চটকা জাল; গ. কৈজালা বা পাতানো জাল

**ক. ছিটকা বা মুঠি জাল :** ছিটকা জাল ৬ থেকে ১০ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এক প্রান্তের বন্ধ মুখে লম্বা রশি লাগানো থাকে। অপর প্রান্তের গোলাকৃতি বিশাল খোলা মুখে লোহার কাঠির ঝালর থাকে। ঝালর থলি আকৃতির হয়ে থাকে। ব্যবহারের সময়


www.pathagar.com

জাল হাতের বিশেষ কৌশলে গুটিয়ে নিয়ে পানির অদূরে ছিটকে দেয়া হয়। ছিটানো জাল মুখের ব্যাসার্ধ অনুযায়ী গোল হয়ে পানির মধ্যে ডুবে যায়। এ সময়ে জালের মধ্যে বাঁধা পড়া মাছ বের হতে চাইলে থলির মধ্যে বন্দি হয়ে থাকে। এরপর অন্য প্রান্তের রশি ধরে জালটিকে আস্তে আস্তে উপরে টেনে তুলে মাছ সংগ্রহ করা হয়।

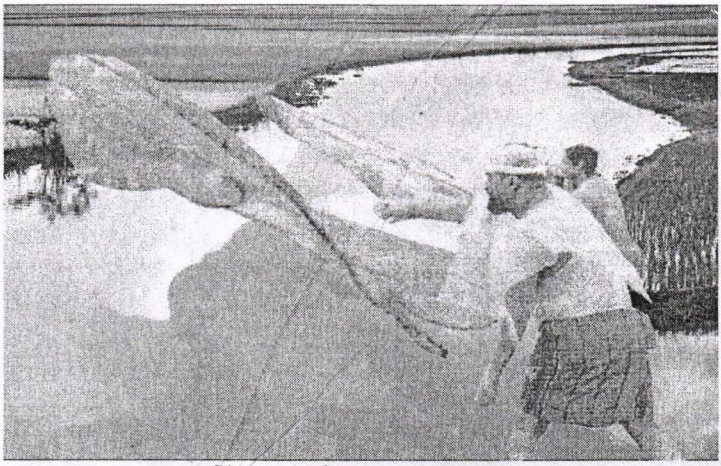

ছিটকা জাল দিয়ে মাছ ধরছে জেলে

**খ. চৌরজাল বা চটকা জাল :**

বর্ষা মৌসুমে নীলফামারীর খালবিল অঞ্চলে চৌর বা চটকা জালের ব্যবহার ব্যাপক লক্ষ্য করা যায়। বর্গাকৃতি এ জাল ৫ থেকে ২০ বর্গফুটের মতো হয়ে থাক।

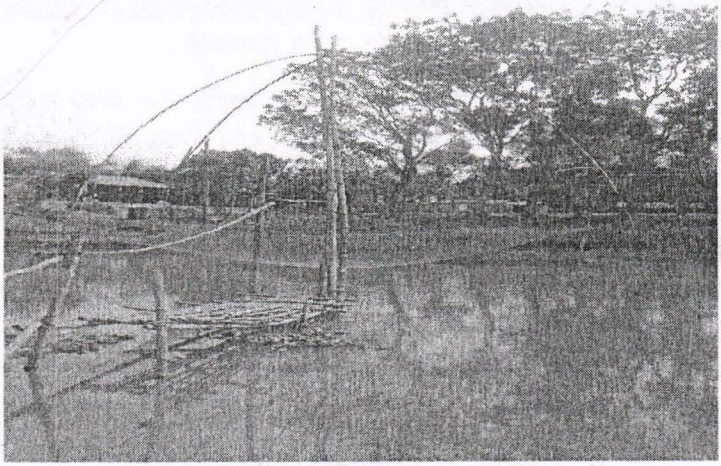

মাছ ধরার প্রাক্কালে ব্যবহৃত চৌরজাল ডালিয়া, নীলফামারী।

www.pathagar.com

জালের চারটি কোনা উপরে বাকানো আড়াআড়ি ভাবে চারটি সরু বাঁশ বা ডাবের মাথায় টানটান ভাবে যুক্ত থাকে। এই চারটি বাঁশকে টনি বলা হয়। টনির সাথে সংযুক্ত জাল দেখতে বিশাল আকৃতির উল্টো বাটির মতো মনে হয়। চারটি টনির সংযোগ বা কেন্দ্রস্থল একটি লম্বা বাঁশের মাথায় যুক্ত করে জাল ঝুলিয়ে রাখা হয়। ঝুলন্ত জাল লম্বা বাঁশের সাহায্য পানির মধ্যে বসানো এবং উঠানো হয়। সাধারণত বর্ষা মৌসুমে পানির স্রোতের মধ্যে যেখানে মাছ চলাচলের সম্ভবনা বেশি সেখানে এ জাল ব্যবহার করে মাছ ধরা হয়ে থাকে।

**গ. কৈজাল বা পাতানো জাল :** পানির গভীরতা অনুযায়ী এ জালের উচ্চতা হয়ে থাকে এবং এর দৈর্ঘ্য ১৫-২০ ফিট থেকে ১০০-১৫০ ফিট কিংবা তারও বেশি হয়ে থাকে। এ জালের উপরে লম্বালম্বি সারিবদ্ধ ভাবে সোলার বা মধুকপি ডালের পাতি লাগানো থাকে এবং নিচের অংশে মাটির তৈরি কাঠি ঝুলানো থাকে। জলাশয়ে বসানোর সময় কাঠির ওজনে জালের নিচের অংশ পানির তলা পর্যন্ত পৌঁছলেও সম্পূর্ণ রূপে ডুবে যায় না। বরং পাতার সাহায্যে পানির উপর পর্যন্ত খাড়া হয়ে থাকে। এ অবস্থায় জালের এপাশ থেকে ওপাশে চলাচলের সময় মাছ জালের ফাঁকে আটকিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় পর জাল ডাঙ্গায় তুলে মাছ সংগ্রহ করা যায়।

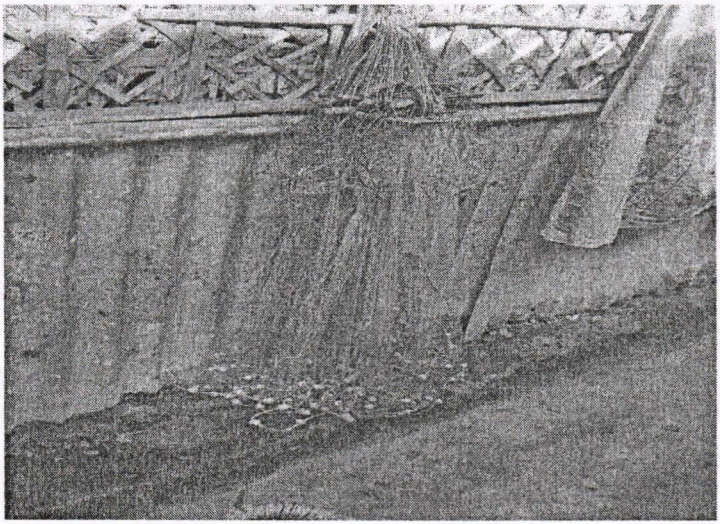

গুটানা অবস্থায় কৈজাল বা পাতানো জাল কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

**৬. বড়শি :** বড়শি মাছ ধরার সহজ প্রযুক্তি। বাঁশের কঞ্চি, সুতা এবং লোহার তৈরি ক্ষুদ্র বাঁকানো কল এর প্রধান উপকরণ। নীলফামারী অঞ্চলে প্রধানত তিন রকমের বড়শি দেখা যায়। যেমন :

ক. খোটানো বা ছিপ বড়শি; খ. পাতানো বড়শি এবং গ. গাড়াবড়শি

www.pathagar.com

**ক. খোটানো বড়শি বা ছিপ বড়শি :** ৫ থেকে ৮ ফিট লম্বা কঞ্চির ছিপের চিকন প্রান্তে ৭ থেকে ৯ ফিট লম্বা সুতা বাঁধা হয়। সুতার অপর প্রান্তে মাছ ধরার কল ঝুলানো থাকে। কলের ওপর ২ থেকে ৩ ইঞ্চি লম্বা একটি পাতি সুতার সঙ্গে লাগানো থাকে। পানির গভীরতা অনুযায়ী এই পাতি উপরে এবং নিচে উঠানো এবং নামানো যায়। ব্যবহারের সময় বড়শির কলে কেঁচো গেথে পানির অদূরে নিক্ষেপ করা হয়। কেঁচোযুক্ত কল উপরে ভাসমান পাতার সাহায্যে পানির গভীরে খাড়াভাবে ঝুলে থাকে। আহার সন্ধানী মাছ এই কেঁচোকে খেতে ধরলে উপরে ভাসমান পাতার সাহায্যে তা বোঝা যায়। অতঃপর মৎস্য শিকারি সুযোগ বুঝে ছিপের গোড়া ধরে সজোরে এমনভাবে খোট মারে বা ঝটকে টেনে নেয় যাতে করে বড়শির কাঁটা মাছের মুখে বিঁধে যায়। পরে মাছের মুখ থেকে কাঁটা খুলে মাছ সংগ্রহ করা হয়।

**খ. পাতানো বড়শি :** সোলা বা মধুকপি ডালের এক ফিট লম্বা পাতির মাঝখানে সুতার সাহায্যে বড়শির কল ঝুলানো থাকে। কলের মধ্যে কেঁচো গেঁথে পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে মাছ তা গলাধকরণ করে এবং কলের কাঁটায় আটকিয়ে যায়। অতঃপর পাতি তুলে মাছ উপরে আনা হয়।

পাতানো বড়শি দিয়ে শিকার করা মাছ ডাঙ্গায় তুলে আনা হয়েছে।
কঞ্চনার বিল মুশা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

**গ. গাড়াবড়শি :** গাড়াবড়শি অবিকল খোটানো বড়শি বা ছিপবড়শির মতো। এ বড়শি হাতে ধরে না থেকে অল্প পরিমাণ জলের কাদায় একটু হেলিয়ে বা বাঁকা করে পঁতে রাখা হয়। এ অবস্থায় উপরের চিকন প্রান্তের সুতা ও কল পানির মধ্যে ডুবে থাকে। এ বড়শিতেও একই পদ্ধতিতে মাছ ধরা পড়ে এবং তা সংগৃহীত হয়।

www.pathagar.com

## খ. চাষাবাদ প্রযুক্তি

**১. লাঙ্গল ও জোয়াল :** কৃষিকাজে ব্যবহৃত অন্যতম লোক প্রযুক্তি হলো লাঙ্গল ও জোয়াল। শক্ত বৃক্ষের শিকরসহ কান্ডের গোড়ালি অংশের কাঠ দিয়ে লাঙ্গল তৈরি করা হয়। গোড়ালি অংশের সাথে শক্ত শিকর অংশটি প্রায় ৯০° কোণে সংযুক্ত থাকে। এর উপরের খাড়া বাহুকে হাতল বা মুঠি বলা হয় এবং নিচের চ্যাপটা বাহুর সম্মুখভাগ সুচালু করে তার পিঠে দো-ধারা ছুরির মতো লোহার পাত সংযুক্ত করা হয়, একে লাঙ্গলের ফলা বা ফাল বলে। দুই বাহুর সংযোগ স্থলে উভয় পার্শ্বে ৪৫° ডিগ্রি কোণ রেখে কাঠের একটি লম্বা বাহু সংযুক্ত থাকে। একে লাঙ্গলের 'ঈশ' বলে। জোয়াল কাঠের তৈরি। এর দুই প্রান্তকে চ্যাপ্টা পাতের মতো করে নেয়া হয়। এই চ্যাপ্টাপাত গরুর ঘাড়ে গজের গায়ে বসিয়ে দেয়া হয়। জোয়ালের মধ্যখানে ঈশ বাঁধার ঘাট থাকে। ব্যবহারের সময় জোয়াল গরুর ঘাড়ে বসিয়ে ঈশ সংযুক্ত করে লাঙ্গলের অপর প্রান্ত হাতলের সাহায্যে খাড়া করে ধরা হয়। গরুর টানে লাঙ্গলের ফলা দিয়ে জমি কর্ষণ হয়ে থাক। এ অঞ্চলে জমি কর্ষণকারীকে বলা হয় 'হালুয়া'।

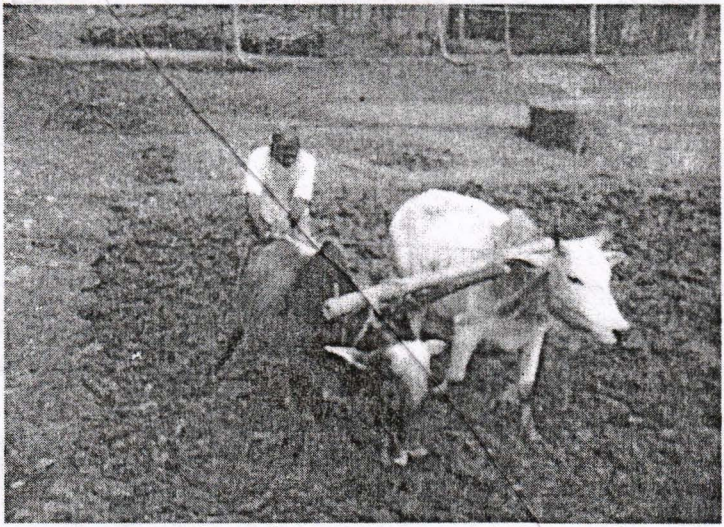

লাঙ্গল ও জোয়াল প্রযুক্তিতে জমি চাষ করছে কৃষক, চান্দেরহাট, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী

## ২. মই

কর্ষিত জমি সমান বা মসৃণ করার প্রযুক্তি হিসেবে মই এর বিকল্প নেই। এর গঠন কৌশল অতি সাধারণ। প্রথমে ৪ থেকে ৫ ফিট লম্বা একটি বাঁশকে লম্বালম্বিভাবে দুভাগে বিভক্ত করা হয়। বিভক্ত বাঁশকে ফালি বলা হয়। উভয় ফালির উল্টো পিঠে এক ফিট পরপর ছিদ্র করা হয়। অতঃপর উভয় ফালির ছিদ্রগুলো সমান্তরাল করে

www.pathagar.com

সেগুলোতে এক ফিট লম্বা বাঁশের খুট দিয়ে ফালি দুটোকে সমান দূরত্বে রেখে অবিচ্ছিন্ন রাখা হয়। এর দুই প্রান্তে দু'টি রশি যুক্ত থাকে। ব্যবহারের সময় রশির অপর প্রান্ত গরুর ঘাড়ের জোয়ালের দুই প্রান্তে বেঁধে দেয়া হয়। অতঃপর 'মইয়াল' মইয়ের পিঠে চড়ে গরুকে সঞ্চালন করে কর্ষিত জমিকে মসৃণ করে নেয়।

মইয়ের সাহায্যে কর্ষিত জমি সমান করছে মইয়াল সালন্দ্রাম, বালাগ্রাম, জলঢাকা, নীলফামারী।

**গ. তেলের ঘানি :** নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার ডালিয়া অঞ্চলে এখনও তেলের ঘানির লোকপ্রযুক্তি লক্ষ করা যায়। সরিষা মাড়াই করে তেল উৎপন্ন করার এটি একটি অন্যতম প্রযুক্তি। কাঠ, বাঁশ ও রশি এ শিল্পের প্রধান উপকরণ। সাত ফিট লম্বা এবং দেড় ফিট ব্যাসার্ধের চৌবাচ্চা আকৃতির ঘানির নিচের অংশ মাটিতে পুঁতে অপর অংশ খাড়া করে রাখা হয়। উপরের অংশের মাথায় দেড় ফিট গভীর একটি গর্ত থাকে। গর্তের মধ্যখানে থাকে জাইট। জাইটের সাথে বেঞ্চ আকৃতির তক্তাপোষটি বাঁশের মুড়ার তৈরি একটি খুঁটার সাহায্যে সংযোগ থাকে। বেঞ্চ আকৃতির তক্তাপোষটিকে বলা হয় কাঠরী। কাঠরী লম্বায় ৭ ফিট এবং প্রস্থে দেড় ফিট হয়ে থাকে। কাঠরীর এক প্রান্ত ঘানির মধ্যভাগে চিকন অংশে খামচির মতো করে এমন ভাবে লাগানো হয় যাতে কঠিরীকে ঘানির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরানো সম্ভব হয়। কাঠরীর অপর প্রান্ত রশির সাহায্যে গরুর ঘারের জোয়ালের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এ অবস্থায় কাঠরীটি ভাসমান থাকে। এর পর ব্যবহারের সময় গরুর মাধ্যমে কাঠরীটিকে ঘানির চতুর্দিকে ঘুরানো হয়। এর ফলে কাঠরীর সঙ্গে সংযুক্ত জাইটটিও ঘুরতে থাকে এবং জাইটের সাহায্যে ঘানির গর্তে রাখা সরিষা পিষ্ট হয়ে তেলে পরিণত হয়। উৎপন্ন তেল ঘানির নিচের ছিদ্র পথ দিয়ে বেরিয়ে মাটিতে বসানো ডোগা বা হাঁড়িতে সঞ্চিত হয়।

www.pathagar.com

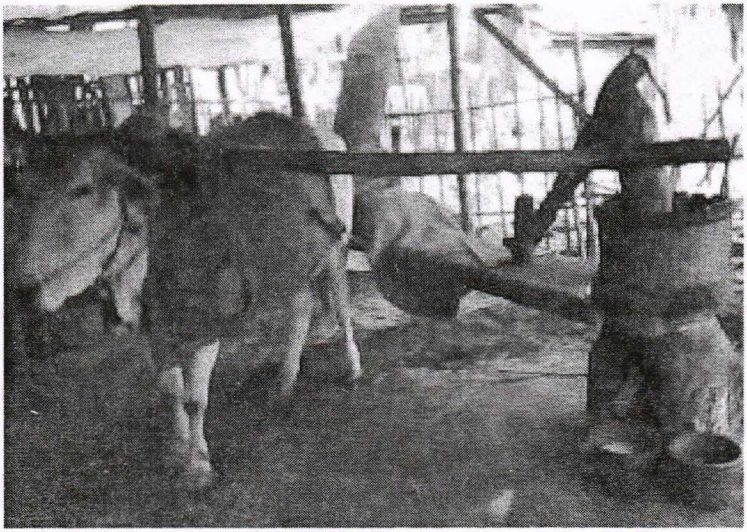

ঘানি প্রযুক্তিতে সরিষা মাড়াই করে তেল তৈরি হচ্ছে।
খালিসা চাপানি, ডিমলা, নীলফামারী।

**ঘ. ঢেঁকি :** ধান থেকে চাল বের করার অন্যতম লোকপ্রযুক্তি হলো ঢেঁকি। নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে এবং জলঢাকার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে এখন ঢেঁকির প্রচলন লক্ষ করা যায়। কাঠের তৈরি ঢেঁকি লম্বায় ৪ ফিট হয়ে থাকে।

ঢেঁকিতে ধান ভানার প্রযুক্তি, কেতকীবাড়ী, ডোমার, নীলফামারী।

www.pathagar.com

এর পিছনের দিকটা মাছের লেজের মতো অনেকটা চ্যাপ্টা হয়ে থাকে। একে পাদানি বা পাদন বলে। পাদনের এক ফিট সামনে ঢেঁকির গায়ের পার্শ্বের ছিদ্র পথে আড়াই ফিট লম্বা কাঠের একটি ডাণ্ডি ঢুকানো থাকে। একে নাকশলাই বলা হয়। নাকশলাই দুই পার্শ্বের দুটি খুঁটির উপরে বসানো থাকে। খুঁটি দুটিকে বলা হয় কাতরা। ঢেঁকির সম্মুখ ভাগ নিচের দিকে কাঠের তৈরি দেড় ফিট লম্বা গোলাকৃতি আরেকটি ডান্ডি থাকে। একে বলে চুরুন। চুরুন দেখতে অনেকটা পাখির ঠোঁটের মতো। চুরুনের নিচের অংশের মুখের মাপমতো লোহার গোলাকৃতি একটি পাতি লাগানো থাকে। একে শামা বলে। শেকড় সমেত শক্ত কোনো গাছের গোড়ালির মধ্যখানে গর্ত করে শামা বা চুরুন বরাবর তা মাটির নিচে সমান ভাবে বসানো থাকে। একে গড় বলা হয়। গড়ের মধ্যে ধান রেখে পাদানির সাহায্যে ঢেঁকির মাথা উপরে তুলে ছেড়ে দিলে শামার বা চুরুন এর আঘাতে ধান থেকে চাল বেড়িয়ে আসে। এভাবে বার বার ঢেঁকির মাথা উঠানামার ফলেই ধান থেকে চাল তৈরি হয়।

## ঙ. লোকযান প্রযুক্তি

### ১. কলার গাছের ভেলা বা ভুড়া

নীলফামারী জেলার নিম্নাঞ্চল গ্রামগুলোতে ভুড়ার প্রচলন এখনও আছে। ভরা বর্ষা মৌসুমে বন্যার পানিতে পথঘাট ডুবে গিয়ে গ্রামগুলো যখন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে তখন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে কিংবা বড় কোনো বিলের এপাড় থেকে অন্য পাড়ে যাতায়াতের জন্য ভুড়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না।

ভুড়া তৈরির প্রধান উপকরণ কলাগাছ। তিন থেকে পাঁচটি কলাগাছ সারিবদ্ধ করে বাঁশের গোজি বা খিলের সাহায্যে সেগুলোকে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন রেখে ভুড়া তৈরি করা হয়। ভুড়ার মধ্যবর্তী কলা গাছটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং মোটা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে পাশের কলাগাছগুলো নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে। একটি বড় ভুড়ায় ৮-১০ জন লোক একই সঙ্গে উঠে পারাপার হতে পারে। ভাসমান ভুড়া চালাতে বাঁশের বড় লাঠি কিংবা গাছের ঠ্যাংগা ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি